রক্ত পিচ্ছিল পথের যাত্রী যাঁরা
প্রথম খন্ড
আব্দুস সালাম মিতুল

রক্ত পিচ্ছিল পথের যাত্রী যাঁরা

(প্রথম খন্ড)

সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ

আব্দুস সালাম মিতুল

সম্পাদনায়

মাওলানা মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন

প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স

৪৩৫/ক, ওয়ারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

ফোন:৮৩৫৮৭৩৪, ০১৭১১১২৮৫৮৬, ০১৫৫২৩৫৪৫১৯

রক্ত পিচ্ছিল পথের যাত্রী যাঁরা

(প্রথম খন্ড)

সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ

আব্দুস সালাম মিতুল

প্রকাশক

এ এম আমিনুল ইসলাম

প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স

৪৩৫/ক, ওয়ারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

ফোন: ৮৩৫৮৭৩৪, ০১৭১১ ১২৮৫৮৬, ০১৫৫২ ৩৫৪৫১৯

চতুর্থ সংস্করণ

অক্টোবর: ২০০৩ ঈসায়ী

জুন : ২০০৮ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ

প্রফেসর'স কম্পিউটার এণ্ড গ্রাফিক্স

মুদ্রক

ক্রিসেন্ট প্রিন্টিং প্রেস

মগবাজার ওয়ারলেস রেলগইট, ঢাকা

বিনিময় মূল্য: ১৫০ টাকা মাত্র।

ISBN:984-31-1426-0

Roqta Pissel Pather Jatree Gara

Written by Abdus Salam Miitul

Published by Professor's Publication, Dhaka

Price: Tk. 150.00 Only.

কিছু কথা

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আলীশানে শত কোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি– যিনি তাঁর বান্দাহ্র পৃথিবী ও আখিরাতের জীবনকে সুখ-সমৃদ্ধ ও শান্তির সৌরভে আমোদিত করার লক্ষ্যে তাঁরই প্রিয় হাবিবের মাধ্যমে কোরআনুল কারীম দান করেছেন এবং এই কোরআনকেই মানুষের একমাত্র জীবন ব্যবস্থা হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। অগণিত দরুদ ও সালাম পেশ করছি, মানবতার মহান মুক্তির দুত জনাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি।

আল্লাহর রাসূল, সাহাবায়ে কেরাম, শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ও যুগে যুগে যাঁরা দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাতিল শক্তির সাথে সংগ্রাম মুখর জীবন-যাপন করেছেন তাঁদের বিশাল ইতিহাস পরবর্তী যুগের দ্বীনি আন্দোলনের কর্মীদের জন্য পথ চলার মাইল ফলক এবং অনুপ্রেরণার পাথেয়। সেই বিশাল ইতিহাসের সবটুকুই মুসলমানদের জন্য অনুসরণীয় এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিয়োজিত কর্মীদের জন্য পথনির্দেশক। আন্দোলনের উত্তপ্ত ময়দানে পথ চলতে গিয়ে যা 'অসম্ভব' ও 'অকল্পনীয়' বলে হয়, অনুপ্রেরণাদায়ক ও সংগ্রামের কন্টকাকীর্ণ পথ চলায় উদ্দীপক এসব ঐতিহাসিক ঘটনাবলী হৃদয়ে জাগরুক থাকলে সেই 'অসম্ভব' ও 'অকল্পনীয়' বিষয়ই অত্যন্ত সহজ বিষয়ে পরিণত হয়– এ কথা প্রত্যেক যুগেই দ্বীনি আন্দোলনের কর্মীদের ক্ষেত্রে প্রমাণিত সত্য। বিপদের তমসাবৃত আবরণ ভেদ করে এসব ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর কিরণচ্ছটা প্রতি মুহূর্তে মহাসত্যের বাহকদেরকে আলোর পথের সন্ধান অতীতে যেমন দিয়েছে, বর্তমানেও দিচ্ছে এবং আগামীতেও দিতে থাকবে।

প্রত্যেক যুগেই ইসলামী আন্দোলন বাতিল শক্তির রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে সম্মুখপানে এগিয়ে গিয়েছে– বর্তমানেও এগিয়ে যাচ্ছে। আন্দোলনের ধারা পরিক্রমায় কখনো এমনটি দেখা যায়নি যে, এই পথে কেউ ফুল বিছিয়ে দিয়েছে। বরং দ্বীনি আন্দোলনের প্রতিটি বাঁকে বাধার বিন্ধাচল অটল-অচল হিমাদ্রীর মতোই দাঁড়িয়ে রয়েছে আর ইসলামের সৈনিকগণ সেই বাধা অতিক্রম করে জান্নাতের পথে ধাবমান– এটাই এই আন্দোলনের যথাযথ ইতিহাস। এর ব্যতিক্রম ঘটলে এ কথাই অনুমিত হবে যে, এই আন্দোলন তার লক্ষ্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

স্বকপোলকল্পিত কোনো কাহিনী দ্বারা এ গ্রন্থ সাজানো হয়নি। তাওহীদের অতন্দ্র প্রহরীগণ কিভাবে প্রবল বাধা অতিক্রম করে পথ চলেছেন এবং কোন্ উৎস থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে জান্নাতের পথে এগিয়ে গিয়েছেন— ইতিহাসের এসব দেদীপ্যমান ঘটনাবলীর কিছু অংশ এই গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে। আল কোরআনের সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যাঁরা বিরামহীন পথ চলছেন, এসব ঘটনাবলী তাঁদেরকে পথ চলায় সহযোগিতা করবে, পথ চলার ক্লান্তি দূর করবে, অনুপ্রেরণা দান করবে এবং কঠিন পথ অতিক্রমে উদ্দীপনা দান করবে ইন্‌শাআল্লাহ।

এ গ্রন্থের পান্ডুলিপি প্রণয়নে যিনি গভীর রাত পর্যন্ত প্রচন্ড ঠান্ডা উপেক্ষা করে অসুস্থ শরীরে আমাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়েছেন আমার সহধর্মিনী মাকছুদা আক্তার মিতা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে সর্বোত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন এবং কোরআনের সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অটল-অবিচল রাখুন। এ গ্রন্থে যেসব ঘটনা সন্নিবেশিত করা হয়েছে, সেই আলোকে আমি যেন আমার পরিবারের সকলকে নিয়ে জীবন পরিচালিত করতে সক্ষম হই এবং নাক থেকে যতক্ষণ নিঃশ্বাস নির্গত হতে থাকবে, ততক্ষণ যেন এই আন্দোলনের ছায়াতলে অবস্থান করতে পারি, পাঠক-পাঠিকাদের খেদমতে আমি এই দোয়া কামনা করি। একমাত্র আল্লাহর গোলামীর আলোয় আমাদের জীবন আলোকিত হোক, আল্লাহর একত্বের প্রতি ঈমান আরো বদ্ধমূল হোক, সুদৃঢ় হোক এটাই ঐকান্তিক কামনা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের ঈমানের বলে বলীয়ান করুন, একমাত্র তাঁরই গোলামী করার ঈমানী চেতনা শানিত ও উজ্জীবিত করুন। প্রকাশকসহ গ্রন্থটির সাথে ক্ষুদ্র-বৃহৎ, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ যার যতটুকু যোগ থাক আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালাল সবাইকে দান করুন এর উত্তম ও যথার্থ বিনিময়।

আল্লাহর অনুগ্রহের একান্ত মুখাপেক্ষী
আব্দুস সালাম মিতুল
২০ সেপ্টেম্বর '০৩

প্রকাশকের অভিমত

আল্লাহর সৃষ্টি এ সুন্দর পৃথিবীতে সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বের ইতিহাস অতি প্রাচীন। আল্লাহর অনুগত গোলামরা সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তে চেষ্টা-সাধনা করেছে সত্যকে উর্ধ্বে তুলে ধরতে। অন্যদিকে মিথ্যার ধজাধারীরা সত্যের কণ্ঠ রোধ করার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছে। ফুৎকারে নির্বাপিত করতে চেয়েছে সত্যের উজ্জ্বল আলোক শিখা। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, তারা বার বার ব্যর্থ হয়েছে। বাতিল শক্তির পৈশাচিক আঘাতে ইসলামী আন্দোলন ক্ষুদ্র ধূলিকণা থেকে বিরাট সাহারায় পরিণত হয়েছে। লাখো-কোটি মানুষের হৃদয় এই আন্দোলনের প্রজ্জ্বলিত আলোক শিখায় উদ্ভাসিত হয়েছে।

সত্যের বাহকদের সাথে বাতিল শক্তির দ্বন্দ্ব শেষ হয়নি-হবে না- কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামের যুগে নমরুদের অস্তিত্ব, মুছা আলাইহিস্ সালামের যুগে ফেরাউনের দম্ভ এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আবু জেহেলদের হুঙ্কার যেমন ছিল, বর্তমানেও কোরআনের সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিয়োজিত লোকদের সাথে দ্বন্দ্ব চলছে নব্য নমরুদ, ফেরাউন ও আবু জেহেল, আবু লাহাবসহ অসংখ্য বাতিল শক্তির সাথে। আন্দোলনের বৃক্ষকে সতেজ-সজিব রাখার জন্য বৃক্ষের গোড়ায় রক্ত সিঞ্চন করে চলেছে কোরআনের বিপ্লবী সৈনিকরা। শহীদ হাসান আল-বান্না, শহীদ আব্দুল কাদের আওদাহ, শহীদ সাইয়েদ কুতুবসহ কোরআনের অসংখ্য সৈনিকদের শাহাদাতের ইতিহাস এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে।

বালাকোটের শহীদান, শহীদ তিতুমীর ও সিপাহী বিপ্লবের শহীদান এবং এদেশে ১৯৬৯ সনের ১৫ই আগষ্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র আব্দুল মালেকের শাহাদাত থেকে শুরু করে গত ৬/১০/২০০৩ তারিখে কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে শফিকুর রহমান শিমুলের শাহাদাতসহ বিগত ৪৩/৪৪ বছরে অসংখ্য ভাই-বোন শহীদ হলেন বাতিল শক্তির হাতে। তাঁদের রক্তদানের ইতিহাস এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে, বাংলার যমীনে আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েমের পথে কোন শক্তিই আর বাধার সৃষ্টি করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ।

তাফসীরে সাঈদীর অনুলেখক ভাই আব্দুস সালাম মিতুল কর্তৃক লিখিত 'রক্ত পিচ্ছিল পথের যাত্রী যাঁরা' দুই খণ্ডে সমাপ্ত গ্রন্থ দুটো ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মনে শাহাদাতের অদম্য কামনা সৃষ্টি করে আন্দোলনের অগ্নিঝরা ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করবে বলে আমার বিশ্বাস। পৃথিবীর জীবনের এই সামান্য সময়টুকু একমাত্র মহান আল্লাহর গোলামীর মধ্য দিয়ে যেন অতিবাহিত হয় এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যেন আমরা সকলেই সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হই- আল্লাহ তা'য়ালার কাছে এই কামনা করে গ্রন্থ দুটো পাঠক-পাঠিকাদের হাতে তুলে দিলাম। এ গ্রন্থ দুটো প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯৪ সালের জানুয়ারী মাসে এবং এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি সংস্করণ শেষ হয়েছে। এ থেকেই অনুমান করা যায় গ্রন্থ দুটো বিদগ্ধ পাঠক মহল কর্তৃক সমাদৃত হয়েছে। বর্তমানে এ গ্রন্থের সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ পাঠকদের খেদমতে পেশ করা হলো। এরপরেও আমাদের অক্ষমতার দরুন নানা ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়ে গিয়েছে। আশা করি পাঠক মহল আমাদের অক্ষমতা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আপনাদের আন্তরিকতা ও দোয়া প্রার্থী।

এ এম আমিনুল ইসলাম
মগবাজার,ঢাকা
২৪ সেপ্টেম্বর'০৩

উৎসর্গ

পৃথিবীর অগণন মানুষের হৃদয়ের স্পন্দন শহীদী কাফেলা ইসলামী ছাত্র শিবিরের সকল শহীদদের উদ্দেশ্যে..........................

সূচীপত্র

প্রিয়হারা মর্মযন্ত্রণার কঠিন প্রহর

শিয়াবে আবি তালিবে অনাহারে বন্দী অবস্থাতেই আল্লাহর রাসূলের স্নেহদাতা চাচা আবু তালিবের জীবনি শক্তি প্রায় নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। আরবের বড় ব্যবসায়ী ধনীর দুলাল ছিলেন তিনি। কোনদিন তাঁকে ক্ষুধার যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে হবে তা বুঝি তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করেননি। একদিকে তিনি ছিলেন বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত, অপরদিকে অনাহার আর মানসিক যন্ত্রণা চরমভাবে রোগাক্রান্ত করে দিল। বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়েই তিনি রোগশয্যায় শায়িত হলেন। তাঁর রোগ ক্রমশ বৃদ্ধিই পাচ্ছিল। আরোগ্য হবার কোন আশাই ছিল না। শিয়াবে আবি তালিব থেকে বের হবার পরে মুসলমানদের ওপরে তেমন কোন অত্যাচার হয়নি। এই অত্যাচার না করার কারণ এটাই ছিল, ঝড়ের প্রাক্কালে সমুদ্র শান্ত থাকার মত। মক্কার ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী ছিল সুযোগের অপেক্ষায়।

ইতোপূর্বেও আবু তালিব একবার অসুস্থ হয়েছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম চাচাকে দেখতে গেলেন। আবু তালিব প্রিয় ভাতিজাকে বলেছিলেন– বাবা, যে আল্লাহ তোমাকে নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন তাঁর কাছে কি তুমি আমার রোগ মুক্তির জন্য দোয়া করো না?

আল্লাহর রাসূল চাচার রোগ মুক্তির জন্য দোয়া করেছিলেন, আবু তালিব সুস্থ হয়ে বলেছিলেন– বাবা, আল্লাহ তোমার কথা রক্ষা করেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন– আপনি যদি আল্লাহর কথা গ্রহণ করেন তাহলে তিনিও আপনার কথা রক্ষা করবেন।

আবু তালিবের শারীরিক অবস্থার অবনতি হচ্ছে–এ সংবাদ কুরাইশ গোত্রে ছড়িয়ে পড়েছিল। ইসলাম বিরোধিরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলো, আবু তালিব জীবিত থাকতেই তাঁর মাধ্যমে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে আপোষ করা প্রয়োজন। কেননা, ইসলাম সমস্ত গোত্রে ছড়িয়ে পড়ছে। আর যেন ইসলামের বিস্তৃতি ঘটতে না পারে এজন্যই একটা চুক্তিতে উপনিত হওয়া প্রয়োজন। আবু সুফিয়ান, উমাইয়া, উৎবা, শাইবা, আবু জেহেল ও কুরাইশদের বিখ্যাত নেতৃবৃন্দ আবু তালিবের কাছে উপস্থিত হয়ে বললো– আপনাকে আমরা কতটুকু শ্রদ্ধা করি তা আপনার অজানা নয়। বর্তমানে আপনি গুরুতর অসুস্থ, আপনার জীবন সম্পর্কে আমরা শঙ্কিত। আপনি জানেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি

ওয়াসাল্লামের সাথে আমাদের কোন্ বিষয় নিয়ে বিরোধ চলছে। আপনি যদি তাঁকে ডেকে আমাদের সাথে একটা আপোষ করে দেন তাহলে ভালো হত। সে আমাদের কাছ থেকে একটা অঙ্গীকার গ্রহণ করুক আমরাও তাঁর কাছ থেকে একটা অঙ্গীকার গ্রহণ করি। যেন আমাদের আর তাঁর ভেতরে ভবিষ্যতে কোন বিরোধের সূত্রপাত না হয়।

আবু তালিব স্নেহের ভাতিজার কাছে সংবাদ প্রেরণ করার পরে আল্লাহর রাসূল এসে উপস্থিত হলেন। শ্রদ্ধেয় চাচা বললেন– বাবা, যারা এখানে উপস্থিত তাঁরা সবাই তোমার পরিচিত এবং সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। তাঁরা তোমার একটা কথা গ্রহণ করবে এবং তুমিও তাদের একটা কথা গ্রহণ করবে।

আল্লাহর নবী উপস্থিত ইসলাম বিরোধী নেতৃবৃন্দকে বললেন– আপনারা যদি আমার একটা কথা গ্রহণ করেন তাহলে সমস্ত আরবের অধিপতি আপনারাই হবেন এবং আরবের বাইরের লোকজন আপনাদের অধীনে থাকবে।

কথাটার প্রকৃত অর্থ তাঁরা বুঝেছিল কিনা বলা যায় না কিন্তু আবু জেহেলের মনে কথাটা বোধহয় লোভের সঞ্চার করেছিল। দ্রুত সে বলেছিল– বেশ সুন্দর কথা! এমন কথা একটার পরিবর্তে অনেক শোনা যায়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন– আপনারা আমার সাথে শুধু একটা কথার সাথে ঐকমত্য পোষণ করুন, যে কথাটা আমার এবং আপনাদের উভয়ের কাছে গ্রহণ যোগ্য। কথাটা হলো, এক আল্লাহ্ ব্যতীত আমরা আর কারো দাসত্ব করবো না। আমরা তাঁর সাথে কারো শরীক করবো না।

কথাটা শোনার সাথে সাথে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত তালি দিল। তারপর একজন বললো– তোমার এ কথা যদি আমরা গ্রহণ করি তাহলে তো তোমার সাথে আমাদের আপোষেরই প্রয়োজন হয় না। সমস্ত বিরোধের তো এখানেই ইতি ঘটে যায়। তুমি আমাদেরকে অবাক করলে।

এরপর তাঁরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলো– আমরা যে আশায় এসেছিলাম তা হবে না। অতএব চলে যাওয়া যাক, আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে একটা সিদ্ধান্ত না করা পর্যন্ত আমরা আমাদের মতই চলবো।

মক্কার নেতৃবৃন্দ চলে যাবার পরে আবু তালিব প্রিয় ভাতিজাকে বললেন– তুমি যা বলেছো ঠিক বলেছো। অন্যায় কিছু বলোনি।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচার মুখে এ কথা শুনে ধারণা

করলেন, চাচা বোধহয় ইসলাম কবুল করবেন। তিনি শ্রদ্ধেয় চাচাকে অনুরোধ জানালেন– চাচা! আপনি একবার কালিমা পড়ুন, তাহলে আমি আখিরাতের দিন আপনার সম্পর্কে সুপারিশ করতে পারবো।

আবু তালিব বললেন– আমার মৃত্যুর পরে সবাই মন্তব্য করবে যে, আমি মৃত্যুর ভয়ে ইসলাম কবুল করেছি। আমি ঐ কথাটা তোমার সন্তুষ্টির জন্য বলেছি।

এ সমস্ত ঘটনার পরে আবু তালিব ইন্তেকাল করলেন। মৃত্যুর সময় তাঁর ঠোঁট দুটো নড়ছিল। হযরত আব্বাস (রা) নিজের কান তাঁর মুখের কাছে নিয়ে শোনার চেষ্টা করলেন, তাঁর ভাই কি বলছেন। তারপর তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বললেন– বাবা, তুমি যা পাঠ করতে বলেছিলে, আমার ভাই তা পাঠ করছে।' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন– আমি কিছুই শুনতে পাইনি। (ইবনে হিশাম)

আরেক বর্ণনায় দেখা যায়, আবু তালিবের ইন্তেকালের সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন। কাফির নেতা আবু জেহেল, উমাইয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিল। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম চাচার ইন্তেকালের সময় বললেন– আপনি কালিমা পড়ুন, আমি আল্লাহর কাছে সাক্ষী দেব যে আপনি ইসলাম কবুল করেছিলেন।

আবু জেহেল এবং উমাইয়া দ্রুত আবু তালিবকে বললো– হে আবু তালিব! তুমি কি তোমার পূর্বপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করে মৃত্যুবরণ করবে?

আবু তালিব বললেন– আমি আমার পূর্বপুরুষের ধর্মেই প্রাণ ত্যাগ করবো।

এরপর তিনি ভাতিজাকে বললেন– আমি ইসলাম গ্রহণ করেই মৃত্যুবরণ করতাম কিন্তু কুরাইশরা বলবে যে, আমি মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম।

আল্লাহর রাসূল বললেন– আপনার মুক্তির জন্য আমি আল্লাহর কাছে বলতে থাকবো, আল্লাহ যতক্ষণ আমাকে নিষেধ না করেন। (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আল্লাহর রাসূলের কাছে জানতে চাইলেন– হে আল্লাহর রাসূল! আবু তালিব আপনার জন্য শত্রু কবলিত হয়ে নির্যাতন ভোগ করেছেন। তিনি আপনাকে হেফাজত করেছেন। এর বিনিময়ে তিনি আপনার কাছ থেকে কি লাভ করেছেন?

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন– আবু তালিব তাঁর পায়ের টাখনু পর্যন্ত দোযখে অবস্থান করছে এবং আগুনের উত্তাপ মাথা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আমি না থাকলে তাকে দোযখের সর্বশেষ অবস্থানে নিক্ষেপ করা হত। (বুখারী)

তবে অনেকে দাবি করেন যে, আবু তালিব মুসলমান হয়ে ইন্তেকাল করেছেন কিন্তু এ দাবীর পেছনে দৃঢ় কোন প্রমাণ নেই। এ সম্পর্কে তাঁরা যে সমস্ত হাদীস পেশ করেছেন, সেসব হাদীসের বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাঁরা কেউ আবু তালিবের ইন্তেকালের সময় উপস্থিত ছিলেন না। উপস্থিত ছিলেন আবু তালিবের ভাই হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। আবু তালিবের ইন্তেকালের পরে তিনি ইসলাম কবুল করেছিলেন। যদিও তাঁর স্ত্রী প্রথম দিকেই ইসলাম কবুল করেছিলেন। হযরত আব্বাস আবু তালিবের ঠোঁট নাড়া দেখে অনুমান করেছিলেন যে, তিনি কালিমা পাঠ করছেন। তিনি স্পষ্ট কিছুই শোনেননি। তিনি যদি জানতেন যে, আবু তালিব ইসলাম কবুল করেই ইন্তেকাল করেছেন, তাহলে তিনি মৃত্যু যবনিকার ওপারে আবু তালিবের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহর রাসূলে কাছে জানতে চাইতেন না এবং আল্লাহর নবীও অমন জবাব দিতেন না। এ কারণে অধিকাংশ ইসলামী চিন্তাবিদদের অভিমত হচ্ছে, আবু তালিব ইসলাম গ্রহণ না করেই ইন্তেকাল করেছেন।

স্নেহদাতা চাচা আবু তালিব আর এই নশ্বর ধরাধামে নেই– বিশ্বমানবতার মহান মুক্তির দুত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মন-মানসিক শোকাচ্ছন্ন। এই মর্মান্তিক শোকের সাগর পাড়ি না দিতেই শোকের আরেকটি তীব্র শরাঘাত বিদ্ধ হলো করুণার মূর্ত প্রতীক আল্লাহর রাসূলের বুকে। সার্বিক অবস্থায় উদ্দীপনা দানকারিণী ও সান্ত্বনা দায়িনী জীবন সঙ্গিনী প্রিয়তমা খাদিজার পৃথিবীর জীবন নিঃশেষ হয়ে এলো। তিনি আল্লাহর রাসূলের পৃথিবীর জীবন থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করে প্রিয় বন্ধু আল্লাহর নিকট চলে গেলেন। আল্লাহর হাবীবকে চরম সঙ্কট মুহূর্তে মানুষের মধ্য থেকে সান্ত্বনা দেয়ার মতো আর কেউ অবশিষ্ট রইলো না। তাঁর দুর্দিনের সাথী খাদিজা এই পৃথিবী ছেড়ে বিদায় গ্রহণ করলেন। অবরোধ থেকে মুক্তি লাভের পরই বোধহয় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অনুমান করতে পেরেছিলেন, তাঁর মমতাময়ী খাদিজা আর তাঁর কাছে থাকবে না। যে নারীর শরীরে অভাবের আঁচড় কোনদিন স্পর্শ করেনি, সেই নারী তাঁকে স্বামী হিসেবে কবুল করার পরে কতদিনই না অনাহারে থেকেছেন। হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা তাঁর সমস্ত ধন-সম্পদ ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যয় করেছিলেন। এ কারণে কোন কোন ভক্ত বলে থাকেন, মা খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার ধন-দৌলত না থাকলে ইসলাম এতদূর পৌঁছাতো কিনা আল্লাহই ভালো জানেন। তবে এ কথা অবশ্যই সত্য যে, মহান আল্লাহ তাঁর নবীর কার্যক্রম যে সামনের দিকেই এগিয়ে নিতেন এতে কোন সন্দেহ নেই।

হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা রমজান মাসের এগার তারিখে ইন্তেকাল করেছিলেন। কোন কোন বর্ণনাকারী বলেছেন, আবু তালিবের পূর্বে হযরত খাদিজা ইন্তেকাল করেছিলেন। তবে অধিকাংশ বর্ণনাকারীর মতে আবু তালিবের মৃত্যুর কয়েক দিন পরেই হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ইন্তেকাল করেছিলেন। ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করার তিন বছর পূর্বে তিনি তাঁর পরম প্রিয় দু'জন ব্যক্তিত্বকে চিরদিনের মতই হারিয়ে ছিলেন। এই দু'জন যে তাঁর জন্য কি ছিলেন, তাঁদের যে কি অবদান, তাঁদের ত্যাগের যে কি মহিমা তা বর্ণনা করার ভাষা কারোরই নেই। সে সময়ে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এই পৃথিবীর মানুষের মধ্যে সান্ত্বনা দেয়ার মত কেউ ছিল না। হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহাকে দাফন করা হয়েছিল জিহুন নামক স্থানে। তখন পর্যন্ত জানাযার নামাযের আদেশ অবতীর্ণ হয়নি বিধায় তাঁর জানাযা নামায আদায় করা হয়নি। আল্লাহর রাসূল স্বয়ং কবরে অবতরণ করে প্রিয় সঙ্গিনীকে অন্তিম শয়নে শায়িত করেছিলেন।

নেই-বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দান করার মত কোন মানুষ আর নেই। বড় একা হয়ে গেলেন তিনি। মা হারা ছোট্ট মেয়ে ফাতিমার করুণ মুখের দিকে তাকালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের বুকের ভেতরটা মর্মযন্ত্রণায় হাহাকার করে উঠতো। কাফিরদের হাতে অত্যাচার সহ্য করে তিনি বাড়িতে আসতেন। হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার মমতাপূর্ণ সান্ত্বনায় তিনি কাফিরদের অত্যাচারের সব ব্যথা-বেদনা মুহূর্তে ভুলে যেতেন। তাঁর কাছ থেকে তিনি উৎসাহ-উদ্দীপনা লাভ করতেন। তিনি নতুন উদ্যোমে তাঁর কার্যক্রমে গতি সঞ্চার করতেন। এখন আর তাকে কে দেবে সান্ত্বনা! আবু তালিবের মত পরম মমতায় কে বলবে, 'বাবা, কোন ভয় নেই। কেউ তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যাও, আমি আছি তোমার সাথে।' এ কথা বলার আর কেউ রইলো না। আর মক্কার কাফিররা অতীতের যে কোন তুলনায় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওপরে নির্যাতনের রোলার চালিয়েছিল এই দু'জন মানুষের অবর্তমানে। এ কারণে ইতিহাসে এই বছরকে 'শোক দুঃখের বছর' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এমনই এক চরম মুহূর্তে দু'জন প্রিয় ব্যক্তিত্ব নবীকে ছেড়ে চলে গেলেন, যে মুহূর্তে ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের ওপর ইতিহাসের নির্মম-নিষ্ঠুর নির্যাতন মক্কার ইসলামী আন্দোলন বিরোধী গোষ্ঠী চালিয়ে যাচ্ছে। হাতে গোনা কয়েকজন লোক,

তাঁদের অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। নির্যাতনে নির্যাতনে দেহ-মন ভেঙ্গে পড়ার মত অবস্থা। কে কাকে কে সান্তনা যোগায়। আল্লাহর রাসূলের মাতৃহারা অবোধ শিশুগুলো পিতার এই দূরাবস্থা দর্শনে অত্যন্ত ব্যাকুল। তিনি চরম বিপদের মুখে একমাত্র আল্লাহর ওপরে নির্ভর করে অসীম ধৈর্য ও সাহস নিয়ে আন্দোলনের রক্তঝরা ময়দানে দৃঢ়পদে অবস্থান গ্রহণ করলেন।

হেরি বর্বরতা ফেলেছে পাষাণ আঁখিজল

প্রতিবাদ করার যখন কেউ থাকে না বা প্রতিবাদ করার সাহস যখন কেউ করে না, তখন অপরাধীদের দৌরাত্ম বৃদ্ধি পাবে এটাই স্বাভাবিক। আবু তালিবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সে সময়ে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওপরে শারীরিকভাবে নির্যাতন কেউ করতে পারেনি। আবু তালিব আর পৃথিবীতে নেই, প্রেমময়ী খাদিজাও নেই। কে ছুটে আসবে নবীর পাশে! মক্কার কাফিররা নির্ভীক চিত্তে নবীর ওপরে অত্যাচার শুরু করে দিল। ইসলাম বিরোধিদের ধারণা, বিগত দিনে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচার আশ্রয়ে ইসলামী কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন, এখন তাঁর আশ্রয়দাতা নেই। এবার তাঁর ওপরে নির্যাতন শুরু করে দিলে সে বাধ্য হয়েই এই কার্যক্রম ত্যাগ করবে। এই অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁরা আল্লাহর রাসূলের সাথে অকারণে অমানবিক আচরণ শুরু করলো। নির্যাতনের নিত্য-নতুন পদ্ধতি তাঁরা প্রয়োগ করতে থাকলো।

আল্লাহর নবী যে পথ দিয়ে কা'বায় আসবেন, সে পথে ময়লা আবর্জনা বা বিষাক্ত কাঁটা বিছিয়ে রাখতো কাফির গোষ্ঠী। তিনি কা'বায় নামাজ আদায় করছেন, তাঁকে নানাভাবে বিদ্রূপ করা হতো। নামাজে সিজদারত রয়েছেন আল্লাহর নবী, এ সময় তাঁর পবিত্র মাথায় উটের পচা গলিত নাড়ি-ভুড়ি চাপিয়ে দেয়া হতো। ছোট্ট মেয়ে ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা পিতার এই করুণ অবস্থা দেখে আর্তচিৎকার করে কাঁদতেন আর পিতার মাথার ওপর থেকে আবর্জনা সরিয়ে পিতাকে ভার মুক্ত করতেন। তিনি নামাযে দাঁড়িয়েছেন, তাঁর পবিত্র গলায় কাপড় জড়িয়ে দু'দিক থেকে এমনভাবে টেনে ধরা হত যে, তাঁর শ্বাস বন্ধ হয়ে যেত। ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেছেন, এতে করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কণ্ঠে দাগ হয়ে যেত। তিনি বাইরে বের হলেই মক্কার কাফির নেতৃবৃন্দ দুষ্ট প্রকৃতির ছেলেদেরকে

তাঁর পেছনে লেলিয়ে দিত। তাঁরা আল্লাহর রাসূলের পেছনে পেছনে যেত আর তাঁকে বিদ্রুপ করতো।

তিনি নামাযে উচ্চকণ্ঠে কোরআন তিলাওয়াত করতেন আর আবু জেহেল তাঁর সাথিদের নিয়ে নবীকে গালাগালি দিতো। আল্লাহর নবী বাজারে গেলেন। সেখানে লোকজনকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন। আবু জেহেল লোকদেরকে বললো– তোমরা এই লোকটার কথায় কান দিও না। এই লোকের প্রতারণায় তোমরা নিপতিত হবে না। এ লোক ধোকাবাজ যাদুকর। (নাউযুবিল্লাহ)

কথা শেষ করে আল্লাহর দুশমন আবু জেহেল লোকজনের সামনে আল্লাহর নবীর পবিত্র শরীরে নোংরা কাদা নিক্ষেপ করলো। আল্লাহর নবী কা'বায় নামায আদায় করছেন। কাফিরের দল দূরে বসে তাঁকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করছিল। হঠাৎ আবু জেহেল বলে উঠলো– মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে সিজদা করে তখন তাঁর মাথার ওপরে উটের নাড়ি-ভুড়ি চাপিয়ে দিলে ভালো হয়। তোমরা কি কেউ এ কাজ করতে পারবে?

সত্যের শত্রু ওকবা বললো– তোমরা দেখো, আমিই তাঁর মাথায় উটের নাড়ি-ভুড়ি চাপিয়ে দিচ্ছি।' এ কথা বলেই সে উটের নাড়ি-ভুড়ি এনে বিশ্বনবীর মাথার ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল। আল্লাহর রাসূল তখন নামাজে সিজদায় ছিলেন। মাথা উঠাতে পারলেন না তিনি। নবীর এই কষ্ট দেখে কাফিরের দল হেসে হেসে একজনের শরীরে আরেকজন লুটিয়ে পড়ছিল। পাঁচ বছরের শিশু মেয়ে ফাতিমা পিতার এই দূরাবস্থার সংবাদ পেয়ে করুণ কণ্ঠে আর্তনাদ করে ছুটে এলেন। কচি হাত দুটো দিয়ে পরম মমতায় পিতার মাথা থেকে আবর্জনা পরিষ্কার করে কাফিরদের বিরুদ্ধে মহান আল্লাহর দরবারে বিচার চাইলেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে মক্কার ইসলাম বিরোধী লোকগুলো নিজেরা তো ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করতোই সেই সাথে মক্কায় যাদের নতুন আগমন ঘটতো, তাদের সামনেও তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করতো আবু জেহেলের অনুসারীরা। মক্কার বাইরের একজন লোক একটা উট নিয়ে মক্কায় এসেছিল। আবু জেহেল সে উট কিনে নিয়ে উটের মালিককে অর্থ প্রদান করতে অনিচ্ছা প্রদর্শন করতে থাকে। লোকটা যখন বুঝলো আবু জেহেল তাকে অর্থ না দিয়েই উট নিয়ে নেবে তখন সে কা'বাঘরে এসে চিৎকার করে বলতে থাকে– আবু জেহেল আমার উট নিয়ে তার মূল্য পরিশোধ করছে না। সে আমার ওপরে জুলুম করছে। আপনাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন, যিনি এই জুলুমের প্রতিকার করবেন? আমার অধিকার আমাকে আদায় করে দিবেন?

লোকটির কথা শুনে কাফিরের দল মনে করলো আল্লাহর রাসূলকে হাসির পাত্রে পরিণত করার এই তো সুযোগ। মক্কার বাইরের ঐ লোকটির সামনে আবু জেহেল যেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অপমান করে সে ব্যবস্থা করলো। লোকটিকে তারা ডেকে আল্লাহর রাসূলকে ইশারায় দেখিয়ে দিয়ে বললো– ঐ লোকটির কাছে যাও, সে তোমার অধিকার আদায় করে দেবে।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সে সময়ে কা'বায় অবস্থান করছিলেন। লোকটি তাদের কথানুসারে আল্লাহরা রাসূলের কাছে সমস্ত ঘটনা বলে আবেদন করলেন– হে আল্লাহর বান্দাহ! আপনার ওপরে আল্লাহ রহমত নাযিল করুন, আপনি আবু জেহেলের কাছ থেকে আমার অধিকার আদায় করে দিন।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম লোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন– তুমি আমার সাথে চলে এসো, আমি তোমার অধিকার আদায় করে দিচ্ছি।

কথা শেষ করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম লোকটিকে সাথে করে আবু জেহেলের বাড়ির দিকে চললেন। ওদিকে কাফিররা একজনকে আল্লাহর রাসূলের পেছনে প্রেরণ করলো আবু জেহেল কিভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অপমান করে তা দেখার জন্য। আল্লাহর নবী আবু জেহেলের বাড়ির দরজায় আঘাত করলেন। সে ভেতর থেকে জানতে চাইলো আগন্তুকের পরিচয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন– দরজা খুলে বাইরে এসো।

আবু জেহেল বাইরে এসে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই তাঁর চেহারায় মৃত্যু আতঙ্ক ফুটে উঠলো। গোটা অবয়ব বিবর্ণ হয়ে গেল– সে যেন তার সামনে মৃত্যুদূত দেখছে। আল্লাহর নবী গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ দিলেন– এই লোকের যে অধিকার রয়েছে তোমার কাছে, তাঁর অধিকার তাকে বুঝিয়ে দাও।

আবু জেহেল আতঙ্কিত কণ্ঠে বললো, 'এখুনি দিচ্ছি।' এ কথা বলেই সে তার ঘরে গিয়ে দ্রুত অর্থ এনে লোকটিকে দিয়ে দিল। আল্লাহর রাসূলও কা'বায় ফিরে এলেন। বিদেশী লোকটি কা'বায় এসে কাফিরদেরকে বললো– মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওপর রহমত নাযিল করুন, তিনি আমার অধিকার আদায় করে দিয়েছেন।

কাফিররা ধারণা করেছিল আবু জেহেল লোকটির সামনে আল্লাহর রাসূলকে অপমান করবে। কিন্তু বিষয়টি হলো উল্টো। আশাহত কাফিররা প্রকৃত ঘটনা জানার জন্য

উদগ্রীব হয়ে উঠলো। ইতোমধ্যে আবু জেহেল সেখানে এলো। তাঁর চেহারা থেকে তখন পর্যন্ত ভয়ের চিহ্ন মুছে যায়নি। অন্যরা তাকে জিজ্ঞাসা করলো- ঘটনা কি? তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কথায় মূল্য দিয়ে দিলে?

আবু জেহেল বললো- মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কথায় মূল্য না দিলে সে ভয়ঙ্কর উট আমাকে খেয়ে ফেলতো। আমি দরজা খোলার পরে দেখলাম তাঁর পেছনে একটা বিরাট উট দাঁড়িয়ে আছে। খোদার শপথ! তেমন উট আমি কোথাও দেখিনি। উটের চেহারা বড় ভয়ঙ্কর, আমি মূল্য প্রদান না করলে উট আমাকে খেয়ে ফেলতো। (ইবনে হিশাম)

এভাবেই সেদিন আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূলকে অপমান করার কাফিরদের ষড়যন্ত্র বান্চাল করে দিয়েছিলেন। এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা তাঁরা ঘটিয়েছে। যারা প্রত্যক্ষভাবে নবীর সাথে শত্রুতা করেছে, মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে তাদের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। রাসূলের চাচা আবু লাহাব এবং তাঁর স্ত্রী উম্মে জামিল আল্লাহর নবীকে নানাভাবে অত্যাচার করেছে। তাদের পরিণতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনের সূরা লাহাব অবতীর্ণ করেছেন। আবু লাহাব যখন জানতে পারলো তাঁর পরিণতি সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, তখন সে পাথর খন্ড নিয়ে আল্লাহর রাসূলকে আঘাত করার জন্য কা'বায় বসে থাকলো।

কিছুক্ষণ পরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সঙ্গী আবু বকরকে সাথে করে কা'বায় এলেন। মহান আল্লাহ আবু লাহাবের চোখ থেকে তাঁর রাসূলকে অদৃশ্য করে দিলেন। আবু লাহাব হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে জিজ্ঞাসা করলো- কোথায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম? আমি জানতে পারলাম সে আমার সম্পর্কে শাস্তির কথা বলছে। তাঁকে এখন আমি কাছে পেলে এই পাথর দিয়ে আঘাত করতাম।

এ কথা বলে গর্বিত ভঙ্গিতে সে চলে গেল। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কাছে জানতে চাইলেন- হে আল্লাহর রাসূল! আবু লাহাব আপনাকে দেখতে পেল না কেন?

আল্লাহর রাসূল বললেন- সে আমাকে দেখতে পায়নি। আল্লাহ তার চোখকে আদেশ দিয়েছিলেন যেন সে আমাকে দেখতে না পায়।

কাফির নেতা উমাইয়া ইবনে খালফ আল্লাহর রাসূলকে দেখা মাত্র কটুবাক্য বর্ষণ করতো এবং অকারণে হৈচৈ করতো। লোকদের কাছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে নিন্দা করতো। এই নিকৃষ্ট লোকটির অশুভ পরিণতি

এবং তাঁর চরিত্রের খারাপ দিক সম্পর্কে মহান আল্লাহ সূরা হুমাঝা অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহর রাসূলের সাহাবী হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন একজন কর্মকার। তিনি লৌহজাত অস্ত্র নির্মাণ করে বিক্রি করতেন। তাঁর কাছ থেকে তরবারী ক্রয় করেছিল আ'স ইবনে ওয়ায়েল নামক এক কাফির। সম্পূর্ণ অর্থ সে তখন পর্যন্ত পরিশোধ করেনি। হযরত খাব্বাব তার কাছে তরবারীর মূল্য চাইলেই সে বিদ্রুপ করে বলতো- হে খাব্বাব! তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তো বলে বেড়ায় জান্নাতে যারা যাবে তাঁরা ইচ্ছে অনুযায়ী স্বর্ণ রৌপ্য হিরা জহরত ও অসংখ্য দাস দাসী পাবে, তাঁর কথা ঠিক কিনা?

হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু জবাব দিতেন- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কথা অবশ্যই ঠিক।

আ'স ইবনে ওয়ায়েল বিদ্রুপ করে বলতো- হে খাব্বাব! তাহলে আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত সময় দাও! আমি তোমাদের ঐ জান্নাতে গিয়েই তোমার অর্থ পরিশোধ করবো। আমি খোদার শপথ করে বলছি, তুমি আর তোমার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমার চেয়ে বেশী মর্যাদা লাভ করতে পারবে না। আমার চেয়ে বেশী সৌভাগ্যবান হতে পারবে না।

এই কাফিরের ঘৃণ্য পরিণতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনের সূরা মরিয়মের আয়াত অবতীর্ণ করেন। নাদার ইবনে হারেস ছিল ইসলামের আরেক শত্রু। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন কোরআন তিলাওয়াত করতেন, লোকদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাতেন, ইসলামের সাথে অতীতে বিরোধিতা করার কারণে আল্লাহর গযবে পড়ে ধ্বংস হয়েছে, এসব ইতিহাস শোনাতেন তখন এই কাফির সে সমাবেশে নীরবে বসে থাকতো। আল্লাহর নবী চলে যাবার পরে সে উঠে দাঁড়িয়ে মানুষদেরকে বলতো- মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যা বলে তার কোন ভিত্তি নেই। তাঁর বলা কাহিনী সেই প্রাচীন যুগের গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁর তুলনায় আমি অনেক ভালো কাহিনী জানি।

এই লোকের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ সূরা ফুরকানের আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। আরেকজন কাফির আখনাস ইবনে শুরাইক, সেছিল সমাজের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। এই লোকটি নানাভাবে আল্লাহর নবীকে অত্যাচার করতো। তার নিন্দনীয় পরিণতি সম্পর্কে সূরা কলমের আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহর দুশমনদের নেতা ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা বলতো- আমি এবং আবু মাসউদের মত প্রভাবশালী লোক থাকতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মত লোকের ওপরে ওহী নাযিল হলো? আল্লাহ আর লোক পাননি বুঝি?

এই কাফিরদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ সূরা যুখরুফের আয়াত অবতীর্ণ করে তাদের কথার প্রতিবাদ করে তাদের নির্মম পরিণতির কথা উল্লেখ করেছেন। ইসলামের দুশমন উকবা এবং উবাই ছিল ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন এক সমাবেশে মানুষদেরকে ইসলামের কথা বলছিলেন, তখন উকবা এসে রাসূলের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। উবাই এ সংবাদ জানতে পেরে ছুটে এসে তাঁর বন্ধু উকবাকে বললো– তুমি তাঁর কথা শুনো তা কি আমি জানিনা মনে করেছো? তুমি যদি তাঁর চেহারায় থুথু নিক্ষেপ না করো তাহলে তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্কে থাকবে না।

হতভাগা উকবা বন্ধুর কথায় তাই করেছিল, কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা কাফিরের অপবিত্র থুথু থেকে তাঁর নবীকে হেফাজত করেছিলেন। মহান আল্লাহ্ উকবা এবং উবাইকে জাহান্নামের অতলে নিমজ্জিত করুন। তাদের কঠিন পরিণতি সম্পর্কে পবিত্র কোরআনেব আয়াত অবতীর্ণ করে তাদের ভয়ংকর অবস্থা সম্পর্কে জানিয়ে দিলেন। একদিন উবাই একটা পুরোনো হাড় এনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বললো– হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম! তোমার কি বিশ্বাস হয় এই পচা হাড়কে আল্লাহ্ আবার জীবিত করবে?' এ কথা বলে সে হাড়টি গুড়ো করে বাতাসে উড়িয়ে দিল।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম দৃঢ়কণ্ঠে বললেন– মহান আল্লাহ্ বাতাসে মিশ্রিত হাড়কে আবার জীবিত করবেন এবং জাহান্নামে প্রেরণ করবেন।' এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْحَدِيْدًا-اَوْخَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِىْ صُدُرِكُمْ-فَسَيَقُلُوْنَ مَنْ يُّعِيْدُنَا-قُلِ الَّذِىْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُوْنَ اِلَيْكَ رُءُوْسَهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ مَتّٰى هُوَ قُلْ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا-

এদেরকে বলে দাও, তোমরা পাথর বা লোহাই হয়ে যাও অথবা তার চাইতেও বেশী কঠিন কোন জিনিস, যার অবস্থান তোমাদের ধারণায় জীবনীশক্তি লাভ করার বহুদূরে (তবুও তোমাদের ওঠানো হবেই)। তারা নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবে, কে আমাদের আবার জীবনের দিকে ফিরিয়ে আনবে? জবাবে বলো, তিনিই, যিনি প্রথমবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন। তারা মাথা নেড়ে নেড়ে জিজ্ঞেস করবে, আচ্ছা,

তাহলে এটা কবে হবে ? তুমি বলে দাও, অবাক হবার কিছুই নেই, সে সময়টা হয়তো নিকটেই এসে গেছে। (সূরা বনী ইসরাঈল-৫০-৫১)

আরেকদিন বিশ্বনবী কা'বাঘর তাওয়াফ করছিলেন, এ সময়ে কাফের নেতারা বিশ্বনবী কে ঘিরে ধরে প্রস্তাব দিল- এসো, আমরা একটা প্রক্রিয়ায় আমাদের বিরোধ শেষ করে দেই। তাহলো, আমরা তোমার আল্লাহর দাসত্ব কিছুটা করি তুমিও আমাদের প্রতিপালকের দাসত্ব কিছুটা করো। তাহলে আর আমাদের ভেতরে কোন বিরোধ থাকবে না।

তাদের কথার জবাবে মহান আল্লাহ্ সূরা কাফেরূন অবতীর্ণ করে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, 'হে নবী আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন আমি যার দাসত্ব করি তোমরা তাঁর দাসত্ব করো না। তোমরা যার দাসত্ব করো আমি তাঁর দাসত্ব করি না। তোমাদের জন্য তোমাদের জীবন ব্যবস্থা আর আমার জন্য আমার জীবন ব্যবস্থা।'

ইসলামে আপোষের কোন স্থান নেই-সহঅবস্থানের স্থান রয়েছে। কোন সাম্প্রদায়িকতার স্থান নেই ইসলামে- যার যার ধর্ম সে সে অবশ্যই পালন করবে। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার স্থান ইসলামে নেই। পবিত্র কোরআনের এই আয়াত দিয়ে যারা ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে কথা বলেন তাদের উচিত আয়াতটির পটভূমি দেখা। পৃথিবীর কোন নবী-রাসূল ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে ছিলেন না। কাফির এবং ধর্মনিরপেক্ষদের সাথেই তাদের সংঘর্ষ হয়েছে। নবীগণের আগমন ঘটেছেই মহান আল্লাহর বিধান রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে। সুতরাং কোরআনের আয়াতকে যারা ক্ষুদ্র স্বার্থে ব্যবহার করে তাদের সতর্ক থাকা উচিত। মহান আল্লাহর ক্রোধ যে কোন মুহূর্তে অবতীর্ণ হতে পারে।

সূরা কাফিরূনের ভাষ্য হলো, তোমরা যেসব মা'বুদের দাসত্ব করছো, আমি তোমাদের মা'বুদের দাসত্ব বা গোলামী করতে পারি না। তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা যার যার পূজা-উপাসনা করেছো, তার পূজারী হওয়া তাওহীদের অনুসারীদের পক্ষে সম্ভব নয়। আর অধিক সংখ্যক মা'বুদের পূজা-উপাসনা পরিত্যাগ করে এক ও একক মা'বুদের ইবাদাত গ্রহণ করার ব্যাপারে তোমাদের মনে যে বিতৃষ্ণা ও অনমনীয়তা দেখা যাচ্ছে তাতে তোমরা নিজের ভ্রান্ত ইবাদাত থেকে বিরত হবে এবং আমি যে আল্লাহর ইবাদাত করি তাঁর ইবাদাত তোমরা করবে, এই আশা তোমাদের ব্যাপারে পোষণ করা যায় না। সুতরাং তোমাদের পথ এবং আমাদের পথ কখনো একই মোহনায় মিলিত হতে পারে না। জাহিলিয়াতের সবটাই জাহিলিয়াত আর ইসলামের সবটাই ইসলাম, সুতরাং এ দুয়ের কখনো সহ-অবস্থান হতে পারে না এবং পরস্পরে হাত ধরাধরি করে চলতেও পারে না।

ইসলাম গ্রহণ করে ইসলাম নামক ঘরে প্রবেশ করতে হলে জাহিলিয়াতের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করেই তবে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে। ইসলামের কতিপয় বিধি-বিধানও অনুসরণ করা হবে এবং জাহিলিয়াতেরও কিছু বিধি-বিধান অনুসরণ করা হবে তথা ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করা হবে, এই অবকাশ ইসলাম কাউকে দেয়নি। মুসলমান নামধারী এক শ্রেণীর নাদান ব্যক্তিবর্গ এই সূরার লাকুম দ্বীনুকুম অলিয়াদ্বীন–আয়াতকে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের স্বপক্ষে দলীল হিসাবে পেশ করে থাকে। তাদের জেনে রাখা উচিত এ আয়াত ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের দলীল নয়–বরং যার যার ধর্মের পক্ষে থাকার শ্রেষ্ঠ দলীল। তাছাড়া দুনিয়ার সকল মোফাস্সিরীন ও মুহাদ্দিসীন একমত যে, ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ কোরআনের দৃষ্টিতে একটি কুফ্রি মতবাদ। আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল তথা পরকালে বিশ্বাসী কোন মুসলমান ধর্মনিরপেক্ষতার আন্দোলনে শরীক হতে পারেনা। কারণ এ মতবাদ ঈমানকে খন্ডিত করে।

এ ব্যাপারে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর ঘোষণা বলবৎ থাকবে যে, খন্ডিতভাবে ইসলাম অনুসরণ করা যাবে না বা ব্যক্তি জীবনে ইসলামের নামাজ-রোজা-হজ্জ-এর বিধান পালন করা হবে, আর সামাজিক বা রাজনৈতিক জীবনে জাহিলিয়াতের বিধান অনুসরণ করা হবে, এই সুযোগ আল্লাহ তা'য়ালা কাউকে দেননি। এ ব্যাপারে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করতে বলা হয়েছে, তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন এবং আমাদের জন্য আমাদের দ্বীন। এ দুয়ের সংমিশ্রণ, সহ-অবস্থান, সন্ধি, পরস্পর তাল মিলিয়ে চলার কোন পথ উন্মুক্ত নেই।

মুসলমানদের দ্বীন হচ্ছে সম্পূর্ণ নির্ভেজাল তাওহীদ ভিত্তিক দ্বীন এবং এর চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, আইন-বিধান, আকীদা-বিশ্বাস তথা জীবনের সামগ্রিক দিক সম্পূর্ণভাবে মহান আল্লাহর দেয়া বিধানের অনুকূলে প্রবাহিত হয়। এর মধ্যে শিরকের কোন নাম-গন্ধও নেই। এর কোন একটি পর্যায়ে বা স্তরে শিরকের কোন মিশ্রণ নেই এবং শিরকের প্রতি সামান্যতম নমনীয়তাও নেই। সম্পূর্ণ শিরকের পঙ্কিলতা মুক্ত এক পবিত্র পরিচ্ছন্ন জীবন ব্যবস্থা। এই জীবন ব্যবস্থার সাথে শিরকের বিন্দুমাত্র আপোষ হতে পারে না–এ জন্য চিরস্থায়ীভাবে এই ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের পথ তোমাদের জন্য আর আমার পথ আমার জন্য। তোমরা যে জীবনধারা অনুসরণ করছো, তা একান্তভাবেই তোমাদের জন্যই, আর আমরা যে জীবনধারা অনুসরণ করছি, তা একান্তভাবেই আমাদেরই জন্য। এর ভেতরে আপোষ করার কোন সুযোগই নেই।

ইসলামে শক্তি প্রয়োগের স্থান নেই। ইসলাম তাঁর আকিদা-বিশ্বাসকে গ্রহণ করতে

কাউকে বাধ্য করে না। কারণ বিশ্বাস জিনিষটা হলো একান্তভাবেই মনের ব্যাপার, এটা কারো ওপর শক্তি প্রয়োগ করে চাপিয়ে দেয়ার জিনিস নয়। একইভাবে, ইসলাম তার আকিদা-বিশ্বাসের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত ইবাদাতকেও কোন ব্যক্তির ওপর শক্তি প্রয়োগ করে চাপিয়ে দেয় না। কারণ দৃঢ় বিশ্বাস ব্যতীত ইসলামের ইবাদতসমূহ অর্থহীন। দৃঢ় বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করেই নামায-রোযা ইত্যাদি আদায় করতে হয়। এসব দিকে ইসলাম মানুষকে স্বাধীনতা দিতে চায়। পক্ষান্তরে ইসলাম এটা সহ্য করতে নারাজ যে, সমাজ ও সভ্যতা পরিচালনাকারী যে আইন ও বিধানের ওপর রাষ্ট্রের কাঠামো ও বিধি-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, তা মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ রচনা করে দিক, আল্লাহর প্রতি বিদ্রোহী মানুষজন আল্লাহর পৃথিবীতে আইনের প্রয়োগ করুক বা বাস্তবায়ন করুক, মুসলিম জনগোষ্ঠী তা পালন করুক এবং তাদের দাস হয়ে থাকুক– এই সুযোগ ইসলাম দিতে নারাজ।

আল্লাহর রাসূলের প্রতিবেশী যারা ছিল তাদের ভেতরে একমাত্র হাকাম ইবনে আ'স রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ব্যতীত আর কেউ ইসলাম কবুল করেনি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন নিজের বাড়িতেই নামাযে দাঁড়াতেন তখন প্রতিবেশী উকবা, আদী এবং অন্যরা তাঁর ওপরে পশুর নাড়ি-ভুড়ি ছুড়ে দিত। তিনি বাধ্য হয়ে দেয়ালের আড়ালে নামায আদায় করতেন। তিনি রান্নার জন্য উনুনে পাত্র উঠাতেন আর তাঁরা সেই পাত্রের ভেতরেও আবর্জনা ছুড়ে দিত। তিনি নিজ হাতে সেসব আবর্জনা পরিষ্কার করতেন। এভাবে হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও আবু তালিবের অভাবে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাকে কাফিরের দল তাঁর নিজ বাড়ির ভেতরেও নির্যাতন করেছে। সে সমস্ত ঘটনা ইতিহাসের কালো অধ্যায় হিসাবেই চিহ্নিত হয়ে রয়েছে।

লজ্জায় মুদি নয়ন টেনে দিল অবগুণ্ঠন সূর্য

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মক্কায় যেন আর টিকতে পারলেন না। এখানে তিনি ইসলাম বিরোধিদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়লেন। তাদের এই অত্যাচার থেকে কিভাবে মুক্ত থাকা যায় তিনি সে সম্পর্কে চিন্তা করতে থাকলেন। তিনি ভাবলেন, তায়েফের আবদে ইয়ালিল, মাসউদ ও হাবিব এই তিনজন যদি ইসলাম কবুল করে তাহলে ইসলামী কাফেলার ওপর মক্কার কাফিররা অত্যাচার করতে সাহস পাবে না। উল্লেখিত তিন ব্যক্তি ছিল তায়েফের সবচেয়ে প্রভাবশালী

গোত্র সাকিফ গোত্রের তিন ভাই। তাঁরাই ছিল গোত্র প্রধান। এই তিনজন লোক যদি ইসলামের পক্ষে আসে তাহলে ইসলামী আন্দোলন শক্তিশালী হবে। তাদের মাধ্যমে আরো বড়বড় নেতাদের কাছে ইসলামের আহ্বান পৌছে দেয়া যাবে। এ সবদিক চিন্তা করে আল্লাহর রাসূল হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে (মতান্তরে হযরত বিলাল) সাথে নিয়ে পদব্রজে তায়েফ যাত্রা করলেন।

তায়েফের ঐ নেতার একজন মক্কার কুরাইশ বংশের মেয়ে বিয়ে করেছিলো। আল্লাহর রাসূলও ছিলেন কুরাইশ বংশের, সুতরাং তাঁরা ছিল কুরাইশদের আত্মীয়। তাঁরা ইচ্ছা করলে নবীকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারে। তিনি তাদের সাহায্য লাভ করবেন–বুকভরা আশা আর দুচোখে সাফল্যের স্বপ্ন নিয়ে তায়েফ গমন করলেন। কিন্তু তাকদির ছিল ভিন্ন ধরনের। তিনি তাদের কাছে গেলেন এবং তিন ভাইকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী। যারা যুক্তি মানে না, কুসংস্কারকে অন্ধ আবেগে আক্ড়ে ধরে রাখতে চায়, নিজের জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধিকে অগ্রাধিকার দান করে, কোনরূপ চিন্তা ভাবনা ব্যতীতই প্রচলিত সংস্কার ধরে রাখতে চায়, তারা মহাসত্য গ্রহণে সক্ষম হয় না।

আল্লাহর রাসূল তাদেরকে মহাসত্যের দাওয়াত দিয়ে অনুরোধ করলেন ইসলাম গ্রহণ করার জন্য। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করা দূরে থাক, আল্লাহর নবীকে অপমান করলো। একজন বললো– তোমাকেই আল্লাহ যদি রাসূল করে প্রেরণ করে থাকে তাহলে আল্লাহ কা'বা শরীফের গেলাফ খুলে ফেলুক।' এই হতভাগার কথার তাৎপর্য ছিল, আল্লাহ তাকে নবী বানিয়ে কা'বার মর্যাদা ক্ষুন্ন করেছেন।

দ্বিতীয়জন বললো–তোমাকে ব্যতীত আর কাউকে কি আল্লাহ রাসূল বানানোর লোক খুঁজে পেলেন না?' তৃতীয়জন বললো– তুমি যদি তোমার দাবি অনুযায়ী সত্যই রাসূল হয়ে থাকো তাহলে তোমার সাথে কথা বলা বিপদজনক। আর যদি তোমার দাবিতে তুমি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকো তাহলে আমি কোন মিথ্যাবাদীর সাথে কথা বলতে ইচ্ছুক নই, এ কারণে তোমার সাথে আমি কোন কথা বলতে চাইনা।'

এভাবে তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অপমান করে তাড়িয়ে দিল। তিনি হতাশ হয়ে বিদায় গ্রহণের পূর্বে তাদেরকে অনুরোধ জানালেন– তোমরা ইসলাম গ্রহণ করলে না। কিন্তু আমার কথা কারো কাছে প্রকাশ করো না।'

তিনি আশঙ্কা করেছিলেন, তাঁর কথা প্রকাশ হয়ে পড়লে এখানেও তিনি যে উদ্দেশ্যে আগমন করেছেন তাঁর সে উদ্দেশ্য সফল হবে না। একজন মানুষের কাছেও তিনি ইসলামের আহ্বান জানাতে পারবেন না। তাঁর ওপর চরম নির্যাতন অনুষ্ঠিত হবে।

এসব দিক চিন্তা করে তিনি তাদেরকে তাঁর কথা প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু হতভাগারা আল্লাহর রাসূলের অনুরোধ রাখেনি। তৎক্ষণাত তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কথা লোকদের ভেতরে বিদ্রুপের ভাষায় প্রকাশ করে দিল। তাঁরা এলাকার মূর্খ এবং দুষ্কৃত প্রকৃতির লোকদেরকে আল্লাহর নবীর পেছনে লেলিয়ে দিল। তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পেছন পেছন যেতে লাগলো আর তাঁকে বিদ্রুপ বাণে বিদ্ধ করতে থাকলো। আল্লাহর রাসূল যে পথেই অগ্রসর হন, সেদিকেই তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে উৎপাত করতে থাকলো জালিমের দল।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ দশ দিন যাবৎ তায়েফে অবস্থান করে মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। ইসলাম বিরোধিরা বর্বরতার এক চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো। আল্লাহর নবী যে পথ অতিক্রম করবেন সে পথের দু'দিকে পাথর হাতে দাঁড়িয়ে গেল। ব্যথাভরা ইতিহাস, পাষন্ডের দল বৃষ্টির আকারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওপরে পাথর বর্ষণ করতে থাকলো। আল্লাহর নবী রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়লেন।

কি হৃদয় বিদারক মর্মান্তিক দৃশ্য, যিনি বিপদ সঙ্কুল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তায়েফবাসীকে মুক্তির পয়গাম শোনাতে এলেন তিনিই এই তায়েফবাসীর হাতে হচ্ছেন নির্যাতিত। পাথরের আঘাতে আঘাতে আল্লাহর রাসূলের পবিত্র দেহ মোবারক রুধির ধারায় সিক্ত হয়ে গিয়েছে, তবুও পাষণ্ডরা পাথরের আঘাত হেনেই চলেছে। শোষিত নিপিড়ীত ও নির্যাতিত মানবতার মুক্তির মূর্ত প্রতীক, আখেরী জামানার পয়গম্বর বিশ্বনেতা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহে অবিরাম পাথর বর্ষন হচ্ছে।

তায়েফের জালিমরা তাঁর পবিত্র পা দুটো লক্ষ্য করেই আঘাত করেছিল সর্বাধিক। আল্লাহর নবী যখন চলার ক্ষমতা হারিয়ে জ্ঞানহারা হয়ে পথের ধূলায় লুটিয়ে পড়লেন। এই পরেও নিষ্ঠুর তায়েফবাসী পাথর বর্ষণ অব্যাহত রাখলো। আল্লাহর নবীর এই অবস্থা দেখে হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর দু'চোখ দিয়ে অশ্রুর বন্যা নেমে এলো। তিনি আল্লাহর রাসূলের ওপর থেকে পাথর সরিয়ে নবীকে উঠালেন।

আল্লাহর নবীকে সাহায্য করতে গিয়ে তিনিও মারাত্মকভাবে আহত হলেন। আল্লাহর নবী হাঁটতে পারছেন না। পা দুটো আর চলে না, অবশ পায়ে তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন। আহা! যে পায়ে একবার চুমো দিলে সমস্ত জগতের স্রষ্টা মহান আল্লাহ খুশী হয়ে যান আর আজ নরাধমেরা সেই পায়ে আঘাত করে রক্তাক্ত করে দিয়েছে। তায়েফের

মাটি আল্লাহর নবীর শরীরের পবিত্র রক্তধারায় রঞ্জিত হয়ে গেল। পাষন্ডরা তবুও নিবৃত্ত হলো না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তায়েফে কারো বাড়িতে এক পাত্র পানি পর্যন্ত পাননি। অবস্থা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছলো যে, আল্লাহর রাসূলের জীবন নাশের আশঙ্কা দেখা দিল। হযরত যায়েদ নবীকে জড়িয়ে ধরে দেয়াল ঘেরা একটি বাগানে প্রবেশ করলেন। আল্লাহর নবী প্রায় চেতনাহীন।

হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর মমতাভরা সেবা-যত্নে আল্লাহর রাসূল একটু সুস্থ হয়েই বললেন নামাযের কথা। নামাযের প্রস্তুতির জন্য তিনি পায়ের জুতা খোলার চেষ্টা করলেন, পারলেন না। পবিত্র রক্ত জুতায় প্রবেশ করে পায়ের সাথে জুতা এমনভাবে বসে গেছে যে, জুতা মোবারক খুলতে বেগ পেতে হলো। ঐ বাগানের মালিক ছিল উৎবা এবং শায়বা নামক দু'ভাই। তাঁরা সে সময় বাগানেই অবস্থান করছিল। আল্লাহর নবীর ওপরে যে অত্যাচার হচ্ছিল তা তাঁরা দেখেছিল। নবীর সাথে ইতোমধ্যেই ঐ মহিলার দেখা হলো, যে মহিলা ছিলেন কুরাইশ গোত্রের এবং তায়েফের তিন নেতার একজনের সাথে যার বিয়ে হয়েছিল। আল্লাহর নবী তাঁর দিকে তাকিয়ে অনুযোগের কণ্ঠে বললেন– তোমার স্বামী ও তার আত্মীয়-স্বজন আমার সাথে কেমন আচরণ করলো দেখলে তো?

হযরত যায়েদের চোখ থেকে অশ্রুর বন্যা নেমেছে। কি করুণ দৃশ্য! যে পদযুগল সমস্ত সৃষ্টিকুলের শেষ আশ্রয়স্থল সে কদম মোবারকের আজ কি করুণ অবস্থা! আল্লাহর নবী অতি কষ্টে নামায আদায় করলেন, নামাযান্তে রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত হাত দু'টি উঠালেন বিশ্ব প্রভু সমস্ত জাহানের মালিক মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে– হে আল্লাহ! আমি দুর্বল, আমি অক্ষম, আমি সহায়-সম্বলহীন, আমার বিচক্ষণতার অভাব। মানুষ আমাকে অবজ্ঞা করে, আমাকে নগন্য মনে করে, আমাকে উপেক্ষা করে এ জন্য আমি আপনার কাছে আবেদন করছি। যারা দুর্বল এবং সহায় সম্বলহীন আপনিই তাদের আশ্রয়দাতা প্রতিপালক। হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রতিপালক। আপনি মানুষের নিষ্ঠুরতা আর করুণাহীনতার ওপরে আমাকে ছেড়ে দিচ্ছেন? যে আমাকে শত্রু জ্ঞান করে আমার ওপর অত্যাচার করে আপনি তাদের ওপর আমাকে ছেড়ে দিচ্ছেন? আপনি যদি আমার ওপর রহম করেন আমাকে নিরাপত্তাদান করেন তাহলে এটাই হবে আমার জন্য শান্তির কারণ। আমি আপনার সেই রহমতের আশ্রয় কামনা করি, যে রহমতের কারণে সমস্ত পৃথিবী উৎসব মুখর হয় এবং পৃথিবী ও আখিরাতের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়। আমার অক্ষমতার জন্য আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার সাহায্য ব্যতীত আমি কোন কাজ সমাধা করতে পারবো না।

রাব্বুল আলামিন, তুমিই আমার একমাত্র শেষ আশ্রয়স্থল! তোমার কাছে ছাড়া আর কার কাছে বলবো! ওরা না জেনে আমার প্রতি অত্যাচার করেছে, এ জন্য তুমি আল্লাহ্ ওদের ওপরে গজব দিওনা! যদি ওদেরকে গযব দিয়ে ধ্বংস করে দাও তাহলে আমি কার কছে ইসলামের দাওয়াত দেব মালিক! তুমি ওদেরকে ক্ষমা করে দাও! তোমার দ্বীনকে তুমি জয়যুক্ত কর, ওদের হৃদয়ের দুয়ার খুলে দাও যাতে করে সত্য সেখানে প্রবেশ করতে পারে। হে আল্লাহ! আমি শুধু তোমারই সন্তুষ্টি চাই, আমার হৃদয়ে অন্য কোন আকাংখা নেই, আমি, তোমার দ্বীনকে বিজয়ী দেখতে চাই। সমস্ত বিপদে ধৈর্য ধারণ করার তাওফিক দাও তুমি আমাকে। তুমিই আমার জন্য যথেষ্ট।

কি মধূমাখা দরদভরা কথা! আল্লাহ্র প্রতি কি অবিচল আস্থা! কতবড় মানব প্রেমিক, যারা আঘাত করলো তাদের জন্য কত মায়া! আর এজন্যই তো তিনি করুণার মূর্ত প্রতীক রাহ্মাতাল্লীল আলামিন। আল্লাহ্র রাসূলের অনুসারী বিংশ শতাব্দীর ইসলামী আন্দোলনের নেতা অধ্যাপক গোলাম আযমের মধ্যেও দেখা গেল নবীর প্রচারিত আদর্শের বাস্তব রূপ। দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করার করার ১৯৭২ সনে বাংলাদেশে অসমুদ্র হিমাচল রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্নাভিলাষী ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতের পুতুল সরকার তাঁর নাগরিকত্ব বাতিল করে দেয়। সে সময় তিনি আন্দোলনের কাজে বিদেশ সফরে ছিলেন। তাঁকে স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন করা হলো। জন্মভূমিতে প্রবেশে বাধা দেয়া হলো, তাঁকে দেশে প্রবেশ করতে দেয়া হলো না। ইসলামী আন্দোলনের নেতা অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব তদানীন্তন সরকার প্রধান বাতিল করে দিয়েছিল, মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা সেই সরকার প্রধানের পৃথিবীর নাগরিকত্ব বাতিল করে দিলেন। মর্মান্তিকভাবে তাকে স্বপরিবারে মৃত্যুবরণ করতে হলো।

পরবর্তী সরকার মজলুম জননেতা গোলাম আযামকে পার্থিব লোভ-লালসায় জড়ানোর চেষ্টা করেছে, যেন তিনি দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শিথিলতা প্রদর্শন করেন। তাহলে তিনি অনায়াসেই ফিরে পেতে পারেন দেশের নাগরিকত্ব। পক্ষান্তরে গোটা জাহানের মালিক আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের প্রেমে যাঁর হৃদয় পরিপূর্ণ, সেই ব্যক্তিত্ব তো আর সামান্য নাগরিকত্বের প্রত্যাশায় ঈমান বিক্রি করতে পারেন না। তিনি ঘৃণাভরে সরকারী প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করলেন। সরকারও নাগরিকত্ব দিল না। ১৯৯১ সনে নির্বাচনে একটি দল সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করেও সরকার গঠনে সক্ষম হলো না। দেশ ও জাতি মারাত্মক গৃহযুদ্ধের মুখোমুখী হতো। দেশের চরম ক্রান্তিলগ্নে তিনি দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার লক্ষ্যে ও জাতিকে গৃহযুদ্ধ থেকে

হেফাজত করার জন্য সরকার গঠনে নিঃশর্ত সমর্থন দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। সরকার গঠিত হলো এবং দেশ ও জাতী অনিশ্চয়তার কবল থেকে মুক্তির নিঃশ্বাস গ্রহণ করলো।

পরবর্তীতে এই সরকারই ইসলামী আন্দোলনের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করার জন্য ইসলামের শত্রুদের সাথে অশুভ আঁতাত করে মজলুম জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযমকে ১৯৯২ সনের ২৪শে মার্চের কালো রাত্রিতে পবিত্র রমজান মাসে কারাগারের লৌহ কপাটারে আড়ালে অত্যন্ত ন্যাক্কারজনকভাবে বন্দী করলো। পৃথিবীর মুক্ত আ্যালো বাতাস থেকে তাকে বঞ্চিত করা হলো। ১৯৯২ সনের স্বাধীনতা দিবসে কুখ্যাত জাহানারা ইমামকে দিয়ে রাজধানী ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে তথাকথিত গণআদালত বসিয়ে অধ্যাপক গোলাম আযমকে ফাঁসির আদেশ শুনালো। নারী কূলের কলঙ্ক কুখ্যাত এই নারী যে জিহ্বা দিয়ে কোরআনের সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বয়োবৃদ্ধ এই নেতাকে ফাঁসি দেয়ার শব্দ উচ্চারণ করেছিলো, আল্লাহ তা'য়ালা ক্যান্সার রোগকে আদেশ দিলেন সেই জিহ্বায় বাসা বাঁধার জন্য। জিহ্বায় ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে অবশেষে ঐ নারীকে পৃথিবী থেকে লাঞ্ছিতাবস্থায় বিদায় গ্রহণ করতে হয়েছে।

দেশের জনগণ অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলো, বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের অসংখ্য কর্মী তাঁদের নেতাকে নাগরিকত্ব না দিয়ে কারাবন্দী করার প্রতিবাদে দেশে কোন বিশৃংখলা সৃষ্টি করেনি। মানব রচিত মতবাদের অনুসারী দলগুলোর অতি নিম্ন স্তরের কোন নেতা বন্দী হলে দেশের মূল্যবান সম্পদের হানি করা হয়, দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়, যান-বাহনে অগ্নি সংযোগ করা হয়। অথচ বিংশ শতাব্দীর ইসলামী আন্দোলনের বিশ্ববরেণ্য নেতা অধ্যাপক গোলাম আযমের গ্রেফতারের প্রতিবাদে ইসলামী আন্দোলনের কোন কর্মী উচ্ছৃংখলতা প্রদর্শন করেনি। তাঁরা নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় আন্দোলন চালিয়ে দীর্ঘ ১৬ মাস পরে নেতাকে নাগরিকত্বসহ কারাগার থেকে মুক্ত করে এনেছে। নেতা মুক্তি লাভ করেই ঘোষণা করলেন- যারা আমার ফাঁসি দাবি করেছে বা করছে, জঘন্য ভাষায় গালি দিচ্ছে, তারা না বুঝে এসব করছে, তারাও আমাদের ভাই। রাব্বুল আলামীন তুমি ওদের ওপরে গজব দিওনা। ওদেরকে সত্য অনুধাবন করার তৌফিক দাও।' এটাই হলো ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর বৈশিষ্ট্য। এটাই তাঁদের নেতা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এর শিক্ষা।

তায়েফে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চরম নির্যাতিত হওয়ার পর হযরত জিবরাঈল আমীন অন্যান্য ফেরেশতাসহ আল্লাহর রাসূলের কাছে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলেন- আপনার নির্যাতিত হয়েছেন মহান আল্লাহ সবই অবগত

আছেন। আপনি আদেশ করুন, তায়েফের চারদিকের পবর্তগুলো এদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে জালেমদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেই।' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- না, ওরা না থাকলে আমি ইসলামের দাওয়াত দেব কার কাছে! ওদের মধ্য থেকেই তো কোরআনের অনুসারী বেরিয়ে আসবে!

মানব প্রেমের কি চরম পরাকাষ্ঠা! চরম প্রতিকূল অবস্থায় আদর্শের প্রতি দৃঢ়তা, আল্লাহ্‌র প্রতি অবিচল আস্থা, দায়িত্বের প্রতি সচেতনতা, চরম ধৈর্য্য ধারণ করা, বিরোধিদের প্রতি অসীম মায়া মমতার মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হওয়া, নির্যাতনের মুখে নির্যাতকের অমঙ্গল কামনা না করে তাদেরকে সংশোধন করার চেষ্টা করাই ছিলো নবী সম্রাট মানবকূল শিরোমণি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিরন্তন আদর্শ।

তায়েফে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি যে অত্যাচার অনুষ্ঠিত হলো তা উৎবা আর শায়বা নামক দু'ভাই দেখে তাঁর সাথে বংশীয় আত্মীয়তার কথা চিন্তা করে বিচলিত হয়ে উঠলো। তাঁরা একপাত্র খেজুর আদ্দাস নামক এক খৃষ্টান চাকরের হাতে দিয়ে বললো-ঐ লোকটিকে দিয়ে খেতে বলো।

আদ্দাস সে খেজুর পাত্র আল্লাহর নবীর সামনে রেখে খাওয়ার অনুরোধ করলো। তিনি একটি খেজুর হাতে উঠিয়ে 'বিস্‌মিল্লাহ' বলে মুখে দিলেন। আদ্দাস লোকটি আল্লাহর রাসূলের দিকে অবাক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললো- এ কথা উচ্চারণ করে খাওয়া শুরু করতে তো এদেশের মানুষকে কখনো দেখিনি?

আল্লাহর নবী তাকে বললেন-হে আদ্দাস! তুমি কোন ধর্মের অনুসারী এবং তোমার দেশ কোথায়?

আদ্দাস জানালো- আমার দেশ নিনেভা। আমি খৃষ্টান ধর্মের অনুসারী।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন- তুমি তাহলে পরম আত্মীয় ইউনুস ইবনে মাত্তার (হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম) দেশের লোক?

আদ্দাস অবাক হয়ে বললো- আপনি ইউনুস ইবনে মাত্তাকে কি করে চিনলেন?

আল্লাহর রাসূল বললেন- তিনি আল্লাহর নবী ছিলেন, আমার ভাই তিনি। আমিও একজন নবী।

এ কথা শোনার সাথে সাথে আদ্দাস দ্রুত নিচু হয়ে আল্লাহর নবীর হাত-পা ও মাথায় চুমো দিতে লাগলো। উৎবা এবং শায়বা দূরে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখছিল। আদ্দাসকে ওভাবে চুমো দিতে দেখে এক ভাই আরেক ভাইকে বললো- ছেলেটাকে তো ঐ লোকটি বিভ্রান্ত করে দিল!

আদ্দাস তাদের কাছে এলে তাঁরা বললো– তুমি ঐ লোকটিকে চুমো দিলে কেন?

আদ্দাস তাঁর মনিবকে জানালো– হে আমার মনিব! এই পৃথিবীতে তাঁর থেকে উত্তম মানুষ আমি আর দেখিনি। সে আমাকে এমন একটা কথা বলেছে যা একমাত্র নবী ব্যতীত আর কেউ বলতে পারে না।

উৎবা এবং শায়বা তাঁকে ধমক দিয়ে বললো– হে আদ্দাস! তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? সাবধান! তাঁর ধোকায় পড়ে তুমি তোমার আদর্শ ছেড়ে দিও না। কারণ তাঁর আদর্শের থেকে তোমার আদর্শ অনেক ভালো।

এভাবেই বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে তায়েফ থেকে হতাশ আর অত্যাচারিত হতে হয়েছিল। হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা আল্লাহর নবীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কোথায় আপনার ওপরে সর্বাধিক নির্যাতন করা হয়েছে?' আল্লাহর নবী তাঁকে জানিয়েছিলেন তায়েফের কথা। এ ধরনের নির্মম নির্যাতন বিশ্বনবীর জীবনে আর কোথাও ঘটেনি। তিনি তায়েফ থেকে ফিরে মক্কার দিকে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে নাখালা নামক স্থানে পৌঁছে গভীর রাতে নামায আদায়ের লক্ষ্যে দাঁড়ালেন। তিনি নামাযে উচ্চকণ্ঠে কোরআন তিলাওয়াত করছিলেন। বেশ কয়েকজন জ্বিন সে পথ অতিক্রম করছিল। তাঁরা পবিত্র কোরআন শোনা মাত্র মুগ্ধ হয়ে ইসলাম কবুল করে নিজের জাতির কাছে যেয়ে ইসলামের প্রতি তাদেরকে আহ্বান জানিয়েছিল। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় নবীকে জ্বিনদের পবিত্র কোরআন শুনে ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ওহীর মাধ্যমে অবগত করেছিলেন। সূরা জ্বিন এ সম্পর্কিত বর্ণনায় পরিপূর্ণ।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিরোধিতা এবং নির্যাতনের সয়লাব দেখে ইসলামী দাওয়াতের কাজে কোন শিথিলতা প্রদর্শন করেননি। তিনি বিভিন্ন গোত্রের নেতাদের কাছে ইসলামের প্রতি তাদেরকে আহ্বান জানিয়েছেন। গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ রাসূলের কথা শুনেছে। কোন গোত্রের নেতা নবীর কথা শুনে বিদ্রুপ করেছে, কোন গোত্রের নেতা ইসলাম গ্রহণ না করলেও উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে নবীকে বিদায় করেছে। কোন গোত্র প্রধান বলেছে– আমরা আপনার সাথে দাওয়াতী কার্যক্রমে যোগদান করে আন্দোলনকে বিজয়ী করার পরে নেতৃত্ব আমাদের হাতে থাকবে তো?

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– মহান আল্লাহ নেতৃত্ব কার হাত দেবেন এটা তাঁর ইচ্ছা।

গোত্র প্রধান বলেছে– আমরা শত্রুদের সাথে লড়াই করবো আর শাসন ক্ষমতা আরেকজনের হাতে চলে যাবে এটা আমরা মেনে নিতে পারি না।

আল্লাহর রাসূল কখনো নিরাশ হননি। ইসলাম কেউ গ্রহণ করুক আর না-ই করুক, তিনি তাঁর ওপরে অর্পিত দায়িত্ব যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে হলেও পালন করেছেন। আখিরাতের ময়দানে যেন তাঁর আওতাধীন কোন একজন মানুষও এ কথা বলতে না পারে, তাঁর কাছে মহাসত্যের আহ্বান পৌঁছানো হয়নি। অবর্ণনীয় নির্যাতনের মোকাবেলা করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মানুষকে মহাসত্যের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, অথচ একশ্রেণীর মানুষ তাঁকে নবী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি, তাঁর ওপরে নির্যাতনের প্লাবন বইয়ে দিয়েছে। তায়েফে মহাসত্যের বাহক আল্লাহর রাসূলের সাথে সৃষ্টির সেরা মানুষের এমন ঘৃণ্য আচরণ দেখে বোধহয় সেদিনের সূর্য্যও লজ্জায় নিজের ওপরে অবগুণ্ঠন টেনে দিয়েছিল।

মহাসত্যের সন্ধানে অস্থির চিত্ত

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াতী কাজ শুরু করেছেন। লোকদেরকে তিনি দাসত্বের সকল বন্ধন ছিন্ন করে একমাত্র আল্লাহ্র দাসত্ব কবুল করার আহ্বান জানাচ্ছেন। মৃত্তিকা নির্মিত মূর্তির সম্মুখে মাথানত না করে একমাত্র আল্লাহ্র সম্মুখে মাথানত করার জন্য লোকদেরকে আহ্বান করছেন। মানুষের মনগড়া আইন এবং অসৎ লোকের নেতৃত্বই যে সমাজে অশান্তির মূল কারণ, বিষয়টি মানুষকে উপলব্ধি করার আবেদন জানাচ্ছেন তিনি।

সমাজের কায়েমী স্বার্থবাদী শক্তি তীব্র বিরোধিতা শুরু করলো নবীর দাওয়াতী কাজে। মক্কার কাফির সর্দার আবু জেহেল, আবু লাহাব, উতবা প্রমুখ লোকের নেতৃত্বে ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী আল্লাহর রাসূলের প্রতি মার মুখো হয়ে উঠলো। হযরত আবু বকরও মক্কার একজন সম্মানিত নেতা। আল্লাহর নবী যখন দাওয়াতী কাজের সূচনা করলেন, সে সময় হযরত আবু বকর ব্যবসা উপলক্ষে ইয়েমেনে অবস্থান করছিলেন। তিনি মক্কায় ফিরেই অন্যান্য নেতৃবৃন্দের কাছে কোনো নতুন ঘটনার সংবাদ জানতে চাইলেন। কাফির নেতৃবৃন্দ জানালো, 'বড় সংবাদ হচ্ছে, আবু তালিবের ভাতিজা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক অদ্ভুত দাবি করছে। সে নাকি আল্লাহ্র নবী। আমাদের দেব-দেবী মিথ্যা। এসব দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা

ত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহ্‌র গোলামী করতে হবে।' এসব কথা বলে তারা আল্লাহর রাসূল সম্পর্কে হাসি-তামাশা করতে থাকলো। হযরত আবু বকর তাদের মুখে এসব শুনে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন–ঠিক আছে, আমি তাঁর কাছ থেকেই জেনে নিচ্ছি, সত্যই তিনি নিজেকে নবী দাবি করছেন কিনা।

কথা শেষ করে তিনি চিন্তিত মনে আল্লাহর নবীর কাছে উপস্থিত হয়ে বিনয়ের সাথে জানতে চাইলেন– আপনি কি কোনো নতুন আদর্শ প্রচার করছেন? দীর্ঘকাল ব্যাপী যেসব দেব-দেবী পূজিত হয়ে আসছে, তা কি সবই মিথ্যে?

আল্লাহ্‌র নবী কিছুক্ষণ হযরত আবু বকরের দিকে তাকিয়ে থেকে শান্ত-স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন– আপনি যা শুনেছেন সবই সত্য কথা। নিজ হাতে নির্মিত মাটির পুতুল তথা দেব-দেবীর কোন ক্ষমতা নেই। সমস্ত ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ মানুষের ইবাদাত তথা দাসত্ব লাভের অধিকার নয়। দাসত্ব লাভের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ, যিনি এই গোটা বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং লালন-পালন করছেন। আমি কোনো নতুন আদর্শ প্রচার করছি না। প্রত্যেক নবী-রাসূল যেদিকে মানুষকে ডেকেছেন আমিও সেদিকেই মানবজাতিকে আহ্‌বান করছি। আমার আদর্শের মূল কথাই হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। সত্যের সন্ধানে যিনি পাগল পারা, হৃদয় যার সত্য গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত হয়ে রয়েছে, তিনি কি আর নিজেকে স্থির রাখতে পারেন! লুটিয়ে পড়লেন তিনি মহাসত্যের পদপ্রান্তে। কণ্ঠে আকুল আবেদন– আপনি আমাকে আপনার সাথী হিসেবে নির্বাচন করুন।

পবিত্র কালিমা পাঠ করে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এদিকে কাফিররা অপেক্ষা করছে হযরত আবু বকরের জন্য । কিভাবে আবু বকর নবী দাবিকারী লোকটিকে অপমান করলো তা তারা শুনে আত্মতৃপ্তি লাভ করবে। দেখা গেল, ধীর গতিতে শান্ত পদক্ষেপে আবু বকর তাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। তাঁর চেহারা থেকে যেন আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তিনি কাফিরদের কাছে উপস্থিত হয়েই বীরত্বের সাথে ঘোষণা করলেন– আমি সত্যের সন্ধান পেয়েছি। আমি মুসলমান হয়েছি। আমি আর তোমাদের সাথে নেই।' কাফিররা আবু বকরের কথা শুনে প্রচন্ড ক্রোধ দমন করে তখনকার মত চলে গেলো। তারা ভেবেছিলো, সময়ের ব্যবধানে আবু বকরের মন-মানসিকতা পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসবে।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর নাম ছিল আব্দুল্লাহ। তাঁর উপাধি ছিল আতিক এবং সিদ্দীক। তাকে ডাকা হতো আবু বকর বলে। তাঁর পিতার

নাম ছিল উসমান এবং তাঁকে ডাকা হতো আবু কুহাফা বলে। তাঁর গর্ভধারিণী মাতার নাম ছিল সালমা এবং তাঁকে বলা হতো উম্মুল খায়ের। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের জন্মগ্রহণের দু'বছর বা কিছু বেশী পরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন তিনি। মহান আল্লাহর কি মহিমা, তাঁরা দু'জনে বয়সের যে ব্যবধানে পৃথিবীতে এসেছিলেন ঐ একই বয়সের ব্যবধানে ইন্তেকাল করেন।

তিনি ছিলেন অপূর্ব সুন্দর। মদের সরোবরে বাস করেও তিনি কখনো মদ স্পর্শ করেননি। তাঁর সুন্দর চরিত্র, স্বভাব, জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার কারণে কুরাইশদের মধ্যে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি। দূরদর্শিতা এবং বিচক্ষণতা, বিশুদ্ধ আরবী ভাষা ও বিশাল হৃদয়ের অধিকারী হবার কারণে মক্কায় তিনি ছিলেন সবার সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। মক্কাবাসীদের রক্তের ক্ষতিপূরণের অর্থ তাঁর কাছে জমা থাকতো। আরববাসীর বংশ সংক্রান্ত জ্ঞানে তিনি ছিলেন বিশেষজ্ঞ। উঁচুমানের কাব্য প্রতিভা ছিল তাঁর। বাগ্মিতায় ও বক্তৃতায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। চরিত্রবান এবং দানশীলতার কারণে গোটা আরবে তাঁর সুনাম ছিল। বন্ধু বৎসল এবং তাঁর অমায়িক মেলামেশার কারণে তাঁর বাড়িতে প্রতিদিন মক্কার সম্ভ্রান্ত লোকজন বৈঠকে মিলিত হতেন। তাঁর ব্যবসায়িক দক্ষতা ও মধুর ব্যবহারের কারণে অনেকেই তাঁর সাথে আগ্রহভরে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে আগ্রহী হতো।

হযরত আবু বকরের পিতা একজন বয়স্ক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সামাজিক মর্যাদা ও ধন-ঐশ্বর্যের কারণে সমাজে তাঁর মতামত সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করা হতো। মক্কা বিজয়ের পূর্ব-পর্যন্ত তিনি ইসলাম গ্রহণ না করলেও তিনি ইসলামের বিরোধিতা করেছেন বলে ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় না।

মক্কা বিজয়ের সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ হযরত আবু বকরের মা উম্মুল খায়ের ইসলামী কার্যক্রমের প্রথম পর্যায়েই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। বিশ্বনবীর ইন্তেকালের পরে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যখন খলীফাতুর রাসূল সে সময়ে তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন। হযরত আবু বকরের পিতা হিজরী চৌদ্দ সনে ইন্তেকাল করেন। আরেক বর্ণনায় হযরত আবু বকরের ইসলাম গ্রহণ করার ঘটনা এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে–ইসলামী দাওয়াতের সেই গোপন দিনগুলোয় হযরত আবু কবর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একদিন হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার ভাতিজা হাকিম ইবনে হিজামের বাড়িতে বসে ছিলেন। এমন সময় হাকিমের দাসী এসে হাকিমকে জানালো– আপনার পিতার বোন আজ

বলছিলেন যে, তাঁর স্বামীকে মহান আল্লাহ নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন—হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামকে যেভাবে নবী করে প্রেরণ করেছিলেন।

এ কথা শোনার সাথে সাথে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে জানতে চাইলেন হাকিমের দাসী যা বললো তা সত্য কিনা। আল্লাহর জানালেন হাকিমের দাসী যা বলেছে তা অবশ্যই সত্য। সিদ্দীকে আকবর কোন প্রশ্ন করলেন না। প্রশ্নাতীতভাবে নবীর হাতে হাত দিয়ে তিনি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। পরবর্তীতে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর এই মহান বন্ধু সম্পর্কে প্রশংসা করে বলেছেন— আমি যাকেই ইসলামের দিকে আহ্বান করেছি, সে-ই কিছু না কিছু প্রশ্ন করেছে, চিন্তা-ভাবনা করেছে। পক্ষান্তরে একমাত্র ব্যতিক্রম ধর্মী ছিলেন আবু বকর। তিনি কোন প্রশ্ন না করে, কোন চিন্তা-ভাবনা না করে, সামান্য ইতস্তত না করে সাথে সাথেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

গবেষকগণ বলেন, হযরত আবু বকরের ইসলাম গ্রহণের বিষয় থেকে একটি ব্যাপার অনুমান করা যায় যে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রথম পর্যায়ে আল্লাহ কর্তৃক প্রদর্শিত কৌশলে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে একান্ত নিজস্ব পরিমন্ডলে কাজ করে যাচ্ছিলেন। ক্রমশ দিন যতই গড়িয়ে যাচ্ছিল ততই এ কাজ সম্পর্কে নিজস্ব আত্মীয়-স্বজনদের ভেতরে একটা অস্পষ্ট ধারণা বিস্তার করছিল। আত্মীয়-স্বজন অনুভব করছিল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রচলিত আদর্শের বিপরীত একটি নতুন আদর্শ উপস্থাপন করেছেন এবং তিনিসহ বেশ কয়েকজন সে আদর্শের অনুসরণ করছেন। তাঁরা বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি এ কারণে যে, তখন পর্যন্ত তাঁরা ইসলাম সম্পর্কে তেমন কৌতুহল অনুভব করেননি। পরিচিত মহলে ইসলাম সম্পর্কে তাঁরা কোন আলোচনাও করেনি। যারা বিষয়টি অবগত হয়েছিল তাঁরা বোধহয় বিশ্বনবীর কল্যাণকামীই ছিল। এ কারণে তাঁরা কোন বিরোধিতা করেনি বা সমাজের সর্বত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নামায আদায় সম্পর্কে কোন কথা কাউকে বলেনি। যেমন হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর ভাতিজা হাকিম এবং তাঁর দাসী ও আবু তালিব, তাঁরা কারো কাছে কিছু জানালে অবশ্যই প্রাথমিক পর্যায়ে দাওয়াতী কার্যক্রমে ব্যাঘাত সৃষ্টি হত।

ইসলাম গ্রহণ করার পরে আবু বকরের মধ্যে এমন গুণাবলীর সমাবেশ ঘটলো, যা অন্য মানুষকে অতি সহজে আকৃষ্ট করতো। তিনি আল্লাহর নবীর কোন কথা দ্বিধাহীন চিত্তে কোন বাক্য ব্যায় ছাড়াই হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতেন। এজন্য আল্লাহর নবী তাঁকে 'সিদ্দীকে আকবর' উপাধী দিয়েছেন। যার অর্থ হলো সবথেকে বড়

সত্যবাদী। ইসলামী আন্দোলন ও তার কর্মকাণ্ড হযরত আবুবকর এমনভাবে আঞ্জাম দিয়েছেন যে, তার বিশাল সম্পদের সবটুকুই আন্দোলনের পথে ব্যায় করেছেন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। তিনি তাবুকের যুদ্ধের সময় ঘরে যা ছিল সবই আল্লাহর নবীর হাতে উঠিয়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহর রাসূল তাঁর কাছে জানতে চাইলেন– আবু বকর! ঘরে কি রেখে এসেছো?

সিদ্দীকে আকবর বিনয়ের সাথে বললেন– আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাম ব্যতীত ঘরে আর কিছুই নেই।

তিনি সর্বদা ছায়ার মতো আল্লাহর নবীকে অনুসরণ করতেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন, এ সময় দুশমন কর্তৃক তাঁকে অত্যাচারিত হতে হলো। এ দৃশ্য দেখে হযরত আবু বকর আল্লাহর নবীকে শত্রু মুক্ত করার লক্ষ্যে ছুটে গেলেন। ফলে তিনি মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়ে জ্ঞান হারালেন। জ্ঞান ফিরে আসতেই তিনি জানতে চাইলেন–আল্লাহর নবী কোথায়। তাঁর মাতা উম্মুল খায়ের বললেন– তিনি যায়েদ ইবনে আরকামের বাড়িতে আছেন। দুশমনদের আঘাতে তিনি ভীষণ অসুস্থ, তবুও তিনি নিজ মাতার সহযোগিতায় আল্লাহর নবীর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। আল্লাহর নবীর চোখ দিয়েও নেমে এলো অশ্রুর প্লাবন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আল্লাহর রাসূলের ব্যথাগুলো সমভাবে নিজের জন্য ভাগ করে নিয়েছিলেন।

মদীনায় হিজরত করার আদশে লাভের পর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে আল্লাহর নবী বললেন– তুমি আমার ঘরে ঘুমিয়ে থাকো।

হযরত আলী বললেন– হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার চাদরে নিজেকে আবৃত করে আপনার শয্যায় শুয়ে থাকবো। সকালে কাফিররা আপনার ঘরে প্রবেশ করে আপনার বিছানায় আমাকে শায়িত দেখে আমাকেই মুহাম্মাদ (সঃ) ভেবে কেটে টুকরো টুকরো করবে, এজন্য আমার মনে কোন দুঃখ নেই। আমার সবথেকে বড় সান্ত্বনা থাকবে, আমার জীবনের বিনিময়ে হলেও আল্লাহর নবী এ পৃথিবীতে জীবিত থাকবেন। আপনি দ্রুত মদীনার দিকে অগ্রসর হন।

গভীর রজনী। গোটা প্রকৃতি গভীর সুপ্তিতে নিমগ্ন। ঐ দুর গগনের নিহারীকাপুঞ্জ মিটি মিটি হাসছে। মরুময় প্রান্তরে মৃদুমন্দ দখিনা মলয় সমীরণ বইছে। জনমানবের কোথাও কোন সাড়া নেই। নিস্তব্ধ বসুন্ধরা। ইসলামের শত্রুরা নবীর আবাসস্থল বেষ্টন করে রয়েছে। তারা অপেক্ষা করছে প্রভাতের আলোর। পূর্ব গগনে তরুণ

তপন উদিত হবার সাথে সাথেই তারা হিংস্র আক্রোসে বন্য হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়বে শোষিত নিপিড়ীত ও নির্যাতিত মানবতার মুক্তির দীশারি বিশ্বনেতা জনাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপরে।

আল্লাহর রাব্বুল আলামীনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ঘর থেকে বের হয়ে আল্লাহর নবী চললেন হযরত আবু বকরের বাড়ির দিকে। তিনি হযরত আবু বকরের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মৃদু কণ্ঠে ডাক দিলেন। সাথে সাথে হযরত আবু বকর দরজা উন্মুক্ত করে বেরিয়ে এসে আল্লাহর রাসূলকে সালাম জানালেন। আল্লাহর নবী জানতে চাইলেন– তুমি কি রাতে ঘুমাও না? আমি ডাকার সাথে সাথে কিভাবে তুমি সাড়া দিলে?

জবাবে সিদ্দীকে আকবর লাজনম্র কণ্ঠে বললেন– হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যেদিন আমাকে হিজরতের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, সেদিন থেকে আমি বিছানায় না ঘুমিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকি। আমি চিন্তা করেছি, রাসূল এসে আমাকে ডাকবেন আর আমার উঠতে যদি দেরী হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহর নবীর সাথে বেয়াদবী করা হবে।

এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে সাথে নিয়ে মদীনার পথে অগ্রসর হচ্ছেন আর পিছন ফিরে কাবা ঘর দেখছেন। আল্লাহর নবীর চোখ দিয়ে অশ্রুর বন্যা বইছে। তিনি কা'বা ঘরকে লক্ষ্য করে বললেন– প্রিয় কা'বা! মনে বড় আশা ছিল প্রাণভরে তোমার খেদমত করবো কিন্তু তোমার নিষ্ঠুর সন্তানরা আমাকে মক্কায় থাকতে দিলনা।

প্রভাত হয়ে এলো, একটু পরেই দিনের আলোয় চারদিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। শত্রুর চোখে ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। তাঁরা উভয়ে আত্মগোপন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সামনেই পাওয়া গেল একটি গুহা। আল্লাহর নবী প্রথমে গুহার মধ্যে নামতে উদ্যত হলেন। সিদ্দীকে আকবর বললেন– আপনি নন, আমাকে সর্বপ্রথমে নামতে দিন। গুহার মধ্যে যদি কোন হিংস্র জানোয়ার রয়েছে কিনা আমি দেখছি। হযরত আবু বকর গুহার মধ্যে নেমে গুহা পরিস্কার করে, গুহার দেয়ালের ছিদ্রগুলো নিজের পোষাক ছিড়ে তার টুকরো দিয়ে বন্ধ করার পর আল্লাহর নবীকে নিয়ে এলেন।

আজকেও ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে এ ধরনের গুণাবলী সৃষ্টি না হলে বাতিলের সাথে মোকাবলায় বিজয়ী হওয়া যাবে না। সংগঠনের সমস্ত নেতা কর্মীর মধ্যে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর অনুপম গুণ রাশির সৃষ্টি হলে

এ কথা আল্লাহর ওপরে আস্থা রেখে বলা যায়, ঐ হেরার রাজ তোরণ অচিরেই বিশ্বময় পুনরায় প্রজ্বলিত হয়ে উঠবে। এ ধরনের গুণাবলীর সমন্বয় যে সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে ঘটবে, সে সংগঠনকে পৃথিবীর কোন বাতিল শক্তিই দাবিয়ে রাখতে পারবে না।

তমসা হলো দূরীভূত কোরআনের স্পর্শে

বাধার বিন্ধ্যাচল অতিক্রম করে ইসলামী আন্দোলন মক্কায় শক্ত ভিত্তি লাভ করলো। তদানীন্তন সমাজের সর্বস্তরের লোকজন ইসলামী আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। যারা বিরোধিদের মধ্যে মধ্যে ওমরও একজন। শৌর্য বীর্যের অধিকারী যুবক ওমর আরবের মহাবীর। রাসূলের আন্দোলন স্তব্ধ করে দেয়ার লক্ষ্যে সাম্ভাব্য সকল উপায়ে তিনি আবু জেহেলের সাথে প্রচেষ্টা চালালেন– কিন্তু সবই ব্যর্থ হলো। দ্বীনি আন্দোলন কিন্তু এই আন্দোলন তার গতি পথে এগিয়ে যাচ্ছেই।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এবং নব্য মুসলমানদেরকে শিয়াবে আবি তালিবে রুদ্ধ করার পূর্ব-পর্যন্ত আরকামের বাড়িটা ছিল এই ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়। এই বাড়িতেই হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং ইসলামের ইতিহাসে সেদিনই সর্বপ্রথম স্বয়ং আল্লাহর রাসূল উচ্চকণ্ঠে তাকবির দিয়েছিলেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর পিতার নাম ছিল খাত্তাব এবং মাতার নাম ছিল হান্‌তামা। তাঁরা ছিলেন আ'দী গোত্রের লোক। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর অষ্টম উর্ধ্ব পুরুষ কা'বা নামক ব্যক্তির মাধ্যমে আল্লাহর রাসূলের নছবের সাথে মিলিত হয়েছে। মক্কার জাবালে আকিব নামক পাহাড়ের পাদদেশে ছিল হযরত ওমরের উর্ধ্বতন গোষ্ঠীর বাসস্থান। ইসলামের স্বর্ণালী যুগে সে পাহাড়ের নাম দেয়া হয়েছিল জাবালে ওমর বা ওমরের পাহাড়।

হযরত ওমরেরই চাচাত ভাই যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল ছিলেন বিশ্বনবীর আগমনের পূর্বে তওহীদবাদী ছিলেন। তিনি নিজের জ্ঞান-বিবেক প্রয়োগ করে অনুভব করেছিলেন, মুর্তিপূজা একটা অর্থহীন অনুষ্ঠান মাত্র। এর ভেতরে কোন কল্যাণ নেই। তিনি মৃত জানোয়ার, রক্ত এবং মূর্তির সামনে জবেহকৃত জানোয়ারের গোস্ত হারাম মনে করতেন। সে সময় যে কন্যা সন্তানকে হত্যা করা হতো তিনি এ

কাজে বাধা দিতেন এবং সেসব কন্যাকে হেফাজত করার চেষ্টা করতেন। ইয়াহুদী এবং খৃষ্টান ধর্ম সম্পর্কে বলতেন–তাদের মূর্তিপূজা আর আমাদের জাতির মূর্তিপূজার ভেতরে পার্থক্য কোথায় ?' হযরত আসমা বিনতে আবু বকর বলেছেন– আমি তাঁকে দেখেছি তিনি কা'বার দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে কুরাইশদের বলতেন, হে কুরাইশরা! আল্লাহর শপথ! আমি এমন কোন পশুর গোস্ত আহার করবো না যা আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্য কারো নামে জবেহ করা হয়েছে। আল্লাহর শপথ! আমি ব্যতীত তোমরা কেউ-ই হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের ধর্মের ওপরে প্রতিষ্ঠিত নও। তিনি মহান আল্লাহকে উদ্দেশ্য করে বলতেন– হে আল্লাহ! আমি যদি জানতাম কোন পদ্ধতিতে তোমার দাসত্ব করলে তুমি খুশী হবে তাহলে আমি সেই পদ্ধতিই গ্রহণ করতাম। তিনি নিজের হাতের তালুতে মাথা রেখে সিজদা করতেন।

প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধানে তিনি সিরিয়া ভ্রমণ করেন কিন্তু কোথাও তিনি সত্যের সন্ধান লাভ করেননি। অবশেষে তিনি আল্লাহর কাছে দু'হাত তুলে বলেন– হে আল্লাহ! আমি তোমাকে সাক্ষী রেখে ঘোষণা করছি, আমি তোমার নবী ইবরাহীমের আদর্শের ওপরে প্রতিষ্ঠিত আছি।

আল্লাহর রাসূলের জন্মগ্রহণের পাঁচ বছর পূর্বে লাখাম শহরে তিনি গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ হারান। মূর্তি পূজা না করার কারণে তাঁকে তাঁর চাচা খাত্তাব নানাভাবে অত্যাচার করতো। মক্কার দুষ্কৃতকারীদের সে তাঁর পেছনে লাগিয়ে দিয়েছিল যেন সে মক্কায় প্রবেশ করতে না পারে। ইসলাম গ্রহণ করার পরে হযরত ওমর ও হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ আল্লাহর রাসূলের কাছে জানতে চেয়েছিলেন– যায়েদের আদর্শ সম্পর্কে আপনি কি বলেন এবং আমরা কি তাঁর মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে পারি?

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন– অবশ্যই পারো, কিয়ামতের দিনে সে একাই একটি উম্মত হিসাবে উঠবে।

এই যায়েদ ইবনে নুফাইল ছিলেন ফারুকে আজমের চাচাত ভাই। ফারুকে আজম হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর বাল্যকাল সম্পর্কে তেমন একটা কিছু জানা যায় না। তবে তাঁকে দিয়ে তাঁর পিতা খাত্তাব ছাগল চরিয়েছেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর শাসনামলে একবার কিছু লোকজনসহ দাজনান নামক প্রান্তর অতিক্রম করার সময় লোকদেরকে তাঁর কৈশর বয়সের ঘটনা শোনালেন– এমন এক সময় ছিল যখন আমি পশমের পোষাক পরিধান করে এই প্রান্তরে প্রচন্ড রোদের মধ্যে আমার আব্বার পশুপাল চরাতাম। তিনি ছিলেন অত্যন্ত

কঠোর মেজাজের মানুষ। আমি ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করলে তিনি আমাকে নির্মমভাবে প্রহার করতেন। কিন্তু মহান আল্লাহ আজ আমার জীবনে এমন সময় দান করেছেন যে, আমার ওপরে এক আল্লাহ ব্যতীত কর্তৃত্ব করার আর কেউ নেই। ঐতিহাসিক বালাযুরী তাঁর সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, যে সময়ে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নবুয়্যাত লাভ করেন সে সময়ে কুরাইশদের মধ্যে মাত্র সতেরজন লোক লেখা পড়া জানতেন। তাঁর মধ্যে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন একজন। ইতিহাস থেকে জানা যায়, হযরত ওমর ছিলেন আরবের শ্রেষ্ঠ বীর এবং বিখ্যাত কুস্তিগীর-পাহলোয়ান। উকাযের মেলায় তিনি কুস্তি প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতেন। সমকালিন বিখ্যাত কবিদের সমস্ত কবিতা ছিল তাঁর কণ্ঠস্থ, এ থেকে ধারণা করা যায় তাঁর মধ্যে কাব্য প্রতিভা ছিল প্রখর। আরবী কাব্য সমালোচনার বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতির আবিষ্কারক ছিলেন তিনি। বংশ তালিকা বিদ্যায় তিনি ছিলেন পারদর্শী। ঐতিহাসিকগণ বলেন, তাঁর জ্ঞান-বিবেক বুদ্ধির সুনাম চারদিকে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, কোন গোত্রের সাথে আরেক গোত্রের সম্পর্কের অবনতি ঘটলে তাঁকেই দুত হিসেবে প্রেরণ করা হতো। তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী এজন্য তাঁকে বিদেশ ভ্রমণ করতে হতো। বিদেশী নেতৃবৃন্দ, শাসক ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে মেলামেশার কারণে তাঁর জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধি বিশেষ এক স্তরে উন্নীত হয়েছিল। নেতৃত্বের যাবতীয় গুণাবলী ছিল তাঁর মধ্যে বিদ্যমান। সেই মূর্খতার যুগেও তিনি ছিলেন নেতা আবার ইসলাম গ্রহণ করার পরেও তিনিই ছিলেন নেতা। ইসলামী আন্দোলনের জন্য তাঁর মত ব্যক্তিত্বের একান্ত প্রয়োজন ছিল। আল্লাহর নবীর কামনা করতেন– আবু জেহেল ও ওমরের মত প্রভাবশালী লোকজন যদি ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামী আন্দোলনে শামিল হয় তাহলে কতই না ভালো হয়।

এ কারণেই বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর মত ব্যক্তিত্বের জন্য দোয়া করেছিলেন–হে আল্লাহ! ওমর ইবনে খাত্তাব অথবা আমর ইবনে হিশামকে–যাকে তুমি পছন্দ করো, তার হৃদয়ে তোমার কুদরতী নেজাম দিয়ে সত্যের বীজ বপন করে দাও। তাঁকে ইসলামে দাখিল করে তুমি ইসলামকে শক্তিশালী করো।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া কবুল হলো। আল্লাহ তা'য়ালা ওমরকে ইসলামের জন্য নির্বাচন করলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণ করার ঘটনা ছিল বড় অপূর্ব। তিনি ছিলেন আদী গোত্রের লোক, তাঁর এই গোত্রে তাওহীদের আলো নতুন কিছু ছিল না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্বেই তাওহীদবাদী ছিলেন হযরত যায়েদ, আর বিশ্বনবীর হাতে হাত দিয়ে ইসলাম কবুল

করেছিলেন ঐ যায়েদেরই সৌভাগ্যবান সন্তান হযরত সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং তাঁর স্ত্রী হযরত ফাতিমা বিনতে খাত্তাব। হযরত সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একদিকে ছিলেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর চাচাত ভাই এবং আরেকদিকে ছিলেন তাঁর আপন বোনের স্বামী।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর বংশের আরেকজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ইসলাম কবুল করেছিলেন, তাঁর নাম ছিল হযরত নুয়াইম ইবনে আব্দুল্লাহ। তিনি তখন পর্যন্ত ইসলাম সম্পর্কে তেমন কোন সংবাদ রাখতেন না। কেননা, ইসলামী কার্যক্রমের গোপনীয়তার কারণে অনেকেই ইসলাম সম্পর্কে জানতেন না। তাছাড়া যারা শুনেছিল, তারা হয়ত ভেবেছিল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের এই নতুন আদর্শ সমাজে তেমন প্রভাব বিস্তার করবে না। দু'চারজন লোকের কাছেই সে আদর্শ সীমাবদ্ধ থাকবে। অর্থাৎ নেতৃস্থানীয় কেউ যদি তা শুনেই থাকে ব্যাপারটাকে তাঁরা তেমন গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু হযরত ওমর যখন ইসলামের কথা শুনলেন তখন তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন। তাঁর আত্মীয়-স্বজন যারা ইসলাম কবুল করেছিল, তিনি তাদের প্রাণের শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন।

তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনার এক পর্যায়ে দেখা গেল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের জন্য কাবা ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন। হযরত ওমরও তখন আল্লাহর নবীর পিছু নিয়েছেন তাঁকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে। নবী নামাযে দাঁড়িয়ে কোরআনু কারীমের সূরা আলহাক্কাহ্ তিলাওয়াত করছেন। ওমর তন্ময় হয়ে নবীর সুললিত কণ্ঠে আল্লাহর বাণী শুনছে। এক পর্যায়ে তাঁর মনে হলো, এমন কবিত্বময় ভাষা, এমন হৃদয়গ্রাহী, চিত্তাকর্ষক-মনোমুগ্ধকর সাবলীল বর্ণনাভঙ্গি। কি সুন্দর কবিতা! এই লোকটি কালক্রমে বিখ্যাত কবি হিসাবে খ্যাতি লাভ করবেন। ওমরের মনের কল্পনার সমাপ্তি ঘটলো না, তার পূর্বেই আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবীর মুখে উচ্চারিত করালেন–

انَّه لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ وَّمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ–قَلِيْلاً مَّا تُؤْمِنُوْنَ–

এ এক মহা সম্মানিত বার্তা বাহকের কথা, এটা কোনো কবির কথা নয়, কিন্তু তোমাদের মধ্যে কম মানুষই বিশ্বাস স্থাপন করে থাকে।

ওমর অবাক বিস্ময়ে ক্ষণিকের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন, একি! আমার চিন্তার জগতে যে কল্পনার উদয় হলো, সে কল্পনার বিষয় এই লোকটি জানলো কিভাবে? তাহলে এ লোক শুধু কবিই নয় সেই সাথে পারদর্শী একজন

গনকও বটে। হযরত ওমরের মনের এ কল্পনার জবাবও জবাব মহান আল্লাহ অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় তার নবীর মুখ থেকে উচ্চারিত করালেন–

وَلاَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ-قَلِيْلاً مَّاتَذَكَّرُوْنَ -

এ কোন গণকেরও কথা নয়, তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।

হযরত ওমর ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। মনের জগতে চিন্তার ঝড় প্রবাহিত হয়ে গেল। মনে প্রশ্ন সৃষ্টি হলো, তাহলে এটা কার কথা? তাঁর মনের জগতে সৃষ্টি হওয়া এই প্রশ্নেরও জবাব আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবীর সুললিত কণ্ঠের মাধ্যমে দিয়ে দিলেন–

تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

এটা ঐ মহান আল্লাহর বাণী যিনি এই গোটা বিশ্বের পরিচালক।

এ ঘটনা হযরত ওমরের ভেতরটা নড়বড়ে করে দিয়েছিল। তাঁর চিন্তার জগতে এক পরিবর্তন দেখা দিল। কিন্তু তবুও তিনি ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়চেতা কঠিন হৃদয়ের মানুষ। তিনি তাঁর মনের অবস্থা অন্যের কাছে প্রকাশ করলেনা। ইতোমধ্যে ইসলামের দুশমনরা পরামর্শ সভা আহ্বান করলো।

উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে আবু জেহেল ঘোষণা করলো– তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি মোহাম্মদ (সঃ) এর মাথা কেটে আনতে পারবে, তাকে আমি এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা এবং একশত উট পুরস্কার দিব।

উত্তেজিত জনমন্ডলীর মধ্য থেকে চির উন্নত মস্তক, সিংহ হৃদয়, অসীম সাহসী যুবক, বীর কেশরী মহাবীর ওমর নাঙ্গা তরবারী হাতে দন্ডায়মান হলেন। চোখে মুখে ক্রোধের বহ্নিশিখা। দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন– আমি এনে দিচ্ছি মোহাম্মাদ (সঃ)-এর মাথা। তাঁর মাথা না নিয়ে আজ ওমর ঘরে ফিরবে না।

তাঁর দৃঢ় প্রতীজ্ঞা শুনে ইসলামের দুশমনরা আশাবাদী হয়ে উঠলো যে, মুহাম্মাদ (সঃ)-এর জীবন প্রদীপ ওমরের হাতেই নির্বাপিত হবে এবং ইসলামও আজই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

শাণিত তরবারী কাঁধে ঝুলিয়ে তিনি আল্লাহর রাসূরের সন্ধানে বের হলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেছেন, পথে তাঁর সাথে কথা হয়েছিল বনী যুহরার এক নও মুসলমানের সাথে, আবার কোন ঐতিহাসিক বলেছেন, তাঁর সাথে দেখা হয়েছিল হযরত নুয়াইম ইবনে আব্দুল্লাহর সাথে। ধারণা করা হয়, সে পথিক ছিল নও মুসলিম। সে হযরত ওমরকে জিজ্ঞাসা করলো– হে ওমর! তুমি এমন ক্রোধের সাথে এই রুদ্র মুর্তি ধারণ করে কোথায় যাচ্ছো?

লোকটির প্রশ্নের জবাবে হযরত ওমর ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে বললেন– মুহাম্মাদ (সঃ)-এর সাথে একটা শেষ বুঝাপড়া করতে।

লোকটি তাঁকে সাবধান করে দেয়ার জন্য বললো– মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কোন ক্ষতি করলে তাঁর গোত্রের লোকজন অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করবে।

লোকটির একথায় হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সন্দেহের দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন– তুমি বোধহয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের আদর্শে দীক্ষা গ্রহণ করেছো?

লোকটি হযরত ওমরের দৃষ্টি ভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য দ্রুত কণ্ঠে বললো– একটা সংবাদ শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে– তোমার বোন এবং তাঁর স্বামী ইসলাম কবুল করেছে। এ কথা শোনার সাথে সাথে হযরত ওমর ক্রোধে ফেটে পড়লেন। হিতাহিত জ্ঞান শুন্যের মত তিনি ছুটলেন তাঁর বোনের বাড়ির দিকে।

তাঁর বোন-ভগ্নিপতি ঘরের দরোজা বন্ধ করে সে সময়ে হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর কাছে কোরআনের সূরা ত্ব-হা শিক্ষা গ্রহণ করছিলেন। হযরত ওমর বোনের বদ্ধ দরজার সম্মুখে যেতেই তাঁর কানে কোরআনের মধুর বাণী প্রবেশ করলো। সেই সাথে তাঁর অন্তরের পুঞ্জিভূত বরফ যেন ক্রমশ তরল হয়ে এলো। তিনি ব্যঘ্র গর্জনে বোনের দরজায় আঘাত করলেন। ওমর আগমন করছে– এই আভাস পেয়ে হযরত খাব্বাব আত্ম গোপন করলেন। দরজা খুলে দেয়ার পরে হযরত ঘরে প্রবেশ করে তাঁদের ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে জানতে চাইলেন– আমি শব্দ শুনেছি। তোমরা কি পড়ছিলে?

তাঁরা জবাব দিলেন– আমরা পরস্পরে কথা বলছিলাম।

তিনি বললেন– তোমরা ধর্ম ত্যাগ করে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ধর্ম গ্রহণ করেছো?

ওমরের ভগ্নিপতি বললেন– আমাদের ধর্ম থেকে অন্য ধর্ম যদি উত্তম হয় তাহলে তুমি কি করবে, ওমর?

তাঁর মুখের কথা শেষ না হতেই হযরত ওমর নিজ ভগ্নিপতির ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁকে নির্মমভাবে প্রহার করলেন। স্বামীকে রক্ষা করতে এসে তাঁর বোনও ভাইয়ের হাতে রক্তাক্ত হলেন। বোনের শরীরে রক্ত দেখে হযরত ওমর যেন চমকে উঠলেন। ইতোপূর্বেই তাঁর অভিজ্ঞতা হয়েছিল, নিষ্ঠুর নির্যাতনের মুখেও তাঁর দাসী এই ধর্ম ত্যাগ করেনি। তাঁর বোন এবং ভগ্নিপতির অবস্থাও তেমনি। তাহলে কি

আছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের আদর্শে? প্রশ্নটা তাঁর ভেতরের পৃথিবীটা সম্পূর্ণ ওলট-পালট করেদিল। তিনি কেমন যেন বিহবল হয়ে পড়লেন। অনুশোচনার কণ্ঠে তিনি তাঁর বোন-ভগ্নিপতিকে বললেন– তোমরা কি পড়ছিলে আমাকে দেখাও!

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর কণ্ঠের পরিবর্তন শুনেই তাঁরা অনুভব করেছিলেন, ওমরের ভেতরে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। তাঁরা জানালো– আমরা যা পড়ছিলাম তা মহান আল্লাহর বাণী, অপবিত্র অবস্থায় তা স্পর্শ করা যায় না।

সুবোধ বালকের মতই হযরত ওমর পবিত্র হয়ে এসে আল্লাহর কোরআন পড়তে লাগলেন। মুহূর্তে তাঁর হৃদয়ের সমস্ত অন্ধকার দূরীভূত হয়ে সেখানে তাওহীদের জান্নাতি শিখা দেদিপ্যমান হয়ে উঠলো। যত পড়ে ততই যেন হৃদয়-মন এক অনাবিল আবেশে ভরপুর হয়ে যায়। ওমর কোরআন তিলাওয়াত করছেন। অশ্রু সজল হয়ে উঠেছে তাঁর চোখ, দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেছে। তিনি যখন তিলাওয়াত করলেন–

اِنَّنِىْ اَنَا اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعْبُدْنِىْ-وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ-

আমিই একমাত্র ইলাহ, আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। অতএব, আমারই দাসত্ব করো এবং নামাজ কায়েম করো।

এই আয়াত পড়েই ওমর উচ্চকণ্ঠে কালিমা শাহাদাত পাঠ করলেন। তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। ভুলে গেলেন তিনি মোহাম্মাদের মাথা নেয়ার কথা, যার মাথা নেয়ার জন্য ওমর নাঙ্গা তরবারী নিয়ে ছুটে এসেছেন এখন নিজের মাথা তাঁর পবিত্র পদপ্রান্তে নত করে দেয়ার জন্য ওমর পাগল হয়ে উঠেছে। তিনি ব্যগ্র কণ্ঠে আবেদন জানালেন– কোথায় আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম! আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলো।

হযরত ওমরের পরিবর্তন দেখে হযরত খাব্বাব গোপন স্থান থেকে বের হয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে আনন্দিত কণ্ঠে বললেন– হে ওমর! আনন্দের সংবাদ গ্রহণ করো, তোমার জন্য আল্লাহর রাসূল দোয়া করেছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলের দোয়া কবুল করেছেন। তিনি এখন সাফা পাহাড়ের ওপরে আরকামের বাড়িতে অবস্থান করছেন।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এখন ভিন্ন এক জগতের মানুষ। তিনি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এই পৃথিবীতে ইসলাম প্রচার করা থেকে বিরত করতে এসেছিলেন। এসেছিলেন তওহীদের জ্যোতিকে নির্বাপিত করতে।

এখন স্বয়ং তিনিই সে জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। দারে-আরকামের দিকে তিনি চলেছেন। পূর্বের মতই তাঁর কাঁধে তরবারী ঝুলানো রয়েছে, তবে সে তরবারী এখন ব্যবহার হবে আল্লাহদ্রোহী বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে ইসলামী আদর্শের পক্ষে। হযরত হামজা ও হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম সে সময়ে দারে-আরকামের দরজায় কিছু সংখ্যক মুসলমানসহ প্রহরা দিচ্ছিলেন। হযরত ওমরকে কাঁধে তরবারী ঝুলিয়ে আসতে দেখে তাঁরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। হযরত হামজা উপস্থিত সকলকে আশ্বস্ত করে বললেন– তাঁকে আসতে দাও, আল্লাহ যদি ওমরের কল্যাণ করেন তাহলে সে ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলের আদর্শ অনুসরণ করবে, আর যদি সে অন্য উদ্দেশ্যে আসে তাহলে তাঁর তরবারী দিয়েই তাকে হত্যা করা হবে।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সে সময়ে আরকামের বাড়ির ভেতরে অবস্থান করছিলেন। তাবাকাতে ইবনে সায়াদে বর্ণনা করা হয়েছে, সে সময় তাঁর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হচ্ছিল। আবার কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে এ সময় রাসূলকে ওমরের আগমনের কথা জানালে তিনি প্রশান্ত চিত্তে বলেছিলেন– তাঁকে আসতে দাও।'

এরপর হযরত ওমর এসে পৌঁছলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে এসে তাঁর তরবারীর গোড়ার দিক এবং পরনের কাপড় নিজের হাতে ধরে মমতাভরা কণ্ঠে বললেন– হে ওমর! তুমি কি বিরত হবে না? হে আল্লাহ! ওমর আমার সামনে, হে আল্লাহ ওমরের মাধ্যমে তুমি তোমার ইসলামকে শক্তিশালী করো।'

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আল্লাহর নবীর হাতে হাত রেখে দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করলেন– হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার জন্য আপনার কাছে এসেছি।

হযরত ওমরের কণ্ঠে এমন ব্যাকুল আবেদন শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ বলেন– তিনি সে মুহূর্তে উচ্চ কণ্ঠে আল্লাহ আকবার বলে তাকবির দিয়েছিলেন। বর্তমান কালের গবেষকগণ যাকে বিজয়ের শ্লোগান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। উপস্থিত সাহাবাগণও সেদিন নীরব ছিলেন না, তাঁরাও আল্লাহর নবীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে সেদিন তাওহীদের বিজয় ঘোষণা করেছিলেন। নবী এবং সাহাবাদের সম্মিলিত শ্লোগানে সেদিন পৃথিবীর সমস্ত বাতিল শক্তির ভিত্তি ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে পড়েছিল, যা শুধু ধ্বসে পড়ার অপেক্ষায় ছিল। তাঁদের আল্লাহু আকবার তাকবিরের আওয়াজ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে গোটা আরবকে কাঁপিয়ে তুললো।

ইসলামের বিপ্লবী কাফেলায় শামিল হয়েই আল্লাহর সৈনিক ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঘোষনা করলেন–হে আল্লাহর রাসূল! আর লুকোচুরি নয়, আল্লাহ বিরোধী মিথ্যে শক্তি প্রকাশ্যে তৎপরতা চালাবে, আল্লাহর ঘর তারা নিয়ন্ত্রণ করবে আর আমরা যারা মহান আল্লাহর দাসত্ব করি তাঁরা কা'বায় নামায আদায় করতে পারবো না, গোপনে নামাজ আদায় করবো তা হতে পারে না। চলুন আমরা প্রকাশ্যে কা'বায় মহান আল্লাহকে সিজদা করবো।

হযরত ওমর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আল্লাহর রাসূল কর্তৃক ইসলামী আন্দোলন শুরু করার ছয় বছরের কালে। সে সময় হযরত ওমরের বয়স ছিল ত্রিশ বা তেত্রিশ। ইমাম যুহরী বর্ণনা করেছেন– আল্লাহর রাসূল দারে-আরকামে প্রবেশের পরে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পরে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম আল্লাহর রাসূলকে জানিয়ে ছিলেন– হে আল্লাহর রাসূল! ওমরের ইসলাম গ্রহণের কারণে আকাশের অধিবাসীগণ খুশীতে আত্মহারা হয়ে উঠেছে।

ঐতিহাসিকগণ বলেন– হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইসলাম গ্রহণ করেছেন এ কারণে গোটা মক্কায় একটা শোরগোল সৃষ্টি হয়েছিল। প্রতিটি মানুষের মুখে ছিল সেই আলোচনা। ব্যাপারটা আল্লাহর সৈনিকদের কাছে পরম খুশীর হলেও আল্লাহদ্রোহীদের কাছে তা ছিল একেবারে অবিশ্বাস্য। তাঁরা হতবাক হয়ে পড়েছিল। এই শোরগোল শুনে বীর কেশরী আস ইবনে ওয়াঈল এসে সমবেত কুরাইশদের কাছে জানতে চাইলো– কি হয়েছে তোমাদের, এত হৈ চৈ করছো কেন?

কুরাঈশরা তাঁকে জানালো– সর্বনাশের সংবাদ হলো ওমর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দলে ভিড়েছে।

এ সংবাদ শুনে আস ইবনে ওয়াঈল বললো– ওমর ঠিকই করেছে। আমি তাঁকে আশ্রয় দিলাম। (বুখারী)

স্বয়ং হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন– আমি ইসলাম গ্রহণ করে সে রাতেই চিন্তা করলাম মক্কায় ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু কে আছে, তাকেই আমি আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ জানাবো। আমার দৃষ্টিতে ধরা পড়লো ইসলামের বড় শত্রু হলো আবু জেহেল। পরদিন সকালে আমি আবু জেহেলের বাড়িতে চলে গেলাম। তাঁর ঘরের দরজায় করাঘাত করে তাকে ডাকলাম। সে দরজা খুলে আমার দিকে তাকিয়ে বললো– ওমর! তুমি আমার কাছে এত সকালে কি মনে করে এসেছো? আমি তাকে বললাম, আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি

ঈমান এনেছি। আমার কথা শুনে আবু জেহেল বললো, আল্লাহ তোকে কলঙ্কিত করুক এবং যে সংবাদ নিয়ে তুই এসেছিস তাকেও কলঙ্কিত করুক। কথা শেষ করেই সে আমার মুখের ওপরে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল।

তদানীন্তন মক্কায় হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর ইসলাম গ্রহণ করা ছিল এক যুগান্তকারী ঘটনা। তাঁর ইসলাম গ্রহণের কারণে একদিকে ইসলাম বিরোধী শক্তির ভীত যেমন কেঁপে উঠেছিল অপর দিকে ইসলামী আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি পেয়েছিল। এতদিন মুসলমানরা তাঁদের তৎপরতা চালানোর ব্যাপারে শঙ্কায় নিমজ্জিত থাকলেও তাঁরা এবারে শঙ্কাহীন চিত্তে তৎপরতা শুরু করলো। ইতোপূর্বে নিজেকে মুসলিম হিসেবে ঘোষণা দেয়া ছিল এক অসম্ভব ব্যাপার, হযরত ওমরের ইসলাম গ্রহণের পরে সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো। ইসলামী কার্যক্রম ছিল এতদিন মক্কার জনগোষ্ঠীর কাছে গুরুত্বহীন। কিন্তু তাঁরা এবার অনুভব করলো, এ আন্দোলন শুরু হয়েছে অন্যান্য শক্তিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়ার লক্ষ্যে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর কার্যক্রমকে লক্ষ্য স্থলে না পৌঁছে দিয়ে বিরত হবেন না। তাঁরা অনুভব করলো, এতদিন যাকে গুরুত্বহীন মনে করা হয়েছে, আজ সেই গুরুত্বহীন শক্তি বিশাল এক পর্বতে পরিণত হয়েছে। যা অতিক্রম করা এখন তাদের কাছে এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। মক্কার ইসলাম বিরোধী শক্তির আহার নিদ্রা ত্যাগের উপক্রম হলো। যে কোন উপায়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মিশনকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার লক্ষ্যে তাঁরা একটা চরম সিদ্ধান্তে পৌঁছলো।

কেননা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর ইসলাম গ্রহণ করার পরে গোটা মক্কায় ইসলাম একটি আন্দোলন, একটি শক্তি, একটি সংগঠন, একটি অত্যাসন্ন অনিবার্য বিপ্লব, একটি অপ্রতিরোধ্য প্রকাশ্য শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। মুসলমানরা প্রকাশ্যে কা'বায় নামায আদায় শুরু করেছিল, তাঁদের বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বললে তাঁরা উপযুক্ত জবাব দিতেন। কা'বার পাশে তাঁরা প্রকাশ্যে জমায়েত হতেন। তাঁদের ওপরে কেউ আক্রমণ করলে তাঁরা সে আক্রমণ প্রতিহত করতেন। প্রকাশ্যে তাঁরা কা'বা শরীফ তাওয়াফ করতেন। বিশেষ করে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে কেউ কোন কথা বললে তিনিও ছেড়ে কথা বলতেন না, উপযুক্ত জবাব দিতেন।

হযরত ওমর ইসলাম গ্রহণ করার পরে ইসলামের বীর মুজাহিদরা সারিবদ্ধভাবে মিছিলের অনুরূপ ভঙ্গিতে কাবা গৃহে উপস্থিত হলেন। অভাবিত এই দৃশ্য অবলোকন করে ইসলামের দুশনদের চক্ষু বিস্ফোরিত হয়ে গেল। কোথায় তারা দেখবে মুহাম্মাদের কাটা মাথা আর ওমরের রক্তাক্ত তরবারী, সেখানে দেখতে হচ্ছে

স্বয়ং ওমরের মাথা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদপ্রান্তে নত করার দৃশ্য। একজন সাহস করে ওমরের কাছে জানতে চাইলো– কোন শক্তি ওমরকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে বাধ্য করেছে? হযরত ওমর তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে বললেন– সে শক্তি হলো আল কোরআন।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর হিজরত অন্যান্য মুসলমানদের ন্যায় চুপিসারে ছিল না। তিনি প্রকাশ্যে মক্কার বিরোধী শক্তিকে জানিয়ে তাদের প্রতি বিদ্রোহ প্রদর্শন করে হিজরতের ঘোষণা দিয়েছিলেন। মাতৃভূমি মক্কা ছেড়ে মদীনা যাওয়ার মুহূর্তে তিনি প্রশান্ত চিত্তে কা'বাঘর তাওয়াফ করেন। তারপর ইসলাম বিরোধিরা যেখানে জমায়েত হতো সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের মধ্যে ঘোষণা করেন– আমি ওমর, মদীনায় চলে যাচ্ছি। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তাঁর মা'কে সন্তানের শোকে কাঁদাতে চাও তাহলে সে যেন আমার চলে যাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে।

এভাবে বজ্র কঠিন কণ্ঠে ঘোষনা দিয়ে তিনি হিজরত করেন। কিন্তু কোন এক ব্যক্তিরও সেদিন ক্ষমতা হয়নি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে বাধাদান করার।

ইসলামী আন্দোলনে শামিল হওয়ার পরে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর জীবন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর রঙে রঙিন হয়ে গিয়েছিল। যার ফলে আল্লাহর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন– আমার পরে আর কেউ নবী হবে না, যদি কোন নবী হতো তাহলে ওমর অবশ্যই আল্লাহর নবী হয়ে যেত।

হযরত ওমর কোরআনের পথে এতটা অগ্রসর হয়েছিলেন যে, পৃথিবীতে জীবিত থাকাকালে তিনি জান্নাতী হিসেবে আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদ লাভ করেছিলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে এমন অধিক যোগ্যতা দান করেছিলেন যে, আধ্যাত্মিকতার উচ্চমার্গে তিনি অবস্থান করতেন। সাগরের অথৈ জলরাশি তাঁর আদেশ পালন করতো। তাঁর খেলাফত আমলে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একদিন শেষ রাতে স্বপ্ন দেখছেন, মসজিদে নববীর মধ্যে আল্লাহর রাসূল ফজরের জামায়াতে ইমামতি করছেন। নামায শেষ করে তিনি পূর্ব দিকে ঘুরে বসলেন। এমন সময় মসজিদে নববীর দক্ষিণ পথ দিয়ে এক বৃদ্ধা খেজুরের থলি হাতে প্রবেশ করে আল্লাহর নবীর হাতে দিয়ে বললেন– হে আল্লাহর রাসূল! আপনি খাবেন এবং আপনার সঙ্গীদের দেবেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর হাতে উঠে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকের নাম জানতে চেয়ে খেজুর বন্টন করছেন।

এভাবে হযরত আলীকে লক্ষ্য করে নাম জানতে চাইলেন। তিনি নাম বলার পরে আল্লাহ রাসূল তাঁকে দুটো খেজুর দিলেন।

ঘুমের রাজ্যে স্বপ্নের মধ্যে হযরত আলী আল্লাহর নবীর পবিত্র হাত থেকে খেজুর গ্রহণ করে মুখে দিলেন। এমন সময় তিনি ফজরের আযান শুনতে পেলেন। শয্যা ত্যাগ করার পর অযু করে মসজিদে নববী উপস্থিত হলেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নামাযের ইমামতি করলেন। হযরত আলীর স্বপ্নে দেখা দৃশ্য এবার বাস্তবে পরিণত হলো। মসজিদে নববীর দক্ষিণ পথ দিয়ে এক বৃদ্ধা খেজুর হাতে প্রবেশ করে হযরত ওমরের হাতে দিয়ে বললেন– হে আমিরুল মুমেনীন! আপনি খাবেন এবং রাসূলের সাহাবাদেরকে দিবেন। হযরত ওমর খেজুর হাতে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকের নাম জেনে তারপর খেজুর বন্টন করছেন। হযরত আলীর নাম জেনে নিয়ে তিনি তাঁকে দুটো খেজুর দিলেন। হযরত আলী আপত্তি জানিয়ে বললেন– হে ওমর! আমাকে মাত্র দুটো দিলে কেন?

হযরত ওমর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন– হে আলী! রাতে স্বপ্নের মধ্যে আল্লাহর নবী তোমাকে কয়টি খেজুর দিয়েছিলেন?

আজও আল্লাহর কোরআন এবং নবীর সুন্নাহ অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীগণ যথার্থভাবে কোরআন-সুন্নাহর অনুশীলন করে, জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে যদি ইসলামী নীতিমালা অনুসরণ করে, তাহলে হযরত ওমর ফারুকের অনুরূপ গুণাবলী সম্পন্ন চরিত্র সৃষ্টি হওয়া অসম্ভবের কিছু নয়। বর্তমান পৃথিবীতে ইসলামকে ময়দানে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ওমরের উত্তরসূরী তরুণ-যুবকদেরই প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে। হযরত ওমর যুবক বয়সেই ইসলামী আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন। তরুণ-যুবকদেরই শৌর্য-বীরত্ব আর রক্তই ইসলাম প্রতিষ্ঠার ভিত্তি। তরুণ-যুবকদের রক্ত ওপরই ইসলামের বিজয় কেতন উড্ডীন হয়েছে।

নারী রক্তের আলপনায় এঁকেছে বিজয়

আরবের প্রচলিত বংশ কৌলিণ্যের মাপকাঠি অনুযায়ী সুমাইয়া ছিলেন ছোট বংশের মহিলা। পক্ষান্তরে তার চিন্তাধারা ছিল অত্যন্ত উচু স্তরের। তার জ্ঞানগর্ভ কথা বার্তায় মানুষ সহজেই আকৃষ্ট হতো। তিনি প্রখর বুদ্ধি মত্তার সাহায্যে সহজেই সত্য মিথ্যার পার্থক্য অনুভব করতে সক্ষম ছিলেন। এ জন্যে অতি সহজেই তিনি

ইসলামী আন্দোলনের বিপ্লবী দাওয়াতের মর্মবাণী উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি একজন ক্রীতদাসী হয়ে সেই সময় ইসলাম কবুল করেছিলেন-যখন ইসলাম কবুল করার অর্থই ছিল নির্যাতনের পাহাড়কে নিজের ওপরে ভেঙ্গে পড়তে নিজের হাতে সাহায্য করা। কিন্তু ইসলামী আদর্শের জন্য যার হৃদয়-মন চাতক পাখীর মতই তৃষ্ণার্ত হয়ে আছে তিনি কি আর পৃথিবীর কোন বাতিল শক্তিকে ভয় পান! হৃদয়ের অর্গল যিনি উন্মুক্ত করে দিয়েছেন মহাসত্যের তীব্র আলোকচ্ছটা সেখানে প্রবেশে কে বাধার সৃষ্টি করতে পারে? তিনি নিজ চোখের সামনে দেখছেন, ইসলাম কবুলকারী মাত্র ছয়জন মুসলমানের কি করুণ অবস্থা! ইসলামী আন্দোলন বিরোধিদের কঠোর কোপানলে পড়ে তাদের জীবন বিপন্ন প্রায়। মরু সাইমুম তাড়িত পিপার্সিত পথিক যেমন পানি দেখলে সকল বাধা অতিক্রম করে পানির দিকে ছুটে যায়, ঠিক তেমনি হযরত সুমাইয়া মহাসত্যের আলো আল্লাহর নবীর দিকে তীব্র বেগে ছুটে গেলেন।

তিনি ইসলাম কবুল করে মুসলমানদের সংখ্যা সাতে পৌছে দেন। ভুলে গেলেন তিনি পারিপার্শিকতার কথা। কোন ভীতিই তার মনে প্রভাব সৃষ্টি করতে পারলো না। স্বামী ইয়াছির ও পুত্র আম্মারকে তিনি দ্বীনি আন্দোলনে শামিল করলেন। পৃথিবীতে যখনই কোন নতুন আদর্শের আবির্ভাব হয়েছে তখন এমন কিছু মানুষ সেই আদর্শ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন, যাদের সমাজে কোন গুরুত্বই ছিল না। কিন্তু হযরত সুমাইয়া সামান্য একজন ক্রীতদাসী হয়ে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করার জন্য নিজেকে যেভাবে উৎসর্গ করেছিলেন, যেভাবে জীবনের সকল আশা আকাংখার স্বপ্ন সৌধকে নিজ পায়ে পদদলিত করে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়ন করে নতুন সমাজ-রাষ্ট্র বিনির্মাণে বুকের তপ্ত শোনিতধারা মরুপ্রান্তরে প্রবাহিত করে সামনের দিকে এগিয়ে এসেছিলেন, ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা অতি বিরল।

পৃথিবীর সকল মানুষকে কায়েমী স্বার্থবাদী শক্তির শোষণ থেকে মুক্তি দিয়ে নিরাপত্তাপূর্ণ, ভীতিহীন, সমৃদ্ধশালী সমাজের সিংহদ্বার উন্মুক্ত করতে গেলে স্বাভাবিক কারণেই অগণিত সাপ রূপী বাতিল শক্তি ফনা উচু করে বিষাক্ত আঘাত হানতে আসবে। মানব রচিত আইন-কানুনে পরিচালিত সমাজে শোষনের স্তুপিকৃত সঞ্চিত জঞ্জাল রক্ষাকারী ধর্ম ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, পূজিবাদী গোষ্ঠি আর সমসাময়িক রাষ্ট্রশক্তি মুক্তি আন্দোলনের অপ্রতিরোধ্য গতির মধ্যে নিজেদের মৃত্যুর দুত দেখতে পায়। এজন্যে সকল অপশক্তি হিংস্র বন্য হায়েনার মত ইসলামী আন্দোলনের

কর্মীদের উপরে ভয়ঙ্কর দন্ত-নখর বিস্তার করে। হযরত সুমাইয়ার জীবনেও নেমে এলো বাতিল শক্তির পক্ষ থেকে নির্যাতনের ঘোর অন্ধকারের অমানিশা।

হযরত সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর স্বামী ইয়াসির ও সন্তান আম্মারকে নিয়েই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মক্কার সমাজে তাঁরা ছিলেন অর্থ বিত্তহীন দরিদ্র শ্রেণীর। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইসলামী জীবন ব্যবস্থা অনুসারে যে সমাজ-রাষ্ট্র নির্মাণ করবেন, সে কাজে প্রথম দিক থেকেই মহিলাগণ অংশ গ্রহণ করেছিল। প্রকৃত পক্ষে ইসলামী জাগরণমূলক কর্মসূচীতে নারী সমাজ ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ না করলে এ জাগরণ সফলতা লাভ করতে পারে না।

পবিত্র কোরআনের রাজ প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলনে হযরত সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা স্বামী-সন্তানসহ যোগদান করে প্রতিটি পদে নিষ্ঠুর নির্যাতনের মোকাবেলা করেছিলেন। সুমাইয়া, ইয়াসির, আম্মার, খাব্বাব, বিলালের মত সমাজের গরীব মানুষগুলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতী কার্যক্রমে যোগদান করে তাঁরা সেই সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে কোরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠিত করতে চায়? পূজিপতিদের শরীরে যেন আগুন ধরে গেল। তাঁরা জীবিত থাকতে কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত এই সমাজ ব্যবস্থাকে ভাঙ্গতে দেবে না। আর এই গরীব লোকগুলোর আস্পর্দা তো কম নয়? যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে তারা সহ্য করছে না, আর এই লোকগুলো তাঁরই হাতে হাত রেখেছে!

নির্যাতনের পাহাড় ভেঙ্গে পড়লো হযরত সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার পরিবারের ওপর। নিষ্ঠুর অত্যাচার সইতে না পেরে স্বামী ইয়াসিরের স্বাস্থ্য ক্রমশ ভেঙ্গে পড়তে লাগলো। তিনি মৃত্যুশয্যা গ্রহণ করলেন। প্রাণপ্রিয় স্বামীর মৃত্যুতেও হযরত সুমাইয়া আদর্শ থেকে বিন্দু পরিমাণ বিচ্যুত হলেন না। একমাত্র সন্তানকে সাথে করেই তিনি মহাসত্য আঁকড়ে ধরে রইলেন। তাঁকে প্রথমে নানা ধরনের হুমকি প্রদর্শন করা হলো, যেন তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের আদর্শ ত্যাগ করেন। কিন্তু তিনি ইসলামের ওপরে পাহাড়ের মতই অটল রইলেন। ফলে তাঁর ওপর নেমে এলো কঠিন শারীরিক নির্যাতন। মক্কার নরপিশাচের দল তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে মরুভুমির উত্তপ্ত বালুকা রাশির ওপরে চিৎ করে শুইয়ে দিত। তাঁর কোমল শরীরের ওপরে ভারী পাথর চাপা দিয়ে রাখা হতো। আকাশ থেকে প্রদীপ্ত সূর্য প্রচন্ড তাপ বিকিরণ করে মরুর বালুকা রাশি আগুনের মতই উত্তপ্ত করে তুলতো। সমস্ত দিন তাঁকে ঐ উত্তপ্ত বালুর ওপরে শুইয়ে রাখা হতো। সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে আসা হতো আর বলা হতো– আজ রাতের ভেতরে যদি

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের আদর্শ ত্যাগ না করো তাহলে আগামী কাল এর থেকে ভয়াবহ নির্যাতন করা হবে।

পরদিন কাফিররা এসে দেখত হযরত সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা আল্লাহর রাসূলের আদর্শে অবিচল রয়েছেন। তাদের ক্রোধের মাত্রা বৃদ্ধি পেত সেই সাথে তাঁরা নির্যাতনের মাত্রাও বৃদ্ধি করতো। নির্যাতনের নিত্য-নতুন পদ্ধতি তাঁরা আবিষ্কার করে তা হযরত সুমাইয়ার কোমল দেহের ওপর প্রয়োগ করতো। পুত্র আম্মার আপন গর্ভধারিণী মা জননীর এহেন করুণ অবস্থা দর্শনে ছুটে যেতেন মানবতার মুক্তির দুত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে। আল্লাহর নবীর হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা নেই। তিনি কিভাবে এ নির্যাতনের গতিরোধ করবেন! তিনি আম্মারকে ব্যথিত হৃদয়ে অশ্রু সজল নেত্রে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিতেন আর তার মা'কে জান্নাতের সুসংবাদ দিতেন।

একজন নারী কিভাবে যে এমন নিষ্ঠুর নির্যাতন সহ্য করেছে, সে কাহিনী পাঠ করে অবাক হতাম। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে মিশরের জয়নব আল গাজ্জালীর মত নারীও যখন ইসলামের জন্য লোমহর্ষক নির্যাতন সহ্য করেছিলেন জালিম শাসক জামাল আব্দুন নাসেরের হাতে, এ কথা জেনে অনুভব করেছিলাম, ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিটি যুগেই হযরত সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার অনুরূপ মহান নারী আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীতে প্রেরণ করবেন। নির্যাতনের মাত্রাই শুধু নয়, তাঁর প্রাণ প্রদীপ নির্বাপিত করা হবে– এই শেষ কথাটি তাঁকে জানানো হলো, তবুও তিনি আদর্শ ত্যাগ করলেন না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একদিন বনী মখযুম গোত্রের পথ অতিক্রম করছিলেন। সে সময় পথের ধারেই হযরত সুমাইয়ার ওপর দুশমন কর্তৃক নির্যাতন অনুষ্ঠিত হচ্ছিলো। লোমহর্ষক এই নির্যাতন দেখে আল্লাহর রাসূলের চোখ দুটো অশ্রুয় ভরে গেল। তাঁকে দেখে দুশমনরা হযরত সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহাকে বিদ্রুপ করে বললো– মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের আদর্শ গ্রহণ করার স্বাদ কেমন তা বুঝে দেখ।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঐ দৃশ্য সহ্য করতে পারলেন না। তাঁর চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হলো। তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন হযরত সুমাইয়ার জন্য। সন্ধ্যার সময় দুশমনরা হযরত সুমাইয়াকে ছেড়ে দিয়ে জানিয়ে দিল– আজ রাতের ভেতরে যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের আদর্শ ত্যাগ না করো তাহলে আগামী কালই হবে তোমার জীবনের শেষ দিন।

হযরত সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা নিজের ঘরে ফিরে এলেন। আল্লাহর দুশমন আবু জেহেলও কিছুক্ষণ পরেই এসে উপস্থিত হয়ে তাঁকে অশালীন ভাষায়

গালাগালি শুরু করলো। প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করলো ইসলাম ত্যাগ করার জন্য। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে গিয়েছে হযরত সুমাইয়ার সমস্ত শরীর। সারা দিন ধরে তাঁর ওপরে চলেছে অমানবিক অত্যাচার। পেটে কোন দানা পানি পড়েনি। ইসলাম ত্যাগ করতে হবে, আবু জাহিলের এই কথা শুনে ইসলামী আন্দোলনের মহিলা কর্মী হযরত সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ক্ষুব্ধ সিংহীর ন্যায় গর্জন করে বললেন– স্বামী বিদায় গ্রহণ করেছে, একমাত্র সন্তান আম্মারও যদি বিদায় গ্রহণ করে, তবুও আমি যে আদর্শ গ্রহণ করেছি, চোখের পলক পড়া পর্যন্ত সে আদর্শ ত্যাগ করার প্রশ্নই উঠে না।

মহাসত্যের আজন্ম শত্রু, অন্ধকারের অশুভ অধিবাসী আল্লাহর দুশমন আবু জেহেলের শরীরে হযরত সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার কথাগুলো যেন আগুন ধরিয়ে দিল। সে তাঁর হাতের অস্ত্র দিয়ে হযরত সুমাইয়ার শরীরে আঘাত করলো। শোষিত নিপিড়ীত ও নির্যাতিত মানবতার মুক্তির দিশারী বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মহিলা কর্মী হযরত সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার রক্তাক্ত দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর রুহ্ জান্নাতের দিকে চলে গেল।

তাঁর সুযোগ্য সন্তান হযরত আম্মার আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে করুণ কণ্ঠে মায়ের শাহাদাতের সংবাদ দিলেন। আল্লাহর নবী আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, তাঁকে মহান আল্লাহ যেন জান্নাত দান করেন। হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন মুজাহিদ মায়ের সার্থক উত্তরসূরী। হিজরতের পূর্বেই এই মর্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে হযরত সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহাই সর্বপ্রথম শাহাদাত বরণ করেন। তবে এ সম্পর্কে মত পার্থক্য বিদ্যমান। কোন বর্ণনায় রয়েছে হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার পূর্ব স্বামীর সন্তান হযরত হারেস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু প্রথম শাহাদাত বরণকারী। তবে এতে কোন দ্বিমত নেই যে, নারীদের মধ্যে হযরত সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহাই প্রথম শহীদ। বদরের যুদ্ধে আবু জেহেল নিহত হলে আল্লাহর রাসূল হযরত সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার সুযোগ্য সন্তান হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে বলেছিলেন– মহান আল্লাহ তোমার মায়ের হত্যাকারীর প্রতিশোধ গ্রহণ করার সুযোগদান করেছিলেন, সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করা হয়েছে।

এভাবে মক্কার দুর্বল মুসলমানদেরকে নানাভাবে অত্যাচারিত হতে হয়েছিল। কাউকে

চিরতরে পঙ্গু করে দেয়া হয়েছিল, কারো চোখ চিরদিনের জন্য অন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। কারো ব্যবসা ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল, কারো বসত বাড়ি ভেঙ্গে ধুলিস্মাৎ করে দেয়া হয়েছিল। বিশেষ করে যে সমস্ত মুসলমান ছিলেন দাস শ্রেণীর, তাঁদের ওপরেই নির্যাতন হয়েছিল সবচেয়ে বেশী। যারা ছিলেন দিন মজুর, তাদেরকে দিয়ে কাজ করিয়ে মজুরী প্রদান না করে বলা হতো, ইসলাম ত্যাগ করো মজুরী পেয়ে যাবে। অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দুর্বল মুসলমানগণ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কাছে অনেক সময় অভিযোগ করতেন। মহান আল্লাহ তখন পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করে মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা প্রদান করতেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হত, 'তোমরা খুবই তাড়াহুড়া করছো। তোমাদের পূর্বে যারা ঈমান এনেছিল, তাদের কাউকে তরবারীর আঘাতে হত্যা করা হয়েছে। কাউকে করাত দিয়ে দ্বি-খন্ডিত করা হয়েছে। লোহার চিরুণী দিয়ে কারো শরীরের গোস্ত উঠিয়ে ফেলা হয়েছে। কিন্তু পরিশেষে সত্যই বিজয়ী হয়েছে। নিশ্চয়ই এমন সময় খুবই কাছে, যখন তোমরা বিজয়ী হবে এবং তোমাদের মনে এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো ভয় অবশিষ্ট থাকবে না।'

একজন মা যদি আল্লাহভীরু মোত্তাকী হয়, সর্বদা তাঁর হৃদয়-মনে পরকালের চিন্তা জাগরুক থাকে তাহলে তার গর্ভের সন্তানও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আল্লাহর পথের পথিক হয়। এ দুনিয়ার জীবনকে যারা অখিরাতের বিনিময়ে বিক্রি করে দেয় তাঁরাই কেবল হযরত সুমাইয়ার অনুরূপ ঈমানের ওপরে কঠিনভাবে নিষ্ঠুর নির্যাতনের মোকাবেলায় অবিচল থাকতে পারে। আর যেসব মায়েরা নৃত্য-গীত, অশ্লীল ছায়াছবি দেখায় নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখে, মুসলিম মুজাহিদদের নামের পরিবর্তে যাদের মুখে গর্ভজাত সন্তানরা গায়ক-গায়িকা, নর্তক-নর্তকী, খেলোয়াড় এবং তথাকথিত চিত্র তারকাদের নাম শুনতে পায়, তাদের সন্তান-সন্ততি কিভাবে নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হবে? যেসব মায়েরা প্রসাধনীর যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহে ব্যস্ত, তথাকথিত বার্থ ডে, ম্যারেজ ডে পালনে সদা তৎপর, তারা তাদের সন্তানদের কখন ইসলামের শিক্ষা দেবেন? পর্দা দূরে ছূড়ে ফেলে দিয়ে যে মায়েরা রাস্তা-পথে চলাফেরা করে, যে মায়েরা সন্তান-সন্ততিকে ইসলামী সংস্কৃতি শিক্ষা না দিয়ে অসভ্যতার গড্ডালিকা প্রবাহে দেহ-মন ভাসিয়ে দিতে সাহায্য করে, সে মায়ের সন্তানরা ইসলামী আন্দোলনের বিরোধী হিসেবেই গড়ে ওঠে। গর্ভধারিণী মা-ই সন্তানের প্রথম শিক্ষক। এ জন্য নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বলতেন– আমাকে একজন সুন্দর মা দাও। আমি তোমাদেরকে একটি সুন্দর জাতি উপহার দেবো।

জীবনের তুলনায় হোক প্রিয় কোরআনের পথ

নবী পরিবারের যাবতীয় খরচের দায়িত্ব পালন করতেন হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। নবীর পবিত্রা স্ত্রীগণের ভরণ-পোষণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দেখা-শোনা করতেন তিনি। হযরত আব্দুল্লাহ হাওজানী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন– আল্লাহর রাসূলের পারিবারিক ভরণ-পোষণের অবস্থা কেমন ছিল?

জবাবে হযরত বিলাল তাঁকে জানিয়েছিলেন– নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পারিবারিক যাবতীয় কাজ-কর্মের দায়িত্ব আমার ওপরে অর্পিত ছিল। আল্লাহর নবীর ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত আমি সে দায়িত্ব পালন করেছি। কোন মেহমান এলে আমাকে আদেশ করা হতো তাঁকে আপ্যায়নের জন্য। আমি ঋণ করে হলেও সে ব্যবস্থা করতাম। পরে আবার সে ঋণ পরিশোধ করে দিতাম। (আবুদাউদ)

কোন কোন ঐতিহাসিক বলেছেন, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর বারো বছর বয়সে সর্বপ্রথম চাচা আবু তালিবের সাথে সিরিয়া গমন করেন সে সময় হযরত বিলালের জন্ম। আবার কোন কোন ঐতিহাসিক বলেছেন, আল্লাহর রাসূলের নবুয়্যাত লাভ করার ২৮ বছর পূর্বে হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তবে এ বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ ঐকমত্য পোষণ করেন যে, হযরত বিলাল আল্লাহর রাসূলের তুলনায় ১২ অথবা ১৪ বছরের ছোট ছিলেন। তাঁর পিতা রাবাহ ছিলেন হাবশী। তিনি তাঁর স্ত্রীকে সাথে করে মক্কায় এসে কুরাইশদের বনী জুমাহ বংশের দাসত্ব বরণে বাধ্য হয়েছিলেন। হযরত বিলাল যে সময় এই পৃথিবীতে চোখ মেলে ছিলেন, সে সময়ে পৃথিবী ছিল শিরকের অন্ধকারে নিমজ্জিত।

শরীরের রঙ নিকষ কালো হলেও হৃদয় ছিল তাঁর আকাশের চন্দ্রের অনুরূপ উজ্জ্বল। সত্যের সন্ধান পাওয়া মাত্র তিনি কাল বিলম্ব না করে ছুটে গেলেন সত্যের বাণী বাহক বিশ্বনবীর কাছে। ভুলে গেলেন যে তিনি একজন দাস। মনিবের আদেশ ব্যতীতই তিনি ইসলাম কবুল করলেন।

হযরত বিলালের মনিবের নাম ছিল উমাইয়া ইবনে খালফ। এই লোকটি ইসলামের বড় ধরনের শত্রু ছিল। মানব ইতিহাসের সে যুগে যতগুলো কঠোর হৃদয়ের মানুষের আগমন ঘটেছিল, উমাইয়া ছিল তাদের অন্যতম। হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর জীবনের ২৮ টি বছর এই উমাইয়া ইবনে খালফের কাছেই দাসত্ব

করে কাটিয়ে ছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁকে জন্মগতভাবেই সর্বোত্তম স্বভাব চরিত্র দান করেছিলেন। সত্য আর মিথ্যার পার্থক্য করার মত প্রকৃত জ্ঞান তাঁর ছিল। ইসলাম পূর্ব জীবনেও তাঁর চরিত্রে কোন খারাপ দিক প্রবেশ করতে পারেনি। এ কারণে সমাজের উত্তম চরিত্রের লোকগুলোর সাথে তাঁর বিশেষ একটা সম্পর্ক ছিল বলে গবেষকগণ অনুমান করেন। ঐতিহাসিকদের ধারণা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথেও হযরত বিলালের আন্তরিক সম্পর্ক ছিল।

এ কারণে তিনি আল্লাহর রাসূলকে অত্যন্ত কাছ থেকে জানার সুযোগ লাভ করেছিলেন। ফল এই হয়েছিল যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নবুয়্যাত লাভ করে মহাসত্যের দিকে মানুষকে গোপনে আহ্বান করার সাথে সাথেই হযরত বিলাল সাড়া দিয়েছিলেন। প্রথম যে ভাগ্যবান সাত ব্যক্তি রাসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন হযরত বিলাল ছিলেন তাদের একজন। এ কারণে ইসলামের ইতিহাস 'সাবিকুনাল আওয়ালিন' এর মত বিশাল মর্যাদার উপাধি তাঁকে দান করেছে। মক্কার কাফিররা আল্লাহর নবীকে তাঁর কার্যক্রম থেকে বিরত করতে অক্ষম হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, এই সমাজের দুর্বল শ্রেণী যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাঁদের ওপরে অত্যাচার করলেই তাঁরা ইসলাম ত্যাগ করবে এবং ভয়ে আর কেউ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকবে না, ফলে তিনি হতাশ হয়ে দাওয়াতী কাজ ত্যাগ করবেন। সাথী যোগাড়ে ব্যর্থ হলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আন্দোলন করবে কিভাবে?

মক্কার ইসলাম বিরোধী নেতৃবৃন্দ তাদের এই ভয়ংকর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন শুরু করলো। তারা সামাজের সর্বত্র অনুসন্ধান করে দেখলো, সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তিহীন মুসলমান কারা। এভাবে তারা অর্থ-বিত্তহীন দুর্বল মুসলমানদের খুঁজে বের করে তাঁদের ওপরে ভয়াবহ নির্যাতন শুরু করলো। হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর মনিব উমাইয়া ইবনে খালফ যখন জানতে পারলো তারই দাস বিলাল তাকে না জানিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের আদর্শ গ্রহণ করেছে, তখন সে ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞান শুন্য হয়ে পড়লো। বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে ডেকে সে কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন করলো– আমি জানতে পারলাম তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের আদর্শ গ্রহণ করেছো, তুমি কোন আল্লাহর দাসত্ব করছো?

তাওহীদের নির্ভীক সেনানী হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন– আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের আল্লাহর দাসত্ব করছি।

কোথায় কার সামনে কি ঘোষণা দিলেন হযরত বিলাল। সামান্যতম ভীতিও তাঁকে স্পর্শ করলো না। এ কথা ঘোষণা করলে কি পরিণতি ঘটবে, সেটা তাঁর অজানা ছিল না। সবার ওপরে মহান আল্লাহই একমাত্র সত্য–ঈমানের এই দৃপ্ত প্রত্যয়ে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, তাঁর রব একমাত্র মহান আল্লাহ। তিনি আল্লাহ ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন শক্তির দাসত্ব করছেন না। হযরত বিলালের নির্ভীক উচ্চারণ উমাইয়ার অপবিত্র শরীরে যেন আগুন ধরিয়ে দিল। সে তাঁর চেহারা বিকৃত করে স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে চিৎকার করে বললো– তুমি আমাদের আদর্শ ত্যাগ করতে পারো না। এখনো সময় আছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের আদর্শ ত্যাগ করে আমাদের আদর্শে ফিরে এসো। আর যদি না আসো তাহলে জেনে রেখো, ভয়ঙ্কর শাস্তি ভোগ করে মৃত্যুবরণ করতে হবে।

একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত যার হৃদয়ে আর কারো ভয়ের কোন স্থান নেই, সে কি আর উমাইয়ার মত এক কাফিরের হুমকির মুখে ইসলাম ত্যাগ করতে পারে! তাওহীদের প্রেম সুধায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত বিলাল জড়তাহীন কণ্ঠে স্পষ্ট উচ্চারণে জবাব দিলেন– আমার এই রক্ত মাংসে গড়া শরীরটার ওপরে তোমার শক্তি কার্যকর হতে পারে। কিন্তু আমার হৃদয়টা দান করেছি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে। সেখানে তোমার শক্তি কার্যকর হবে না। আমি এক আল্লাহর দাসত্ব বরণ করে নিয়েছি। তোমাদের হাতের বানানো মাটির কোন মূর্তির সামনে আমি মাথানত করতে পারি না।

সমাজের প্রভাব প্রতিপত্তিহীন, অর্থ বিত্তহীন সামান্য গোলামের দুঃসাহসী উচ্চারণে উমাইয়া প্রথমে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো। পরক্ষণেই সে ক্ষুধার্ত নেকড়ের ন্যায় গর্জন করে হযরত বিলালের কালো শরীরটার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ঘুষি চড় থাপ্পড় লাথি কোন কিছুই উমাইয়া বাকী রাখলো না। অবশেষে সে নিজেই ক্লান্ত হয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে চাবুক হাতে উঠিয়ে নিল। কঠিন চাবুকের প্রতিটি আঘাতে বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর শরীর থেকে রক্ত ঝরতে লাগলো। তাঁর কালো শরীরটা রক্তের আলপনায় লাল হয়ে উঠলো। তিনি অবিশ্রান্তভাবে মহান আল্লাহর নাম জপ করে যাচ্ছেন। আল্লাহর নাম যেন তাঁর সমস্ত যন্ত্রণা তৎক্ষণাত মুছে দিচ্ছে। উমাইয়া তাঁকে আঘাতের ওপরে আঘাত করেও যখন ইসলাম ত্যাগ করাতে ব্যর্থ হলো, তখন সে লোহা আগুনে উত্তপ্ত করে হযরত বিলালের পবিত্র শরীরে পুড়িয়ে দিতে লাগলো। চামড়া আর গোস্ত পোড়ার গন্ধে উমাইয়া নিজেই অতিষ্ঠ হয়ে পড়লো, কিন্তু বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে ইসলামী আদর্শ ত্যাগ করাতে ব্যর্থ হলো।

আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর গোটা শরীর। দেহের ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত ঝরছে। সমস্ত দেহে অসহনীয় যন্ত্রণা। ঐ অবস্থাতেই তাঁকে উমাইয়া বেঁধে রাখলো। সামান্য খাদ্য তো দূরে থাক, একবিন্দু পানি পর্যন্ত দেয়া হলো না। সারা রাত তাঁকে বেঁধে রেখে পরদিন সকালে রশি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হলো মক্কার মরু প্রান্তরে। সূর্যের প্রচন্ড তাপে তখন বালুকা রাশির ভেতর থেকে যেন অনল প্রবাহিত হচ্ছে। আগুনের ন্যায় উত্তপ্ত বালুর ওপরে হযরত বিলালের রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত দেহটা চিৎ করে শুইয়ে দেয়া হলো। তিনি যেন নড়তে না পারেন এ জন্য তাঁর বুকের ওপরে বিশাল পাথর খন্ড রেখে দেয়া হলো। গোটা শরীর আগুনের উত্তাপে পুড়ে যাচ্ছে, বুকের ওপরে পাথর চাপা, শ্বাস গ্রহণ করা যাচ্ছে না। প্রাণভরে একবার শ্বাস নেয়ার জন্য বুকের ভেতরটা খাঁচায় আবদ্ধ পাখির মতই ছটফট করছে। দেহের ক্ষতগুলো আগুনের মতই জ্বলছে। এক ফোটা পানির জন্য বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে।

আল্লাহর নবীর সাহাবী হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে জীবনের এই কঠিন মূহুর্তেও উমাইয়া প্রস্তাব দিল– এখনো ইসলামী আদর্শ ত্যাগ কর, অত্যাচার থেকে মুক্তি দেয়া হবে।

হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর জীবনের এই চরম মুহূর্তেও ব্যথায় জর্জরিত ক্ষত-বিক্ষত হাতটা উঁচু করে শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে আকাশের দিকে দেখিয়ে উচ্চারণ করলেন, 'আহাদ, আহাদ, আহাদ।'

সারা দিন তাঁর ওপরে এই লোমহর্ষক নির্যাতন করে শেষ বিকেলে উমাইয়া মক্কার উচ্ছৃংখল যুবকদের হাতে তাঁকে উঠিয়ে দিল। ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে মক্কার সন্ত্রাসী যুবকরা কণ্ঠে রশি বেঁধে কন্টকাকীর্ণ ও পাহাড়ী পথ দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেত। ফলে তাঁর দেহের গোস্ত ছিন্ন-বিছিন্ন হয়ে রাস্তায় পড়তো। এভাবে দিনের পর দিন তাঁকে অনাহারে রেখে তাঁর ওপরে বর্ণনাতীত নির্যাতন করা হয়েছে কিন্তু তাঁকে আদর্শ থেকে বিন্দুমাত্র টলানো যায়নি। সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রায় মুমূর্ষ বেলালকে তারা উমাইয়ার কাছে দিয়ে যেত। অনাহারে এবং নির্যাতনে হযরত বেলাল জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন। জ্ঞান ফিরে এলেই মুখে কষ্টের সাথে উচ্চারণ করতেন মহান আল্লাহর নাম। উমাইয়া পুনরায় ক্ষিপ্ত হয়ে হযরত বেলালের পায়ে রশি বেঁধে উটের পায়ের সাথে বেঁধে উটকে দৌড়াতে বাধ্য করতো। উট দৌড়াতে দৌড়াতে ক্লান্ত হয়ে পড়তো। তবুও হযরত বিলাল ইসলামী আন্দোলনের অকুতোভয় সৈনিক হিসেবে নির্যাতনে ক্লান্ত জিহ্বার সাহায্যে মহান আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতেন।

ঘটনাক্রমে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর চোখে হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর নির্মম অবস্থা পড়েছিল। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন নবীর এই সাহাবীকে কিভাবে নির্যাতন থেকে উদ্ধার করা যায়। স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে হযরত আবু বকর উপস্থিত হলেন উমাইয়ার কাছে। তিনি জালিম উমাইয়াকে বললেন– হে উমাইয়া! তুমি নির্দোষ এই দাসটির ওপরে এভাবে অত্যাচার করছো কেন? সে যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের আল্লাহর দাসত্ব করতে থাকে করুক না। এতে তোমার তো কোন ক্ষতি সে করছে না। তুমি যদি তাঁর ওপরে দয়া করো তাহলে আখিরাতের দিন আল্লাহ্ তোমার ওপরে দয়া করবেন।

আল্লাহর দুশমন উমাইয়া বিদ্রুপ করে হযরত আবু বকরকে বললো– আমার দাস তাকে আমার যা ইচ্ছা আমি তাই করবো। এতে কারো কিছু বলার নেই। আমি ঐ আখিরাত বিশ্বাস করি না।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু উমাইয়ার কথার জবাবে বললেন– দেখো, তুমি একজন শক্তিশালী নেতা। এটা তোমার পক্ষে শোভা পায় না যে তুমি একজন অসহায় মানুষের ওপরে নির্যাতন করবে। এটা তোমার সম্মানের বিপরীত কাজ।

এ কথা শুনে উমাইয়া ক্রোধ প্রকাশ করে বললো– হে আবু বকর! তোমার দেখছি এই দাসটার ওপরে ভীষণ মমতা! তোমার যদি এতই মায়া জাগে এর ওপরে, তাহলে একে তুমি আমার কাছ থেকে কিনে নিলেই পারো!

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এই কামনাই করছিলেন। তিনি অত্যন্ত দ্রুত বলে উঠলেন– আমি প্রস্তুত আছি। বলো এর বিনিময়ে তুমি কি চাও?

উমাইয়া জানালো– তোমার দাস ফুসতাতকে আমাকে দাও আর একে নিয়ে যাও।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তৎক্ষণাত রাজী হলেন। কাফির উমাইয়া অবাক হলো। কারণ হযরত আবু বকরের দাস ফুসতাত অত্যন্ত মানসম্পন্ন দাস ছিল। মক্কার লোকদের কাছে তাঁর সুনাম ছিল। উমাইয়া ধারণা করেছিল, আবু বকর তাঁর প্রস্তাবে রাজী হবে না। একটি দক্ষ এবং বিশ্বস্ত লোকের সাথে বিলালের মত দাস বিনিময় করতে আগ্রহী দেখে উমাইয়ার লোভ বৃদ্ধি পেলো। সে জানালো– তোমার দাস ফুসতাতকে দেবে এবং সেই সাথে চল্লিশ আওকিয়া রৌপ্য দিতে হবে।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এ প্রস্তাবেও রাজী হলেন। শুধু বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকেই নয়, হযরত আবু বকর এভাবে দাসত্বের বন্ধনে বন্দী নির্যাতিত অনেক মুসলমানকে অর্থের বিনিময়ে মুক্ত করেছিলেন। উমাইয়া আত্ম তৃপ্তির হাসি হেসে বললো– আবু বকর! তোমাকে আমি একজন বুদ্ধিমান হিসেবেই

জানতাম। তোমার স্থলে আমি হলে এই দাসটিকে সামান্য পয়সা দিয়েও কিনতাম না। তুমি আসলে বোকামী করলে।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর মুখেও পবিত্র হাসি। তিনি হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে সাথে নিয়ে উমাইয়াকে বললেন- তুমি আসলে এর মূল্য জানো না। প্রয়োজনে আমি এই মানুষটিকে কিনে নেয়ার জন্য আমার সমস্ত সম্পদ দিয়ে দিতাম। আমি যদি ইয়েমেনের বাদশাহ হতাম, সে বাদশাহীর বিনিময়েও আমি এই দাসকে গ্রহণ করতাম।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে সাথে করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে ঘটনা জানালেন। আল্লাহর নবী অত্যন্ত খুশী হয়ে বললেন- তুমি আমাকেও এই কাজে অংশীদার বানিয়ে নাও।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমি বিলালকে মুক্ত করে দিয়েছি।

হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু রাসূলের নির্দেশে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদীনায় মসজিদ নির্মাণ করে তাঁকে আযান দেয়ার জন্য নির্দেশ দেন। হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুই ছিলেন ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁকে মুক্ত করে দেয়ার পর থেকে তিনি রাসূলের খেদমতেই ছিলেন। বদরের ময়দানে তিনি সৈন্যদের জন্য আটা তৈরী করছিলেন। এমন সময় তাঁর দৃষ্টিতে পড়লো হযরত আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইসলামের দুশমন উমাইয়াকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছেন। তাকে দেখেই হযরত বিলালের মনে পড়লো, এই উমাইয়া মক্কার মুসলমানদের ওপরে কি লোমহর্ষক অত্যাচার করেছে। তাঁর ওপরে অমানবিক নির্যাতন করেছে। তিনি উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করলেন- হে আল্লাহ এবং রাসূলের আনসার বাহিনী! এই ব্যক্তি হলো উমাইয়া ইবনে খালফ। এ হলো ইসলামের শত্রুদের নেতা। কোনক্রমেই একে মুক্তি দিও না।

এ কথা শোনার সাথে সাথে কয়েকজন সাহাবা ছুটে গিয়ে উমাইয়াকে হত্যা করেছিল। মক্কা বিজয়ের পরে কা'বাঘর মূর্তি মুক্ত করে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে কা'বার ছাদে দাঁড়িয়ে আযান দেয়ার জন্য আদেশ করেছিলেন। সে যুগের বিখ্যাত কবি হযরত হাসসান ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন মদীনার অধিবাসী। তিনি

বলেছেন– আমি ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে কা'বাঘর তাওয়াফ করতে এসে দেখেছিলাম, হযরত বিলালকে মক্কার লোকজন রশি দিয়ে বেঁধে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে আর তিনি সমস্ত দেবতাদের অস্বীকার করছেন।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এমন লোকজন প্রস্তুত করেছিলেন যে, তাঁরা জীবন দান করে দেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু আদর্শ ত্যাগ করার কথা কল্পনাও করতে পারতেন না।

ইসলামী আন্দোলনের যারা একনিষ্ঠ কর্মী তাঁরা নিষ্ঠুর নির্যাতন অকাতরে সহ্য করেও ইসলামের পথে হিমালয়ের মত অবিচল থাকেন। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমি নিজ চোখে দেখেছি ১৯৮২ সনের ১১ই মার্চে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মতিহার সবুজ চত্বরে। ইসলামের দুশমন ধর্মনিরপেক্ষ ছাত্র সংগঠনের মানব রূপী পশুদল ইসলামী ছাত্রশিবিরের কর্মীদেরকে পাথরের ওপর মাথা রেখে, আরেকটি পাথর খন্ড দিয়ে মাথায় আঘাত করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে, তবুও তাঁরা ইসলামী আন্দোলন ত্যাগ করার কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেননি। সেদিন কোরআনের সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অসংখ্য কর্মীর তপ্ত রক্তে সবুজ ঘাস লাল হয়ে গিয়েছিল। অসংখ্য মুজাহিদ পংগুত্ববরণ করেছিল, চারজন নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছিল, ইসলামই একমাত্র মুক্তির সনদ। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা সহজ নয়। কয়েক ওয়াক্ত প্রাণহীন নামায আর রমজান মাসের অভুক্ত থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যাবেনা। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে জেল-জুলুমকে হাসি মুখে বরণ করে নিতে হবে। প্রয়োজনে ময়দানে অকাতরে রক্ত দিতে হবে। শহীদী আকাংখা নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। ডক্টর আল্লামা ইকবাল বলেন–

ইয়ে শাহাদাত গাহে উলফাত মে কদম রাখনা
লোগ স্যমঝতা হ্যায় আছান হ্যায় মুসলমান হোনা।

মুসলমান হওয়া যেন শাহাদাতের উত্তপ্ত ময়দানে পা রাখা, আর লোকেরা মনে করে মুসলমান হওয়া বোধহয় খুবই সহজ।

মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে জীবনের জয় গান

অর্থ বিত্ত আর শিক্ষাগত যোগ্যতাই শ্রেষ্ঠত্বের মানদন্ড নয় এবং এ ধারণা ইসলাম অনুমোদন করেনা। সমাজের দারিদ্র-মজুর শ্রেণী এবং নিরক্ষর একজন মানুষও আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের মাধ্যমে সত্য আর মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম হয়। অথচ ক্ষেত্র বিশেষে প্রমাণিত হয়েছে, উচ্চ শিক্ষিত মানুষও সত্য আর মিথ্যার

পার্থক্য নির্ণয়ে ব্যর্থ হয়ে বা অহঙ্কারের পদভারে মিথ্যা আর কুসংস্কারের বেড়াজালে বন্দী হয়ে রয়েছে। হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন মক্কার সেই শ্রেণীর একজন জান্নাতী মানুষ– যাঁর ছিল না প্রভাব প্রতিপত্তি এবং অর্থ বিত্ত। পেশায় তিনি ছিলেন কর্মকার। তিনি কোন বংশের সন্তান ছিলেন ইতিহাসে এ সম্পর্কে মতভেদ বিদ্যমান।

সীরাতে ইবনে হিশামে তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি বনী তামিম গোত্রের সন্তান ছিলেন। আরবের কোন এক গোত্র হযরত খাব্বাবের গোত্রের ওপর আক্রমণ করে সে গোত্রের সক্ষম পুরুষদের হত্যা করেছিল। তাদের সমস্ত সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে নারী এবং শিশুদের ধরে এনে দাসত্বের জীবনে বন্দী করেছিল। হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকেও কিশোর বয়সে দাস হিসাবে বিক্রি করে দেয়া হয়েছিল। তাঁর স্বাস্থ্য চেহারা ছিল আকর্ষণীয়। বনী খুযায়া গোত্রের উম্মু আনমার নামক এক মহিলা যখন তাকে ক্রয় করেছিল সে সময়ে তিনি ছিলেন প্রিয় দর্শন এক কিশোর। তাঁর পিতার নাম ছিল আরাত। উম্মু আনমার তাকে ক্রয় করে মক্কার এক কর্মকারের কাছে লৌহ শিল্পের কাজ শেখার জন্য নিয়োগ করেছিল।

অল্প দিনেই বালক খাব্বাব ইবনে আরাত লৌহ সামগ্রী নির্মাণ কৌশলে পারদর্শী হয়ে উঠলেন। তারপর তাঁর মনিব আনমার লৌহ সামগ্রী নির্মাণের জন্য তাঁকে একটি দোকান করে দিয়েছিল। হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সেই শিশুকাল থেকেই ছিলেন ভিন্ন স্বভাবের। মিথ্যাকে তিনি মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন। সে সমাজে চরিত্রহীনতার যে প্লাবন বয়ে যাচ্ছিল, তিনি তা থেকে নিজেকে হেফাজত করেছিলেন। গবেষকগণ তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেন, তাঁর গোত্রের ওপরে অকারণে আক্রমণ করে যখন তাঁর পরিবারের সক্ষম পুরুষদের হত্যা করা হয়েছিল, নারীদের ওপর অত্যাচারের খড়গ নেমে এসেছিল এসব ঘটনা তাঁকে ভীষণভাবে আলোড়িত করেছিল। অত্যাচারের বিভৎসতা তাকে চিন্তাশীল করে তুলেছিল।

তিনি ভাবতেন, সমাজের এই নির্মম অত্যাচার বন্ধ হবে কোনদিন। এই সমাজ এবং সমাজের মানুষগুলো কি কোনদিন পরিবর্তন হবে না! শক্তিশালী মানুষগুলো দুর্বলদের ওপরে যে নির্যাতন করছে, নির্যাতনের এই অমানবিক ধারার কি অবসান হবে না! এসব চিন্তা তাঁকে প্রায়ই চঞ্চল করে তুলতো। গোটা মক্কায় তিনি একজন দক্ষ ও সৎ দাস হিসাবে পরিচিত ছিলেন। একজন অসৎ প্রকৃতির মানুষ একজন সৎ প্রকৃতির মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করতে পারে না। করলেও সে বন্ধুত্ব বেশী দিন স্থায়ী হয় না। কারণ স্বভাবের বৈপীরত্যই তাদেরকে একস্থানে অবস্থান করতে দেয় না। গবেষকগণ ধারণা করেন, মক্কার সমাজে সৎ স্বভাবের যে গুটি কয়েক লোক ছিল,

তাঁদের ভেতরে পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তাঁদের সৎ প্রকৃতিই তাঁদের ভেতরে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করে দিয়েছিল।

গবেষকদের এ ধারণার পশ্চাতে যুক্তি হলো, যে সময় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নবুয়্যাত লাভ করেছিলেন, সে সময় তাঁর অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত সচ্ছল ছিল। কারণ, হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার সমস্ত সম্পদ তাঁর হাতে এসেছিল। একজন সম্পদশালী ব্যক্তি হিসেবে তাঁর সাথে দাস শ্রেণীর মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সে সমাজে বৈসাদৃশ্য ছিল। কিন্তু সৎ প্রকৃতির কারণে তাঁদের ভেতরে ধনী-গরীব, উচ্চ-নীচের কোন ব্যবধান ছিল না। ফলে দাস শ্রেণীর মধ্যে যারা সৎ স্বভাব সম্পন্ন ছিলেন তাঁদের সাথে আল্লাহর রাসূলের এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তাঁরা অত্যন্ত কাছে থেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেখার সুযোগ লাভ করেছিলেন। এ কারণে আল্লাহর নবী যখন তাঁদেরকে ইসলামী আন্দোলনের প্রতি গোপনে আহ্বান জানিয়ে ছিলেন, তখন তাঁরা কোন প্রশ্ন না করেই আল্লাহর রাসূলের দাওয়াত কবুল করে তাঁর কার্যক্রমের সহযোগী হয়েছিলেন।

কেননা, তাঁরা নবুয়্যাতের সূচনাতেই অনুভব করতে পেরেছিলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মত একজন মানুষই নবী হবার উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব। তাঁর উন্নত ও আকর্ষণীয় স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে তাঁরা পূর্ণমাত্রায় অবগত ছিলেন। হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যখন শুনলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মহাসত্যের দিকে মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছেন। তিনি কাল বিলম্ব না করে দরবারে নববীতে ছুটে গেলেন। পবিত্র কালিমা পাঠ করে মুসলমানদের সংখ্যা ছয়-এ উন্নীত করেন। কোন বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তৃতীয় মুসলমান । প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তাকে সাবিকুনাল আওয়ালিন বলা হয়।

ইসলামী আন্দোলনের শুরুতেই তিনি এই আন্দোলনে শামিল হলেন। চারদিকে ইসলাম বিরোধী শক্তি সক্রিয়। তারা পৃথিবী থেকে ইসলামকে বিদায় করে দেয়ার চেষ্টা-সাধনা করছে। ইসলামের কথা বলা মাত্রই নির্যাতনের স্টীম রোলার নেমে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে। এমনই এক উত্তপ্ত মুহূর্তে জানবাজী রেখে হযরত খাব্বাব ইসলামে দাখিল হলেন।

মক্কার ইসলাম বিরোধী নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্ত অনুসারে তাঁরা অনুসন্ধান করে জানতে পারলো খাব্বাব নামক একজন দাস ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাঁর মনিব উম্মে আনমারকে জানানো হলো তাঁর দাস খাব্বাব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লা

কর্তৃক প্রচারিত আদর্শ গ্রহণ করেছে। এ সংবাদ শুনে তার সর্বাঙ্গ যেন আগুনের মতই জ্বলে উঠলো। সে তার ভাই সিবা ইবনে আব্দুল উজ্জাকে এবং আরো কয়েকজন লোক সাথে করে হযরত খাব্বাবের কাছে এলো। হযরত খাব্বাব সে সময় তাঁর পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর মনিবের ভাই তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো- আমরা শুনেছি তুমি নাকি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের আদর্শ অনুসরণ করেছো?

হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নির্ভীক কণ্ঠে জবাব দিলেন- আমি মহান আল্লাহর দাসত্ব কবুল করেছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, আমি তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি।

আল্লাহর দুশমনরা হযরত খাব্বাবকে দ্বিতীয় কোন কথা বলার সুযোগ দিল না। তারা তাঁর ওপরে ক্ষুধার্ত নেক্ড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়লো। লৌহ সামগ্রী নির্মাণের সর াম দিয়েই তাঁকে আঘাতের পর আঘাত করা হলো। এক পর্যায়ে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। মুহূর্তে তাঁর গোটা শরীর রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল।

হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর নির্যাতনের এক পৈশাচিক অধ্যায়ের সূচনা করা হলো। তাঁকে বস্ত্রহীন করে লোহার বর্ম পরানো হতো। তারপর মরুভুমির উত্তপ্ত বালুর ওপরে শুইয়ে দিয়ে বুকের ওপরে পাথর চাপা দেয়া হতো। প্রচন্ড তৃষ্ণায় তাঁর বুকের ছাতি ফেটে যাবার উপক্রম হতো। তবুও তাঁকে এক ফোটা পানি দেয়া হতো না। জ্বলন্ত আগুনে পাথর নিক্ষেপ করে সে উত্তপ্ত পাথর বিছিয়ে তার ওপরে তাঁকে শুইয়ে দিয়ে দুশমনের দল হযরত খাব্বাবের বুকের ওপরে পা দিয়ে চেপে ধরতো। আগুনে লোহা উত্তপ্ত করে সে লোহা তাঁর মাথায় চেপে ধরা হতো। আর্তচিৎকার দিয়ে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন। এভাবে তাঁকে নির্যাতন করা হতো আর বলা হতো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের আদর্শ ত্যাগ না করলে তাঁকে প্রাণে শেষ করে দেয়া হবে। তিনি মৃত্যুকে হাসি মুখে বরণ করতে প্রস্তুত হতেন কিন্তু মহান আল্লাহর পথ ত্যাগ করতে প্রস্তুত হতেন না।

দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর শাসনামল। খলীফা হযরত খাব্বাবের পিঠ দেখে অবাক কণ্ঠে জানতে চেয়েছিলেন- ভাই খাব্বাব! তোমার পিঠ এমন কেন? তোমার দেহের পৃষ্ঠদেশ সাদা এবং কুচকানো, কয়েক স্থানে গর্ত, দেখলে মনে হয় যেন আগুনে ঝলসানো হয়েছে!

হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু খলীফাকে জানালেন- পেশায় ছিলাম আমি কর্মকার, ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে সত্যের দুশমনরা আমাকে জ্বলন্ত

কয়লার ওপরে শুইয়ে দিয়ে বুকের ওপর পাথর চাপা দিত। আমার শরীরের গোস্ত আর চর্বি গলে আগুন নিভে যেত। আমার পিঠে যে দাগ দেখছেন, তা ইসলামের দুশমনদের নির্যাতনের চিহ্ন।

হযরত খাব্বাবের ওপর নির্যাতনকারী আনমার তাঁর পাপের শাস্তি কিছুটা এই পৃথিবীতেই অনুভব করেছিল। সে যেমন লোহা আগুনে উত্তপ্ত করে তাঁর দাস হযরত খাব্বাবের মাথায় চেপে ধরতো, তারও এমন এক রোগ হয়েছিল যে, সে রোগের কারণে চিকিৎসক তাকে সিদ্ধান্ত দিয়েছিল, এ রোগের কোন চিকিৎসা নেই। তবে লোহা উত্তপ্ত করে মাথায় দাগ দিলে যন্ত্রণার কিছুটা উপশম হতে পারে। খাব্বাবের মনিব আনমারের মাথায় রোগের কারণে প্রচন্ড যন্ত্রণা হতো। এভাবে তপ্ত লোহার দাগ দেয়া হচ্ছে, অকস্মাৎ সে কাফির মৃত্যুবরণ করেছিল।

আরেক বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে আবেদন করেছিলেন– হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য আপনি মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন তিনি আমাকে এই শাস্তি থেকে মুক্তির একটা ব্যবস্থা করে দেন।

আল্লাহর রাসূল তাঁর জন্য দোয়া করেছিলেন– হে আল্লাহ! আপনি আপনার বান্দা খাব্বাবকে সাহায্য করুন!

ঐতিহাসিকগণ বলেন, আল্লাহর রাসূলের দোয়া করার পরপরই হযরত খাব্বাবের ওপরে নির্যাতনকারী তাঁর মনিব আনমারের মাথায় প্রচন্ড যন্ত্রণা শুরু হলো। কুকুরের মত শব্দ নির্গত হতো তার কণ্ঠ দিয়ে। চিকিৎসার সমস্ত ব্যবস্থা ব্যর্থ হবার পরে চিকিৎসক পরামর্শ দিয়েছিল, লোহা আগুনে গরম করে মাথায় দাগ দিতে হবে। এর বিপরীত কোন চিকিৎসায় এ রোগের উপশম হবে না। হযরত খাব্বাবের নির্যাতক মনিব আল্লাহর দুশমন আনমার হযরত খাব্বাবকেই আদেশ করলো– তুমি লোহা উত্তপ্ত করে আমার মাথায় দাগ দেবে।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা কি মহিমা! আগুনে উত্তপ্ত যে লোহা হযরত খাব্বাবের মাথায় ব্যবহৃত হতো, সে লোহা আনমারের মাথায় ব্যবহারের ব্যবস্থা করে দিলেন মহান আল্লাহ। এই রোগে আক্রান্ত হবার কিছু দিন পরেই সে হতভাগা কাফির পৃথিবী ছেড়ে বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। তার ভাই কাফির সিবাও বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। হযরত খাব্বাবের ওপরে যারা নির্যাতন করেছিল, ইতিহাস তাদের কাওকে ক্ষমা করেনি। নির্মম নিষ্ঠুর দন্ড তাদের ওপরে নেমে এসেছিল।

বর্তমানে ক্ষেত্র বিশেষে দেখা যায়, কোরআনের সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের কোন কর্মীকে পরিবারের পক্ষ থেকে আন্দোলন বা সংগঠন করার ব্যপারে বাধার সৃষ্টি করা হলো অথবা তাকে সাবধান করে বলা হলো– শিবির ছাড়তে হবে, শিবির করা যাবে না। যদি শিবির করো, তাহলে পড়ালেখার খরচসহ অন্যান্য যাবতীয় খরচ বন্ধ করে দেয়া হবে।

এ ধরনের হুমকি আসার পরে কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যায়, পারিবারিক হুমকির কারণে দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ত্যাগ করলো অথবা সাংগঠনিক কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকলো। কোরআনের সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঈমানী দায়িত্ব পালনে শিথিলতা প্রদর্শন করলো। এই অবস্থা যদি কারো মধ্যে সৃষ্টি হয় তাহলে বুঝতে হবে, ঈমানী দুর্বলতা তাকে গ্রাস করেছে। এ অবস্থা থেকে মুক্ত থাকার জন্য মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে হবে। হযরত খাব্বাবের অনুরূপ ঈমানী শক্তির দৃঢ়তা নিয়ে ময়দানে অবিচল থাকতে হবে।

পড়ালেখার খরচসহ অন্যান্য যাবতীয় খরচের অর্থ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হয়, নিষ্ঠুর নির্যাতনের মোকাবেলা করতে হয়, এমন যাবতীয় সহায়-সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়, তবুও আল্লাহর প্রতি ভরসা করে দ্বীনি সংগঠনে অটল-অবিচল থাকতে হবে। ইসলামী চরিত্রের মাধুর্যতা দিয়ে নিজ পরিবারের ভিন্ন আদর্শে বিশ্বাসী সদস্যদের ইসলামী সংগঠনে শামিল করার চেষ্টা করতে হবে। পরিবার বা সমাজ থেকে যখন ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের বিরুদ্ধে বিরোধিতার ঝড় উঠবে, তখন অতীতে যাঁরা এ অবস্থার সম্মুখিন হয়ে নির্যাতন ভোগ করেছেন– সেই মর্দে মুজাহিদদের ইতিহাস স্মরণ করে ঈমানীর শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। একথা প্রত্যেক মুহূর্তে স্মরণে রাখতে হবে যে, ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা আল কোরআনের সৈনিক। মহান আল্লাহ তাঁদেরকে সাহায্য করেন। বান্দা যখন সাহায্য লাভের উপযুক্ত বলে আল্লাহর কাছে বিবেচিত হয়, তখন মহান আল্লাহ তাঁর কুদরতী ব্যবস্থা দিয়ে বান্দাকে সাহায্য করেন।

চাইনা হতে ঘ্রাণহীন বিবর্ণ ফুলের মতো

বদর এবং ওহূদের যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের পরে ইসলামের দুশমনরা মদীনার ক্ষুদ্র ইসলামী রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে মাকড়সার জালের অনুরূপ ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করলো। তারা আজল ও যার গোত্রের সাত ব্যাক্তিকে মদীনায় প্রেরণ করে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান আল্লাহর নবীর কাছে আবেদন করলো– হে আল্লাহর

রাসূল! ইসলামী আদর্শে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে যদি আমাদের সাথে প্রেরণ করেন, তাহলে আমাদের গোত্রের লোকজনের পক্ষে ইসলাম কবুল সহজ হবে।

এই প্রতারক দলটি মদীনায় যাবার প্রাক্কালে মক্কার ইসলাম বিরোধী লোকদেরকে অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে প্রস্তুত থাকার পরামর্শ দিয়েছিল। দুশমনের দল পথের এক স্থানে সত্যের বাহকদেরকে হত্যা করার লক্ষ্যে হিংস্র হায়েনার মতোই আত্ম গোপান করে অপেক্ষা করছিল।

আল্লাহর নবী এই প্রতারক দলের আবেদন মঞ্জুর করলেন। তাদের সাথে হযরত আসেম ইবনে ছাবেত রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর নেতৃত্বে দশজন বিশিষ্ট সাহাবীকে তাওহীদের দাওয়াত দেয়ার জন্য পাঠালেন। সত্যের বাণী বাহকেরা যখন গুপ্তঘাতক বাহিনীর আওতায় এসে পৌছলো, তখন প্রায় দুইশত তরবারী অতর্কিতে মাত্র দশজন মুসলিম বীরদের ওপরে আক্রমন করে বসলো। আল্লাহর পথের সিংহ দিল মুজাহিদ হযরত আসেম সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বললেন– আমাদের সাথে প্রতারণা করা হয়েছে। তোমরা শাহাদাতের জন্য প্রস্তুত হও।

কথা শেষ করেই তিনি প্রতারকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। কিন্তু মাত্র দশজন, দুইশত সুসজ্জিত বাহিনীর বিরুদ্ধে শুধুমাত্র তরবারী দিয়ে আর কতক্ষণ টিকতে পারে! ইসলামের বীর মুজাহিদরা সিংহ বীক্রমে লড়াই করে হযরত আসেমসহ ৮ জন শাহাদাতের স্বর্গীয় মর্যাদা লাভ করলেন। হযরত খুবাইব ইবনে আদি ও যায়েদ ইবনে ওয়াসসা বন্দী হলো। এই দুই সিংহ পুরুষকে হারেছ ইবনে আমেরের গৃহে বন্দী রাখা হলো। আল্লাহর দুশমনরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো– এই দুই জনকে খাদ্য ও পানীয় থেকে বঞ্চিত রেখে নির্মমভাবে একটু একটু করে হত্যা করা হবে।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ফেরেশতার মাধ্যমে ইসলামের বন্দী মুজাহিদদের জন্য জান্নাত থেকে খাদ্য প্রেরণের ব্যবস্থা করেছিলেন। ক্রমাগত কয়েকদিন যাবৎ খাদ্য ও পানীয় থেকে বঞ্চিত রাখার পরও তাওহীদের বীর সেনানী দু'জন মৃত্যুবরণ করলো না তখন বাতিল শক্তি প্রকাশ্যে শূলী বিদ্ধ করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ঘোষণা দিল। হযরত খুবাইব জানেন, শূলী বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করা কতটা নির্মম আর লোমহর্ষক যন্ত্রণাদায়ক। কঠিন বাস্তবতা উপলব্ধি করার পরও আল্লাহর রাসূলের সাহাবী কোরআনের সৈনিকদের চেহারায় কোনো পরিবর্তন বা মৃত্যুভীতি অথবা হতাশার লেশ মাত্র নেই। তাওহীদের অতন্দ্র প্রহরী হযরত খাব্বাব শহীদী পোষাকে জান্নাতে প্রবেশের অপেক্ষায় অধির আগ্রহে প্রহর গুনছেন। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার নির্দিষ্ট দিনে শূলী মঞ্চে আল্লাহর সৈনিককে আনা হলো।

অগণিত দর্শক এই নির্মম মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার লোমহর্ষক দৃশ্য দেখার জন্য শূলী মঞ্চ বেষ্টন করে রয়েছে। কিন্তু যাঁকে একটু পরেই অসহ্য যন্ত্রণা দিয়ে এই পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় করে দেয়া হবে, ইসলামের সেই বীর মুজাহিদ তরঙ্গহীন সমুদ্রের অনুরূপ শান্ত। তাঁর দৃষ্টি থেকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রেমের আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হয়ে ইসলাম বিরোধিদের মন-মানসিকতা প্লাবিত করে দিচ্ছে। দুশমনদের একজন শেষবারের মতো তাঁকে প্রস্তাব দিল– ইসলামী আদর্শ ত্যাগ করতে যদি রাজী হও তাহলে তোমার দন্ড মওকুফ করা হবে।

জান্নাতের যাত্রী হযরত খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঘৃণাভরে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দৃপ্তকণ্ঠে বললেন– ইসলামের ন্যায় অমূল্য নেয়ামত থেকে যে জীবন বঞ্চিত, সে জীবনে কোনো মাধুর্যতা নেই। যে জীবনে আল্লাহর গোলামী নেই, সে জীবন ঘ্রাণহীন বিবর্ণ ফুলের অনুরূপ। এ ধরনের জীবনের তুলনায় আমি মৃত্যুকেই সর্বাধিক প্রিয় বলে মনে করি।

দৃষ্টির সামনে নির্মম মৃত্যুর বিভৎস রূপ দেখেরও হযরত খুবাইবের কণ্ঠ থেকে যেন অনল বর্ষিত হলো। তাঁর দৃপ্তকণ্ঠ শুনে সত্যের দুশমনরা স্তম্ভিত হয়ে পড়লো। রক্তে মাংসে গঠিত কোন মানব দেহ নির্যাতনের এই ভয়াবহ আয়োজন স্বচক্ষে দেখেও কি আদর্শের প্রতি দৃঢ়পদ থাকতে সক্ষম! ক্ষণকাল পরেই যার এই সুন্দর দেহে শত শত বর্শা আর তরবারী এসে একটু একটু করে গোস্ত খুবলে নেবে। তাঁর কণ্ঠে এখনো তাওহীদের বুলন্দ আওয়াজ! ইসলামের দুশমনরা ক্ষণিকের জন্য কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়লো। কিন্তু সত্যের দুশমনদের বিস্ময় মিথ্যার কাছে পরাজিত হলো। তারা রক্ত পিচ্ছিল পথের এই সাহসী যাত্রীর কাছে তাঁর শেষ ইচ্ছা জানতে চাইলো। ইসলামী আন্দোলনের বীর মুজাহিদ শান্ত কণ্ঠে দুই রাকাত নামায আদায়ের ইচ্ছা পোষণ করলেন। তাঁকে অনুমতি দেয়া হলো।

পশ্চাত্যে মৃত্যুদুত দন্ডায়মান। আল্লাহর গোলাম হযরত খুবাইব– সৃষ্টি জগতের প্রতিপালককে জীবনের শেষ সিজ্দা করছেন। মহান মালিকের প্রেমে তিনি এমনই বিভোর হয়ে গেলেন যে, তাঁর স্মরণে নেই– তাঁকে বাতিল শক্তি এখানে এনেছে নির্মমভাবে হত্যা করার জন্য। সহসা তাঁর স্মরণ হলো তিনি যদি নামাযে অধিকক্ষণ সময় ব্যয় করেন , তাহলে আল্লাহদ্রোহী শক্তি ধারণা করবে, মুসলমানরা মৃত্যু ভয়ে ভীত। এ জন্য নামাযের নামে খুবাইব কাল ক্ষেপণ করছে। নামায আদায় করে তিনি দৃঢ় পদবিক্ষেপে শূলী মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন। যেখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু।

আল্লাহর পথের নির্ভীক এই সৈনিককে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা হলো শূলী দণ্ডের সাথে। শহীদী চেতনায় উজ্জিবিত হযরত খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর পবিত্র শরীরে একজন কাফির ছুটে এসে তরবারীর সূচালু অগ্রভাগ দিয়ে অসংখ্য আঁচড় কেটে দিল। গোটা দেহ থেকে রক্তের ফোয়ারা ছুটলো। তিনি নিজ চোখে তাঁর নিজের শরীরের এই নির্মম অবস্থা দেখলেন। কিন্তু গোটা অবয়বে নেই কোন যন্ত্রণার চিহ্ন। পুনরায় আরেকজন এসে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে ধীরে ধীরে বর্শা ফফলকের অর্ধেক অংশ এই মুসলিম বীরের পবিত্র বুকের মধ্যে প্রবিষ্ট করে দিলো। সত্যের দুশমন বিদ্রুপ করে শহীদী মিছিলের এই বীর যাত্রীর কাছে জানতে চাইলো- খুবাইব! তোমার এই স্থানে যদি মুহাম্মাদ (সঃ)-কে বেঁধে তোমাকে মুক্ত করে দেয়া হয়, তাহলে তুমি কি খুশী হবে?

শহীদী কাফেলার নির্ভীক যাত্রী হযরত খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দীর্ঘক্ষণ অসীম ধৈর্যে বাতিল শক্তির তীর-তরবারী, বর্শা, নেজা বল্লমসহ অগণিত তীক্ষ্ম অস্ত্রের অসংখ্য আঘাত নীরবে সহ্য করছিলেন। শরীর থেকে রক্তের বন্যা তীব্র গতিতে ধূলার সাথে মিশে যাচ্ছে দেখেও কণ্ঠ থেকে প্রিয়তম আল্লাহর নাম ছাড়া উহ আহ শব্দ নির্গত হয়নি। কিন্তু ইসলামের দুশনদের কথা শুনে হযরত খুবাইব নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলেন না। অসংখ্য আঘাতে শরীরের রক্ত গড়িয়ে পড়ে প্রায় নিঃশেষ গিয়েছে, কথা বলার মত শক্তি নেই। তবুও তিনি ক্ষয়িষ্ণু শক্তির সবটুকু এক জায়গায় করে আহত সিংহের মত গর্জে উঠলেন- খবরদার! যা বলেছিস একথা আর মুখে আনবি না। আমি খুবাইব তিলে তিলে আমার প্রাণ নিঃশেষ করে দিতে পারি, তোদের অস্ত্রের নির্মম আঘাত হাসি মুখে বরণ করছি। কিন্তু আল্লাহর রসূলের পবিত্র কদম মোবারকে গোলাপের সামান্য একটি কাঁটা বিধবে, এ দৃশ্য আমার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব!"

শত সহস্র অস্ত্রের পৈশাচিক আঘাতে হযরত খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ধীরে ধীরে শাহাদাতবরণ করলেন। শাহাদাতবরণের পূর্ব মুহূর্তে তিনি বললেন- হে আল্লাহ! এমনকি কেউ নেই, যিনি তোমার প্রিয় হাবিবের কাছে আমার শেষ সালাম পৌছে দেবে!

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ফেরেশতার মাধ্যমে তাঁর নবীর কাছে হযরত খুবাইবের শেষ সালাম পৌছে দেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রিয় সাহাবী হযরত খুবাইবের সালামের জবাব দিয়ে অশ্রু সিক্ত নয়নে উপস্থিত সাহাবাদেরকে জানিয়ে দেন- খুবাইব শাহাদাতবরণ করেছে।

একের পর এক অস্ত্রের আঘাত যখন হযরত খুবাইবের দেহ থেকে রক্ত ঝরাচ্ছিল তখন তিনি এমন কবিতা আবৃত্তি করছিলেন, যে কবিতা কবিতা যুগ যুগ ধরে ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদেরকে আল্লাহর পথে হাসি মুখে প্রাণ বিলিয়ে দেয়ার উদ্দীপনা যোগাবে। তাঁর আবৃত্তি করা কবিতার অর্থ হলো– আমি বাতিল শক্তির কাছে মাথানত করবো না। কেননা আমি জানি আল্লাহ্ আমার কাছেই আছেন। আমি নিশ্চিত যে, আমি তাঁর কাছেই যাচ্ছি। আমি মৃত্যুকে ভয় করি না। কেননা মৃত্যু একদিন না একদিন পৃথিবীর এই রঙ্গমঞ্চ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নেবেই। আমি ভয় করছি ঐ সর্বগ্রাসী আগুনের, যা দোযখে অবস্থান করছে। বাতিল শক্তি আমার কাছে জানতে চায়, আমি ইসলাম ত্যাগ করবো কি-না। কিন্তু ইসলামবিহীন জীবন আমার কাছে মৃত্যু যন্ত্রণার থেকেও অধিক পীড়াদায়ক। আমার দেহ থেকে রক্ত ঝরছে তবুও আমার হৃদয় আল্লাহর প্রেমে শান্ত। আমি কোথায় কি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করছি, এটা চিন্তার বিষয় নয়। আমি আল্লাহর গোলাম হিসেবে মৃত্যুবরণ করার সুযোগ পেয়েছি, এটাই আমার সবথেকে বড় সান্ত্বনা। আল্লাহ্ আমার দেহকে ঘিরে বাতিল শক্তি যে পৈশাচিক উল্লাস করছে তা তুমি তোমার রাসূলকে জানিয়ে দাও।

হযরত সাইদ ইবনে আমের হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর খেলাফতকালে হিমস্ নগরীর গভর্ণর ছিলেন। হঠাৎ করেই তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন। খলীফা তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, তিনি কোনো রোগে আক্রান্ত কিনা। তিনি জানিয়ে ছিলেন– আমি সম্পূর্ণ সুস্থ, আমার কোন রোগ নেই। যখন হযরত খুবাইবকে নির্মম অত্যাচারে শহীদ করা হয় তখন আমি দর্শকদের মধ্যে ছিলাম। সেই নির্মম দৃশ্য আমার যখন স্মৃতির পর্দায় ভেসে ওঠে, তখন আমি জ্ঞান হারা হয়ে যাই।

হযরতে খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর শহীদী ফুল শত সহস্র বছর ধরে ইসলামী আন্দোলনের নেতা কর্মীদের মধ্যে ঘ্রাণ ছড়িয়ে তাদেরকেও আল্লাহর পথে রক্ত দিতে অনুপ্রাণিত করছে– পৃথিবী ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা যোগাতে থাকবে।

প্রভুর পায়ে করেছি আত্মদান

নাম তাঁর আব্দুল উজ্জা । দেবতার নামে নাম রাখা হয়েছে। আব্দুল উজ্জা মাত্র বিশ বছরের সুন্দর সুঠাম দেহের অধিকারী তরতাজা যুবক। বিশাল সম্পদ তাঁকে চাচা দান করেছেন। অভাবের সাথে তিনি পরিচিতি নন। চাইবা মাত্রই সবকিছু পাওয়া যায়। কিন্তু মানসিক শান্তি নেই, প্রকাশ করতে না পারা এক অস্থিরতা তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সত্যানুসন্ধিৎসু মন আব্দুল উজ্জার। মক্কায় তখন আল্লাহর রাসূল মহাসত্যের দিকে মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছেন। রাসূলের নেতৃত্বে ইসলামী আন্দোলনের সূচনা হয়েছে মাত্র।

আব্দুল উজ্জার মনের একান্ত বাসনা, এই সুন্দর পূত ও পবিত্র নৈতিক চরিত্রের অধিকারী আল্লাহভীরু লোকদের সাথে একত্রে ইসলামের দাওয়াতী কাজ করতে। কিন্তু চাচার ভয়ে ইসলাম কবুল করতে পারে না আব্দুল উজ্জা। ইতোমধ্যে আল্লাহর নবীর জন্য মক্কায় অবস্থান করা অসম্ভব হয়ে উঠলো। আল্লাহর পক্ষ থেকে মদীনায় হিজরত করার জন্য আদেশ এলো। তিনি মদীনায় হিজরত করলেন।

আব্দুল উজ্জা একদিন সমস্ত দ্বিধা, সংকোচ, ভয়-শঙ্কা মন থেকে মুছে ফেলে চাচার সম্মুখে দাঁড়ালেন। চাচা জিজ্ঞাসা করলো– কিছু বলবে?

আব্দুল উজ্জা জড়তাহীন কণ্ঠে চাচাকে বললেন– আপনি ইসলামী আদর্শ সম্পর্কে কিছু শুনেছেন? অনেকেই তা গ্রহণ করেছে। এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো গোলামী করবে না– এটাই হলো এই আদর্শের মূল কথা.........

কথা শেষ করতে পারলেন না তিনি। ইসলামের দুশমন চাচা রোষকষায়িত লোচনে আব্দুল উজ্জাকে বললো– খবরদার! একবার যে কথা উচ্চারণ করেছো, পুনরায় যদি আবার তা উচ্চারণ করো, তাহলে তুমি মারাত্মক বিপদে পড়বে।

চাচার কথা তার মনে সামান্যতম প্রভাব বিস্তার করলো না। নিজের মনের অবস্থাও গোপন রাখলেন না। তিনি আহত সিংহের ন্যায় গর্জন করে চাচার ক্রোধে পরিপূর্ণ চোখে চোখ রেখে দৃঢ়কণ্ঠে বললেন– আমি বিপদের ভয় করি না। আপনি জেনে নিন, আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ গ্রহণ করেছি। আমি এখন মুসলমান।

স্তম্ভিত চাচা অবাক বিস্ময়ে ভাতিজা আব্দুল উজ্জার ভাবলেশহীন মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তিনি ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললেন–

তুমি ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছো, এ অবস্থায় তোমার সাথে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই। আমি তোমাকে এ যাবৎ যত সম্পদ দিয়েছি সব ফেরত দাও।

আব্দুল উজ্জা দ্বিধাহীন কণ্ঠে বললেন– নিয়ে নিন আপনার সমস্ত সম্পদ, আমার কোন আপত্তি নেই।

নিষ্ঠুর চাচা আদেশ করলো–তোমার শরীরে যে পোষাক রয়েছে, সেটাও আমার দেয়া। খোলো ওটা।

আব্দুল উজ্জা কোন আপত্তি না করে সমস্ত পোষাক খুলে দিলেন। বিশ বছরের যুবক আবদুল উজ্জা দুই হাত দিয়ে লজ্জাস্থান আড়াল করে বাড়িতে চলে এলেন গর্ভধারিণী মায়ের কাছে । মা ছেলের এই অবস্থা দেখে দুই হাতে চোখ আড়াল করে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইলেন– বাবা! এ তোমার এই অবস্থা কেন?

তিনি বললেন– মা! ঈমান আনার অপরাধে চাচা আমার সব কিছু ছিনিয়ে নিয়েছে।

মা করুণ কণ্ঠে জানতে চাইলেন– আমি তোমাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?

তিনি বললেন– আমি মদীনায় আল্লাহর নবীর কাছে চলে যেতে চাই, আমাকে লজ্জা ঢাকার জন্য এক টুকরো কাপড় দিন।

মা একটি কম্বল দিলেন। আব্দুল উজ্জা কম্বলটি ছিড়ে দু টুকরো করে এক টুকরো কোমরে জড়িয়ে আর অন্য টুকরোটি দিয়ে দেহ আবৃত করে মদীনার পথে যাত্রা করলেন।

তিনি দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে মদীনায় মসজিদে নববীর সম্মুখে পৌছলেন। মদীনার মসজিদে এমন অনেক সাহাবী অবস্থান করতেন, যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করার কারণে জাগতিক যাবতীয় সম্পদ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। মসজিদের এক প্রান্তে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এসব মহান সাহাবীদেরকে 'আস্হাবে সুফ্ফা' নামে ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে। আস্হাব শব্দের অর্থ হলো অধিবাসী আর সুফ্ফা শব্দের অর্থ হলো চাঁদোয়া। অর্থাৎ যা ওপরে ছাদের মতো বিছিয়ে দিয়ে তার নিচে বাস করা হয়। আস্হাবে সুফ্ফা বলতে বুঝায়– যাঁরা চাঁদোয়ার নিচে বাস করেন। জাগতিক সম্পদ থেকে বঞ্চিত সাহাবায়ে কেরাম এভাবে অবস্থান করতেন বলে তাঁদেরকে আস্হাবে সুফ্ফা বলা হয়েছে। তাঁরা রাসূলের সান্নিধ্যে সর্বক্ষণ অবস্থান করে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতেন এবং প্রয়োজনে বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে মানুষের মধ্যে আল্লাহর দ্বীন প্রচার করতেন।

রাসূলের সম্মুখে খাদ্য এলে তিনি তা আস্হাবে সুফ্ফাদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন। অধিকাংশ দিন তাঁদেরকে অনাহারে থাকতে হতো। ক্ষুধার যন্ত্রণায় তাঁরা

কাতর হয়ে পড়তেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কোনো আক্ষেপ ছিল না। গভীর রাতে আল্লাহর রাসূল যখন তাহাজ্জুদের নামায আদায়ের জন্য মসজিদে উপস্থিত হতেন তখন ক্ষুধার্ত সাহাবীরা রাসূলের পবিত্র চেহারা মোবারক দেখেই ক্ষুধার জ্বালা ভুলে যেতেন।

সেদিন আল্লাহর নবী ঘর থেকে বের হয়ে দেখেন, মসজিদের সামনে এক সুন্দর যুবক বসে রয়েছে। সে যেন কার অপেক্ষা করছে। তাঁকে তিনি মধুর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন–তোমার নাম কি? কোথা থেকে কার কাছে এসেছো?

কথার অপূর্ব ধরন আর অপূর্ব চেহারা দেখেই আব্দুল উজ্জা অনুভব করতে পারলেন, প্রশ্নকর্তা আর কেউ নন– যাঁর আদর্শ গ্রহণ করার কারণে তাঁকে পরনের পোষাক পর্যন্ত হারাতে হয়েছে, তিনিই তাঁর সম্মুখে দন্ডায়মান। মুহূর্তে তাঁর ভেতর থেকে সবহারানোর যন্ত্রণা দূর হয়ে গেল। মন-প্রাণ জান্নাতী আবেশে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তিনি নিজের নাম জানিয়ে তাঁর ইসলাম গ্রহণ পরবর্তী অবস্থার কথা আল্লাহর রাসূলের কাছে বললেন। আল্লাহর নবী স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন– তোমার নাম আব্দুল উজ্জা নয়–আজ থেকে তোমার নাম আব্দুল্লাহ। তুমি আমার সাথে থাকবে। মসজিদে নববীতে থাকো, খাদ্যের যোগাড় হলে আহার করবে, না হলে আল্লাহর শোকর আদায় করবে।

হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর বিরুদ্ধে আল্লাহর নবীর কাছে কয়েকজন সাহাবী অভিযোগ করলেন যে, তিনি উচ্চকণ্ঠে কোরআন তিলাওয়াত করেন। ফলে অনেকের অসুবিধা হয়। অভিযোগ শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায় অসন্তুষ্টির চিহ্ন দেখা গেল। তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, খবরদার! কেউ আব্দুল্লাহর নামে কোন অভিযোগ করবে না, কারণ ইসলামের জন্য আব্দুল্লাহকে অনেক বড় মূল্য দিতে হয়েছে। পরনের সমস্ত পোষাক পর্যন্ত তাঁকে হারাতে হয়েছে।

তাবুকের যুদ্ধের সময় সাহাবায়ে কেরাম– যাঁর যা ছিল সবই যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করার লক্ষ্যে যুদ্ধ তহবিলে জমা দিলেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঘরে কিছুই রাখলেন না। হযরত আব্দুল্লাহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলেন। দুই গন্ড বেয়ে অবিরল ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। কান্নারুদ্ধ কণ্ঠে তিনি আবেদন করলেন– হে আল্লাহ রাসূল! আমার তো কিছুই নেই, আমি কিছু দিতে পারলাম না। আপনি আমার জন্য দোয়া করুন, আমি যেন আল্লাহর রাস্তায় আমার প্রাণ দিতে পারি।

তাঁর কথা শুনে আল্লাহর রাসূলের চেহারায় স্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠলো। তিনি একজনকে আদেশ করলেন, গাছের বাকল সংগ্রহ করে আনার জন্য। গাছের বাকল আনার পরে তা হযরত আব্দুল্লাহর হাতে জড়িয়ে দিয়ে আল্লাহর নবী দোয়া করলেন– রাব্বুল আলামীন! আমি আব্দুল্লাহর রক্ত ইসলামের দুশমনদের জন্য হারাম করে দিলাম!

আল্লাহর নবীর মুখে এ ধরনের কথা শুনে হযরত আব্দুল্লাহ আর্তচিৎকার দিয়ে উঠলেন। তিনি করুণ কণ্ঠে আবেদন করলেন– হে আল্লাহর রাসূল! আমার মনের কামনা আমি শাহাদাতবরণ করবো, আর আপনি আমার রক্ত কাফিরদের জন্য হারাম করে দিলেন!

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন– আব্দল্লাহ! তুমি যদি জ্বরেও ইন্তেকাল করো তবু আল্লাহ তোমাকে শহীদের মর্যাদা দান করবেন।

তাবুকের ময়দানে আল্লাহর রাসূলের কাছে সংবাদ এলো হযরত আব্দুল্লাহ প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ যুল জাবাদাইনকে কবরে অন্তিম শয়নে শায়িত করার আয়োজন চলছে। কবরের মধ্যে লাশ ধরার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক ব্যক্তি। আরেকজন জ্বলন্ত মশাল হাতে দাঁড়িয়ে আলোর ব্যবস্থা করেছেন।

আর দু'জন লাশ ধরে কবরের মধ্যে দাঁড়ানো ব্যাক্তির কাছে দিচ্ছেন। কবরের মধ্যে দাঁড়ানো ব্যাক্তি পরম মমতাভরে বলে উঠলেন– তোমাদের ভাইয়ের লাশ সম্মানের সাথে দাও।

করবের মধ্যে দাঁড়ানো ব্যক্তি আর কেউ নয়– স্বয়ং আল্লাহর নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর যে দু'জন লাশ ধরে কবরে নামালেন তাঁরা হলেন হযরত আবুবকর এবং ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম। মশাল হাতে দাঁড়িয়ে আলোর ব্যবস্থা করছিলেন যিনি– তিনি হলেন ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এই দৃশ্য দেখে চিৎকার করে কেঁদে বললেন– হে আল্লাহ! এই লাশ আব্দুল্লাহর না হয়ে যদি আমার হতো তাহলে কতই না ভালো হতো!

হযরত আব্দুল্লাহ যুল জাবাদাইনকে কবরে অন্তিম শয়নে শুইয়ে দিয়ে আল্লাহর নবী নিজ হাতে কবরের ওপরে পাথর বিছিয়ে দিয়ে দোয়া করলেন– হে আল্লাহ! আমি

আজ সন্ধ্যা পর্যন্তও আব্দুল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলাম তুমিও আব্দুল্লাহর প্রতি খুশী যাও! আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা যতক্ষণ এ ধরনের ত্যাগ স্বীকার না করবে ততক্ষণ আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হবে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টিও অর্জন করা যাবেনা। কোরআনের সৈনিকদের মন-মানসিকতা এমনভাবে গঠন করতে হবে যেখানে পার্থিব কোন বস্তুর জন্য আন্দোলন ও সংগঠনের প্রতি বিন্দুমাত্র শিথিলতা সৃষ্টি না হয়। ইসলামের জন্য সব কিছু ত্যাগ করার মানসিকতা সম্পন্ন একদল জানবাজ মুজাহিদ যখন সংগঠন সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে, তখন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সেই সংগঠনের হাতে দেশের সর্বময় ক্ষমতা উঠিয়ে দেবেন। ইসলামী আন্দোলনে শত কোটি মানুষের সমাবেশ ঘটিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব নয়। যতক্ষণ না ঐ মানুষগুলোর হৃদয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং কোরআনের আদর্শে পরিচালিত সংগঠনের প্রতি আনুগত্যশীল না হবে। হযরত আব্দুল্লাহ্ যুল জাবাদাইনের হৃদয়ে আকাংখা ছিল আল্লাহর রাস্তায় নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর হৃদয়ের আকাংখা পূর্ণ করে তাঁকে সম্মানিত করেছেন। এ জন্য কবি বলেছেন–

দিল সে জু বাত নিকালতি হ্যায় আসর রাখতি হ্যায়
পর নেহি, তাকতে পরওয়ায মাগার রাখতি হ্যায়।

হৃদয় থেকে যে বাণী নির্গত হয়, তা অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে। ডানা থাকে না, কিন্তু তা উর্ধ্বে পৌছার ক্ষমতা রাখে।

রক্ত পিচ্ছিল পথের সাহসী যাত্রী

বদরের রণক্ষেত্রে সত্য মিথ্যার জয় পরাজয় নির্ধারণ হবে। উভয় পক্ষ কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাতিল শক্তির পক্ষে উৎবা, শাইবা ও ওয়ালিদ মুসলিম বাহিনীর প্রতি দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আহবান জানালো। আল কোরআনের তিনজন জানবাজ মুজাহিদ দুশমনদের আহ্বানে এগিয়ে এলেন। এই তিন বীর মুজাহিদকে অসত্যের ধ্বজাধারিরা তাচ্ছিল্য করলো। তারা তাদের সমকক্ষ বীরের সাথে লড়তে আগ্রহী। যুদ্ধের সিপাহসালার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আপন চাচা হযরত হামযা, হযরত আলী ও হযরত উবাইদাকে আদেশ দিলেন প্রতিপক্ষকে মোকাবেলা করার লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। এই তিন মর্দে মুজাহিদ অস্ত্রে

সজ্জিত হয়ে ইসলামের দুশমনদের দর্পচূর্ণ করার লক্ষ্যে হুঙ্কার দিয়ে বাতিল শক্তির ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

হযরত আলীও তাঁর প্রতিপক্ষকে জাহান্নামে পাঠালেন। আল্লাহর পথের মুজাহিদ হযরত উবাইদা সত্যের দুশমন ওয়ালিদের সাথে মরণপন যুদ্ধ করছেন। হযরত আলী কোরআনের সৈনিক হযরত উবাইদার সহযোগিতায় এগিয়ে এলেন। উবাইদা তরবারীর আঘাতে ওয়ালিদের পৃথিবীর জীবনের ইতি ঘটালেন। বাতিল শক্তি একে একে নিজেদের যোদ্ধাদের শোচনীয় পরাজয় দেখে সম্মিলিতভাবে ইসলামী আন্দোলনের মুজাহিদদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

ইসলামের দুশমনদের কামনা, এই পৃথিবী থেকে ইসলামী আদর্শ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক। তারা মরিয়া হয়ে লড়াই করছে। পক্ষান্তরে আল্লাহর পথের মুজাহিদদের ঈমানী শক্তির মোকাবেলায় বাতিল শক্তি তৃণখন্ডের মতই ভেসে গেল। বদরের যুদ্ধে হযরত হামযা তাঁর মাথার পাগড়ীর মধ্যে উট পাখির পালক গুজে দু'হাতে তরবারী পরিচালনা করে বাতিল শক্তির মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি ঘূর্ণির বেগে যুদ্ধের ময়দানে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছুটে ফিরছিলেন। মাথার পাগড়ীতে পাখীর পালক থাকার কারণে তিনি যেদিকে যাচ্ছিলেন, সহজেই দৃষ্টি গোচর হচ্ছিলো। দুশমনদের নেতা উমাইয়া ইবনে খালফ হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফকে জিজ্ঞেস করেছিল– মাথার পাগড়ীতে উট পাখীর পালক লাগানো ঐ লোকটি কে?

তিনি জানালেন– ঐ ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের চাচা হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব।

কাফির উমাইয়া ইবনে খালফ মন্তব্য করেছিল– এই ব্যক্তির আজ আমরা সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। সে আমাদের সর্বনাশ করেছে।

বদরের যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের পর বাতিল শক্তির অস্তিত্ব মক্কায় বিলীন হওয়ার উপক্রম হলো। তারা সংকল্পবদ্ধ হয়ে শপথ গ্রহণ করলো, যে কোনো প্রকারেই হোক– মুসলমানদেরকে তারা নিশ্চিহ্ন করবেই। ইসলামের দুশমনরা শক্তি সঞ্চয় করে বিশাল বাহিনী সমভিব্যাহারে ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্র মদীনার দিকে অগ্রসর হলো। যথা সময়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিপক্ষের যুদ্ধ যাত্রার সংবাদ পেলেন। তিনিও প্রস্তুতি গ্রহণ করে মদীনার অদূরে ওহুদ পাহাড়ের পাদদেশে মুসলিম সৈন্য সমবেত করে বাতিল শক্তির গতিরোধ করলেন। রণ দামামা বেজে উঠলো। প্রথমেই প্রতিপক্ষের মধ্য থেকে সিবা নামক কাফির হযরত হামযাকে আঘাত করলো। বীর কেশরী হামযা সিংহের ন্যায় গর্জন করে

সিবার আঘাত প্রতিহত করেই প্রত্যাঘাত করলেন। তাঁর আঘাতে ইসলামের দুশমন দ্বি-খন্ডিত হয়ে লুটিয়ে পড়লো।

এই দৃশ্য দেখে মক্কার ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করলো। সূচনা হলো ভয়ঙ্কর যুদ্ধের। হযরত হামযা বীর-বীক্রমে যুদ্ধ করে আল্লাহর দুশমনদের দর্পচূর্ণ করছেন। শুধুমাত্র তাঁর একার হাতেই ত্রিশজন দুশমনের ইহলীলা সাঙ্গ হলো।

বদরের যুদ্ধে জুবায়ের ইবনে মুতালিবের চাচা হযরত হামযার আঘাতে নিহত হয়েছিল। প্রতিশোধ আকাংখায় সেছিল বন্য হয়েনার মতোই উন্মাদ। আজ ওহূদের প্রান্তরে সে তার ক্রীতদাস ওয়াহ্‌সীকে বললো– তুমি যদি আমার চাচার হত্যাকারী হামযাকে হত্যা করতে পারো তাহলে তোমাকে আমার দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দেব।

দাসত্বের জীবনে নেই কোনো স্বাধীনতা– এ জীবনের মূল্যও নেই। দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্তির প্রত্যাশা ও স্বাধীন জীবনের স্বাদ গ্রহণ করার আকাংখা ওয়াহ্‌সীকে বেপরোয়া করে তুললো। সে হযরত হামযাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ওহূদের রণ প্রান্তরে বিশাল এক পাথরের আড়ালে বর্শা হাতে সুযোগের অক্ষোয় রইলো। যুদ্ধের এক পর্যায়ে হযরত হামযা উক্ত পাথরের পাশ দিয়ে সম্মুখপানে অগ্রসর হচ্ছিলেন। হঠাৎ করে পাথরের আড়াল থেকে গুপ্তঘাতক ওয়াহসী বেরিয়ে এসে বীর কেশরী হামযাকে আঘাত করলো। তিনি শাহাদাতবরণ করলেন। বর্শার সুতীক্ষ্ম ফলা তাঁর নাভির নীচ দিয়ে বিদ্ধ হয়ে পৃষ্ঠদেশ পার হয়ে যায়। হযরত হামযাকে শহীদ করার পরে ওয়াহ্‌সীকে এক অজানা আতঙ্ক পেয়ে বসলো। যুদ্ধ করার আগ্রহ হারিয়ে ফেললো সে। সেদিন আর তার পক্ষে যুদ্ধের ময়দানে অবস্থান করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে তিনি ইসলাম কবুল করেন এবং তাঁর হাতেই নবুয়্যাতের দাবিদার মিথ্যাবাদী মুসাইলামা নিহত হয়।

শহীদী মিছিলের যাত্রী বীর কেশরী হযরত হামযা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু– তাঁর লাশ নিয়ে মক্কার বাতিল শক্তির প্রতিভূরা সেদিন ওহূদের রণপ্রান্তরে বন্য হায়েনার মতো পৈশাচিক উল্লাসে মেতে উঠেছিল। তারা আল্লাহর রাসূলের চাচার মৃতদেহ বিকৃত করেছিল– নাক-কানসহ দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গ কেটে কর্তিত অঙ্গ দিয়ে মালা বনিয়ে গলায় পরে নগ্ন আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠেছিল আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা ও অন্যান্যরা। হযরত হামযার বুক চিরে কলিজা বের করে হিন্দা ভক্ষণ করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁর অনুগত গোলাম হযরত হামজার দেহের কোনো অংশ হিন্দার কণ্ঠ নালীতে প্রবেশ করতে দেননি। ভক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়ে সে আল্লাহর পথের মুজাহিদের কলিজা চিবিয়ে হিংস্র আক্রোশ চরিতার্থ করেছিল।

যুদ্ধ শেষে শহীদদের কাফন-দাফন চলছে। হযরত হামযাকে শাহাদাতের ময়দানে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গহীন ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম প্রিয়জনের এই করুণ অবস্থা দেখে অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। আল্লাহর রাসূল বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন– তোমার ওপর আল্লাহর রহম করুন। তুমি হবে আখিরাতের ময়দানে শহীদদের নেতা। আমার মন চায়, তোমাকে এভাবেই ফেলে রাখি, যেন পশু-পাখী তোমার লাশ আহার করে এবং কিয়ামতের ময়দানে তোমাকে পশু-পাখীর পেট থেকে জীবন্ত বের করা হতো। কিন্তু তোমার বোন শোকে অধির হয়ে পড়বে। তুমি ছিলে সৎকাজে অগ্রগামী। আত্মীয়দের প্রতি অধিক সহানুভূতিশীল।

আপন ভাইয়ের শাহাদাতের সংবাদ শুনে হযরত সাফিয়া ছুটে এলেন। আল্লাহর নবী হযরত সাফিয়ার সন্তান হযরত যুবায়েরকে বললেন– তোমার মা তাঁর ভাইয়ের লাশের এই করুণ অবস্থা দেখে সহ্য করতে পারবে না, তাঁকে লাশের কাছে আসতে নিষেধ করো।

হযরত যুবায়ের তাঁর মা'কে এ কথা বললে তিনি বলেন– আমার ভাই আল্লাহর পথে তাঁর প্রাণ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিলিয়ে দিয়েছে। এর থেকে সৌভাগ্যের আর কি হতে পারে! আমি ইন্শাআল্লাহ, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্য ধরবো।

হযরত যুবায়ের তাঁর মায়ের বলা কথাগুলো আল্লাহর রাসূলকে জানালে তিনি তাঁকে হযরত হামযার লাশ দেখার অনুমতি দেন।

হযরত হামযার শাহাদাতবরণ করেছেন, এ সংবাদ জেনে তাঁর বোন হযরত সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা কাফনের জন্য দুটো কাপড় এনেছিলেন। শাহাদাতের ময়দানে দেখা গেল হযরত হামযার পাশে হযরত ছুহায়ের আনসারীর লাশও পড়ে রয়েছে। তাঁর মৃতদেহও বিকৃত করা হয়েছে। হযরত সাফিয়া কাফনের জন্য যে কাপড় এনেছিলেন, তা দিয়ে শহীদদের কাফন দেয়া হলো। হযরত হামযাকে কাফনের কাপড় এতই ছোট ছিল, তাঁর পা ঢাকলে মাথা খোলা থাকে। আর মাথা ঢাকলে পা খোলা থাকে। আল্লাহর রাসূলের আদেশে সাহাবায়ে কেরাম হযরত হামযার মাথা কাপড় দিয়ে আর পা ইজখির নামক ঘাস দিয়ে ঢেকে দেন। বিশ্বনেতা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপন চাচা শহীদদের নেতা হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর কাফনের ছিল এই করুণ অবস্থা।

আল্লাহর যমীনে আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েম করার জন্য ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসের প্রতিটি বাঁকে ইসলামের মুজাহিদদের এভাবেই প্রাণসহ

দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিলিয়ে দিতে হয়েছে। দ্বীনের মুজাহিদদের রক্তের তীব্র গতির মুখে বাতিল শক্তির তখ্‌তে তাউস তৃণ খন্ডের মত ভেসে গিয়েছে। বাতিল শক্তি দ্বীনি আন্দোলনের কর্মীদের রক্ত ঝরিয়েও তাদের শেষ অস্তিত্ব রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। ইরানে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের রক্তের বন্যায় বিশ্ব সন্ত্রাসী আমেরিকার তল্পী বাহক ইসলামের দুশমন স্বৈরাচারী রেজাশাহ্‌ পাহলভীর সিংহাসন ভেসে গিয়েছে।

১৯৭৮ সনের ৮ই সেপ্টেম্বর। শুক্রবারে জুম্মার নামায আদায়ের পর প্রায় বিশ লক্ষ মর্দে মুজাহিদ তেহরানের রাজপথে কোরআনের রাজ কায়েমের দাবিতে বিশাল মিছিল বের করে। বাতিল শক্তি সেই মিছিলের ওপরে গুলী বর্ষণ করে ষাট হাজার মুজাহিদকে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এ দুনিয়া থেকে চিরতরে বিদায় করে দিয়েছিল। অসংখ্য মুজাহিদ আহত হয়ে পঙ্গুতের বেদনাময় জীবন বয়ে বেড়াতে বাধ্য হয়েছে। তবুও বাতিল শক্তি শেষ রক্ষা করতে পারেনি। অবশেষে ইসলামের দুশমনকে ইরান ছেড়ে পালাতে বাধ্য হতে হয়েছে। ইরানের ইসলামী বিপ্লবের সাথে আমাদের মত পার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু ইরানী মুজাহিদরা যেভাবে বাতিল শক্তির নিষ্ঠুর নির্মম অত্যাচারের স্টীম রোলার হাসি মুখে বরণ করে তাদের চিন্তাধারার ইসলামী বিপ্লব ঘটিয়েছেন, সে অত্যাচারের নির্মম ইতিহাস শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের আল্লাহর পথে প্রাণ দিতে অনুপ্রেরণা যোগাবে। ১৯৭৮ সনের ৮ই সেপ্টেম্বর দিনটি এখনও ইরানীরা কালো দিবস বা ব্লাক ফ্রাইডে হিসেবে বেদনা বিধুর পরিবেশে পালন করে।

ওহূদের রণপ্রান্তরে রাসূলের চাচা হযরত হামযা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর মৃতদেহ নিয়ে ইসলাম বিরোধী শক্তি যে পৈশাচিক উল্লাসে মেতে উঠেছিল, ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে সে ঘটনার পুনরাবৃত্তি একাধিকবার ঘটেছে। দ্বীনি আন্দোলনের সংগ্রাম মুখর ইতিহাসে এ ধরনের পৈশাচিক মর্মান্তিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি বার বার ঘটিয়েছে আল্লাহদ্রোহী ও ধর্মনিরপেক্ষ বাতিল শক্তি। বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে এ ধরনের লোমহর্ষক ঘটনা কয়েকবার ঘটেছে । কোরআনের সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অবিসংবাদিত আপোষহীন নেতা অধ্যাপক গোলাম আযমকে ১৯৯২ সনের ২৪ শে মার্চের কালো রাতে গ্রেফতার করা হয়। তখন ছিল আরবী রমজান মাস, মুসলমানদের আত্মশুদ্ধি ও নিজেকে মহান আল্লাহর গোলাম হিসেবে গড়ার এক রহমত, বরকত ও নাজাতের মাস।

তাঁকে গ্রেফতারের পরের ঘটনা প্রবাহ যেমন মর্মান্তিক তেমনি পৈশাচিকতার ঘৃণ্য হিংস্রতায় পরিপূর্ণ। বয়োবৃদ্ধ নেতা অধ্যাপক গোলাম আযমের মুক্তির দাবিতে দেশের রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেটে ইসলামী আন্দোলনের পক্ষ থেকে বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। রাজধানী ঢাকা ও তার আশে পাশের জনতা বাঁধ ভাঙা স্রোতের মতই বায়তুল মোকাররমের দিকে এগিয়ে আসছে। আগত জনতার চোখে মুখে জিহাদের আগুন জ্বলছে। তাঁরা মুসলমানদের চির পরিচিত শ্লোগান মুমিনের প্রাণের ধ্বনি 'আল্লাহু আকবর' শ্লোগানে রাজধানী ঢাকার রাজপথ প্রকম্পিত করে তুলছে। বজ্রমুষ্টি উত্তোলন করে গগন বিদারী শ্লোগানে ফেটে পড়ছে জনতা। তাঁরা তাদের প্রাণপ্রিয় নেতা অধ্যাপক গোলাম আযমের নিঃশর্ত মুক্তি চায়। আর এক মুহূর্তও প্রিয় নেতাকে তাঁরা কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে দেখতে চায়না। ইসলামের গণজোয়ার দেখে বাতিল শক্তির ক্রীড়নক, এদেশের মুসলমানদের চির দুশমন ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীদের কলিজায় হিংসার অনল জ্বলে ওঠে। তাদের ভিত্তি ধ্বসে পড়ার উপক্রম দেখে তারা এ যুগের হিন্দাদের হিংস্র প্রলয় নাচন দেখার জন্য বাংলাদেশের হামযাদের হত্যা করার পৈশাচিক উল্লাসে মেতে ওঠে।

ইসলামের দুশমন ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠীর লেলিয়ে দেয়া গুপ্তঘাতক হযরত হামযার হত্যাকারীর মতই আত্মগোপন করে কোরআনের সৈনিকদের হত্যা করার সুযোগ খুঁজতে থাকে। আল্লাহর পথের কর্মীরা যখন বাড়ী ফেরার জন্য বায়তুল মোকাররমের পূর্ব দিকের রাস্তায় দন্ডায়মান– ঠিক সেই মুহূর্তে ঘাতকের স্বয়ং ক্রিয় অস্ত্র থেকে শিশার তপ্ত গুলী একের পর এক দ্বীনের মুজাহিদদের দিকে ছুটে আসে। মুমিনের প্রাণের স্পন্দন ইসলামী ছাত্র শিবিরের কিশোর কর্মী সাইজুদ্দিন ও আতিক– চেহারায় নূরের সুষমা, গুলী বিদ্ধ হয়ে পিচঢালা পথে লুটিয়ে পড়েন। রক্তের বন্যায় পিচঢালা কালো পথ মুহূর্তে লাল হয়ে উঠলো। ধর্মনিরপেক্ষ হিংস্র নরপশুরা শহীদের লাশ নিয়ে বন্য হায়েনার মত নগ্ন উল্লাসে মেতে উঠলো। বিংশ শতাব্দীর আধুনিক সভ্যতার বিজ্ঞানের হিরন্ময় কিরণে উদ্ভাসিত পৃথিবীর মানুষ এ ধরনের মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল। জড়বাদ আর বস্তুবাদী জীবন দর্শনের ওপরে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষকে পশুত্বের কোন স্তরে নামিয়ে দিতে পারে তা ভাবতেও শরীরের লোম শিউরে উঠে।

ইসলামী আন্দোলনের কিশোর কর্মী সাইজুদ্দীন ও তরুণ কর্মী আতিককে শহীদ করে ইয়াহুদী-খৃষ্ট ও ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদের এ দেশীয় পোষ্য পুত্ররা শহীদদের লাশের ওপরে উঠে নৃত্য করতে থাকে। তাঁদের লাশ বিকৃত করা হয়। শহীদদের লাশ নিয়ে

তারা যে ঘৃণ্য তাণ্ডবলীলা চালিয়েছিল তা মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও হার মানায়। প্রত্যেক যুগে এভাবেই ওহুদ প্রান্তরের মর্মান্তিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছে ইসলাম বিরোধী নাস্তিক, মুরতাদ ও ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠী।

মোদের সম্পর্কের মাপকাঠি আল কোরআন

বদরের যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর সমস্ত সাহাবাদের একত্রিত করে পরিস্থিতি ব্যখ্যা করলেন। নেতৃস্থানীয় সাহাবাগণ প্রাণ স্পর্শী ভাষণ দিলেন। ফলে সাহাবাগণ আল্লাহর রাস্তায় প্রাণ উৎসর্গ করার জন্য মুহূর্তে প্রস্তুত হয়ে গেল। বিশ্বনবী মদীনার আনসারদের দিকে এমন এক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, সে দৃষ্টির উদ্দেশ্য তাঁরা তৎক্ষণাত উপলব্ধি করেছিলেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইতোপূর্বে আনসারদের কোন অভিযানে প্রেরণ করেননি। কারণ তাঁরা নবীর কাছে এই শর্তে বাইয়াত করেছিল যে, শত্রুপক্ষ মদীনা আক্রমন করলে তাঁরা প্রতিরোধ করবে, তখন তাঁরা যুদ্ধ করবে। আল্লাহর রাসূল তাঁদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ মাত্র মদীনার আনসাররা শাহাদাতবরণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

মদীনার খাজরাজ গোত্রের নেতা হযরত সায়াদ ইবনে উবাদা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু উঠে দাঁড়িয়ে আল্লাহর নবীকে বললেন– হে আল্লাহর রাসূল! আপনার ইশারাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। ঐ আল্লাহর শপথ! যার হাতে আমাদের প্রাণ, আপনি ইশারা করলেই আমরা বিশাল সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হয়ত স্পষ্ট নির্দেশদান করতে বিব্রত বোধ করছিলেন। কারণ, বদরের রণপ্রান্তরে হক ও বাতিলের–দু'পক্ষেরই সৈন্য বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি দন্ডায়মান হবে। উভয় বহিনীর সৈন্যই পরস্পরের পরিচিত। শুধু পরিচিতই নয়–তারা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। রক্তের বন্ধনে একে অপরে জড়িত। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হবে আজ পিতার সাথে পুত্রের। চাচার সাথে ভাতিজার। ছোট ভাইয়ের সাথে বড় ভাইয়ের। সবার হাতেই রক্ত পিপাসু শানিত তরবারী থাকবে। পিতা মহাসত্য ইসলামের পক্ষে আর পুত্র বাতিল শক্তি মিথ্যার পক্ষে। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে মরণপণ সংঘাত হবে। একজন অপরজনকে এই পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় করে দেয়ার লক্ষ্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েই বদরের রণপ্রান্তরে পরস্পরের মুখোমুখী দন্ডায়মান হবে।

কিন্তু কেন–কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য পবিত্র রমজান মাসে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে এই প্রাণক্ষয়ী-রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হবে! এই যুদ্ধের কারণ হলো, মানুষের বানানো মতবাদ মতাদর্শ ও আইন-কানুনের ধারক-বাহকেরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে কোরআনের রাজ প্রতিষ্ঠাকামীদের এ পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার লক্ষ্যে। ইসলামী জাগরণের আল্লাহ্ কর্তৃক নির্বাচিত নেতা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর অনুসারীদের চিরদিনের তরে স্তব্দ করে দেয়ার জন্য বাতিল শক্তি মরণ কামড় দেবার উদ্দেশ্যে মারণাস্ত্র হাতে বদরের প্রান্তরে জমায়েত হবে।

একদিকে প্রতিপক্ষের তুলনায় মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। তেমন কোন অস্ত্রও নেই। অপরদিকে সন্তানের বিরুদ্ধে পিতাকে, পিতার বিরুদ্ধে সন্তানকে, ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাইকে যুদ্ধের কলা-কৌশল শিক্ষা দিতে সিপাহ্সালার বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইতস্ততঃ বোধ করছিলেন। কিভাবে তিনি সন্তানকে আদেশ করবেন নিজের জন্মদাতা পিতার বুকে অস্ত্রের নির্মম আঘাত করতে! কি করে তিনি পিতাকে আদেশ দিবেন তারই কলিজার টুকরা সন্তানের ওপরে নিষ্ঠুর হাতে তরবারীর আঘাত করতে!

মদীনার আনসার যুবক সাহাবী হযরত মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বললেন– হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো সত্যের পক্ষে যুদ্ধ করছেন, কোথায় কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে, প্রতিপক্ষের সৈন্য সংখ্যা কত সেটা বিবেচনার কোন বিষয় নয়। বরং আপনি আমাদেরকে আদেশ করুন আমাদেরকে কি করতে হবে। আল্লাহ্ আমাদেরকে যেদিকে নিয়ে যেতে আদেশ করেন আপনি আমাদেরকে সেদিকে নিয়ে চলুন। আমরা হযরত মুছা আলাইহিস্ সালামের উম্মতের মত বলবো না যে–হে মূসা! তুমি আর তোমার আল্লাহই যুদ্ধ করো, আমরা নিরাপদে বসে থাকি। বরং আমরা আমাদের শরীরে শেষ রক্ত বিন্দু থাকা পর্যন্ত আপনার আদেশ পালন করবো। আপনি আমাদেরকে যে দিকে নিয়ে যেতে চান আমরা আপনার আদেশে সেদিকেই যাবো। আল্লাহ্ আপনাকে যা করতে আদেশ করেছেন আপনি তাই করুন এবং আমাদেরকে পরিচালিত করুন। আমরা আমাদের চোখের শেষ পলক পড়া পর্যন্ত আপনার আনুগত্য করবো।

হযরত মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর এই ঘটনাটি বোখারী শরীফের কিতাবুল মাগাযীতে এসেছে, হযরত ইবনে মাসুদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন–আমি মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর এমন একটি ঘটনা দেখেছি যা আমি করে থাকলে যে কোন সমপর্যায়ের জিনিষ থেকে তা আমার কাছে অধিকতর প্রিয় মনে করতাম।

যুবক সাহাবী হযরত মিকদাদের মুখে এ ধরণের উৎসাহ ব্যঞ্জক কথা শুনে আল্লাহর রাসূল খুবই খুশী হলেন। ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায়, ইসলামী আন্দোলনে যুবকদের অবদানই সবচেয়ে বেশী। যুবকদের রক্তই হলো ইসলামের ভিত্তি। যুবকরাই অকাতরে রক্ত দিয়ে ইসলামকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

সিদ্দীকে আকবার হযরতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর সন্তান আব্দুর রহমান তখনো ইসলাম কবুল করেননি। একদিন কথা প্রসঙ্গে তিনি পিতাকে বললেন– আব্বা, যুদ্ধের ময়দানে আপনাকে অনেক বার আমার তরবারীর নাগালের মধ্যে পেয়েছিলাম, কিন্তু আব্বা বলে কিছু বলিনি।

হযরত আবু বকর বললেন– তুমি আমাকে নাগালে পেয়ে ছেড়ে দিয়েছো আর আমি তোমাকে একবার পেলেও ছাড়তাম না।

ইসলামী আদর্শের কাছে পিতা পুত্রের সম্পর্ক জিহাদের ময়দানে গুরুত্বের দাবি রাখে না। সেখানে বিবেচনার বিষয় একমাত্র আদর্শ। বর্তমানে দেখা যায় ভোট যুদ্ধে নিজের পিতা বা কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় যদি ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্বাচনে প্রার্থী হয়, তাহলে মুসলমানরা ইসলামী আদর্শের কথা ভুলে যায়। তখন রক্তের সম্পর্ক বড় হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহভীরু মুত্তাকী প্রার্থীকে ভোট না দিয়ে ভোট দেয় নিজের আত্মীয় বা কোন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে। যিনি ক্ষমতায় গিয়ে ইসলামকে উৎখাত করবেন, তাকেই ভোট দিয়ে ক্ষমতায় পাঠায়। সুতরাং আপনজন যদি ইসলামী আদর্শের বিপরীত কোনো আদর্শের অনুসরী হয়, তাহলে তাকে সমর্থন করা যাবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوْٓا اٰبَاءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَاءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ-وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ-

হে ঈমানদার লোকেরা! নিজেদের পিতা ও ভাইকেও আপন বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে অধিক ভালোবাসে। তোমাদের যে লোকই এ ধরনের লোকদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সে-ই জালিম হবে। (সূরা তওবা-২৩)

ইসলামী সংগঠনের প্রতি গভীর আনুগত্য এবং সাহাবীদের মত নেতার প্রতি আনুগত্যের চরম পরাকাষ্ঠা দেখাতে না পারলে ইসলামী আন্দোলনকে তার মানজিলে মকসুদে নিয়ে যাওয়া যাবে না।

রক্তাক্ত উপত্যকার পঙ্গু মুজাহিদ

ইসলামী আন্দোলনের মুজাহিদদের জীবনের চূড়ান্ত সাফল্যই শাহাদাত। শাহাদাত! আল্লাহর রাস্তায় প্রাণ বিলিয়ে দেয়ায় যে কি তৃপ্তি! কি স্বাদ! তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। শুধু হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা যায়। শাহাদাতের যে কি অপূর্ব মাধুরী তা একমাত্র শহীদ ব্যতীত আর কেউ অনুধাবন করতে পারে না। এ জন্য দ্বীনি আন্দোলনে আত্মনিবেদিত লোকদের হৃদয় সর্বদা শাহাদাতের উদগ্র কামনায় থাকে ব্যাকুল। চিত্ত থাকে চঞ্চল। আত্মা অস্থির হয়ে পড়ে শাহাদাতের অমিয় সঞ্জীবনী সুধা পানের নেশায়। মন ছুটে চলে যায় ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরের এক প্রভাময় জগতে। জান্নাতের সুষমা মন্ডিত স্নিগ্ধ বারিধারায় আবগাহন করতে থাকে তার দেহ-মন।

তাই ওহূদের প্রান্তরে হক-বাতিলের মধ্যে রণদামামা বেজে উঠার সাথে সাথে মদীনার ইসলামী সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়লো শাহাদাতের স্বর্গীয় আবেশ। মদীনার আবাল বৃদ্ধ বনিতা আল্লাহর রাস্তায় তাঁদের দেহের তপ্ত রক্ত ঢেলে দেয়ার জন্য পাগলপারা হয়ে উঠলো। জিহাদের ডাক শুনে মদীনা নগরী নবসাজে সজ্জিত। নববধূ যেন সুসজ্জিতাবস্থায় দেহে সুগন্ধির প্রলেপ দিয়ে বাসর ঘরে প্রবেশের অপেক্ষায়। মুসলমানদের ললাটে রাসূল প্রেমের দ্যুতি পূর্ণিমার পূর্ণ শশীর মতই জ্বল জ্বল করছে। সকলে মসজিদে নববীর চত্বরে দন্ডায়মান। কিশোর সাহাবীরাও যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণের আশায় অনুমতির অপেক্ষায় অতি আগ্রহে রাসূলের দিকে তাকিয়ে আছেন। অপূর্ব উদ্যম, অদম্য স্পৃহা তাদের ওষ্ঠাধারে।

দুই কিশোর। আপন সহোদর। অশ্রু সজল নয়নে প্রিয় নবী (সঃ) এর পবিত্র মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। বয়স অল্প হবার কারণে রাসূল তাঁদেরকে যুদ্ধে যাবার অনুমতি দেননি। মায়াজ এবং মুওয়াউয়াজ নামের দু'ভাই আল্লাহর রাসূলের কাছে বার বার অনুমতি কামনা করছেন। আল্লাহর রাসূল বললেন– দু'ভাই কুস্তি প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হও, যে বিজয়ী হবে তাকে যুদ্ধে যাবার অনুমতি দেয়া হবে।

মুওয়াউজ মায়াজের তুলনায় বয়সে ছোট। সে মায়াজের কানে কানে বললো– ভাই তোমার শরীরে শক্তি বেশী, আমি তোমার সাথে কুস্তিতে পারবো না। আমি যখন তোমাকে ধরবো তখন তুমি নিজে ইচ্ছে করেই পড়ে যেও, নইলে আমি যুদ্ধে যাবার সুযোগ পাবো না।

আল্লাহর নবী তাঁদের অদম্য আগ্রহ আর মনোভাব অনুভব করে দু'জনকেই ওহূদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দিয়েছিলেন। হযরত আমর ইবনে জমুহ্ রাদিয়াল্লাহু

তা'য়ালা আনহু মসজিদে নববীর অদূরে বাস করেন। তিনি পঙ্গু। খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটতেন। চলা-ফেরায় বড়ই কষ্ট। ওহূদ যুদ্ধের সংবাদ শুনে তাঁর চার ছেলে পিতা-মাতার নিকট এলো। তাঁরা যুদ্ধের অনুমতি নিয়ে মসজিদে নববীর পথে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। পিতা দেখলেন এবং অনুভব করলেন– সন্তানদের চোখে মুখে শাহাদাতের ক্ষুধা। রণবেশে সন্তানদের স্বর্গীয় দূতের মতই দেখাচ্ছিল। পিতা প্রাণভরে এই দৃশ্য দেখলেন। নিজের অজান্তেই তাঁর মনে দোলা লাগলো। মনটা চঞ্চল হয়ে উঠলো। ছেলেরা আমার পূর্বেই শাহাদাতবরণ করে জান্নাতে যাবে! না, তা হয় না! আমাকেও জান্নাতে যেতে হবে।

আমর দেখলেন, একটি কিশোর তরবারী নিয়ে তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে। কিশোর তাঁর কাছে এসে দোয়া নিয়ে মদীনার মসজিদে নববীর দিকে ছুটে গেলো। আমর আরো অধির হয়ে উঠলেন। তিনি তরবারী নিয়ে মসজিদে নববীর সামনে মুজাহিদদের সাথে যোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়ার পূর্বে দোয়া করলেন– রাব্বুল আলমীন! তুমি আমাকে আর বাড়িতে ফিরিয়ে এনো না।

ওহূদের প্রান্তরে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। পঙ্গু সাহাবী হযরত আমর ইবনে জমুহ্ সম্পর্কে হযরত তালহা বলেন– আমি দেখলাম হযরত আমর তরবারী হাতে সিংহ বিক্রমে আল্লাহু আকবার গর্জনে শত্রুর বূহ্য ভেদ করে তরবারী পরিচালনা করছেন আর সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। পিছনে তাঁর ছোট ছেলেও এগিয়ে যাচ্ছে। ইসলামের শত্রুদের নিধন করতে করতে তাঁরা উভয়েই শহীদ হলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ওহূদের আহত হন। কাফিররা রটিয়ে দিল, মুহাম্মাদ (সঃ) নিহত। মদীনার মানুষর পাগলের মতো ওহূদের দিকে ছুটলো। আল্লাহর রাসূল নেই। এ কথা কল্পনাও করা যায় না!

হযরত আমরের স্ত্রী পাগলিনীর ন্যায় যুদ্ধের ময়দানের দিকে ছুটে যাচ্ছেন। এক ব্যক্তি জানতে চাইলো তিনি কোথায় যাচ্ছেন। তিনি জানালেন– ওহূদের ময়দানে। প্রশ্নকর্তা বললো– তোমার স্বামী ও চার পুত্র যুদ্ধে এসেছিল তাঁরা সকলেই শাহাদাতবরণ করেছেন।

হযরত আমরের স্ত্রী বলেন– কে শহীদ হয়েছে জানতে চাইনা। বলো, আল্লাহর নবী কেমন আছেন?

তিনি ওহূদের ময়দানে উপস্থিত হয়ে সাহাবা কর্তৃক পরিবেষ্টিত আহত অবস্থায় আল্লাহর নবীকে দেখলেন। তাঁর চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী এবং চার সন্তান সকলেই

আজকের যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেছে। আমার মনে কোনো কষ্ট নেই, আপনি জীবিত আছেন এটাই আমার জীবনে বড় সান্ত্বনা।

মদীনার আকাশ-বাতাস শহীদদের বিচ্ছেদ বেদনায় ভারাক্রান্ত। পক্ষান্তরে আত্মীয়-স্বজন হারিয়ে শহীদদের পরিবারে কান্নার রোল সৃষ্টি হয়নি। সবাই গর্বিত। আখিরাতের ময়দানে তাঁরা পরিচয় দিতে পারবে শহীদের আত্মীয় হিসেবে। এই সান্ত্বনায় সকলের মন প্রশান্ত। হযরত আমর ইবনে জমুহ্‌র স্ত্রী শহীদ চার সন্তান ও স্বামীর লাশ উটের পিঠে উঠিয়ে বাড়ির দিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু উট ওহূদের ময়দান ত্যাগ করলো না। তিনি আল্লাহর রাসূলকে বিষয়টি জানালেন। তিনি আমরের স্ত্রীর কাছে জানতে চাইলেন– আমর বাড়ি থেকে আসার সময় কিছু বলে এসেছিল কি-না। তিনি বললেন– হে আল্লাহ রাসূল! আমার স্বামী বাড়ি থেকে যুদ্ধের ময়দানে আসার প্রাক্কালে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে বলেছিলেন– রাব্বুল আলামীন! আপনি আমাকে আর বাড়ি ফিরিয়ে আনবেন না।

এই কথা শোনার পরে আল্লাহর নবী আশ্রু সজল নয়নে আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। আল্লাহর নবীর দৃষ্টি শুভ্র মেঘমালা পেরিয়ে ঐ দূর নীলিমা ভেদ করে সপ্তম আসমানের ওপরে আরশে আযিমের নিকট গিয়ে পৌঁছালো। অপূর্ব মধুময় স্নিগ্ধ হাসির রেখা দেখা দিল তাঁর পবিত্র অধরে। উন্মুক্ত দক্ষিণা মলয় সমীরণে দোল খাওয়া গাছের কচি লতার মত রাসূলের মাথা মোবারক সামান্য হেলে উঠলো। রাসূল বললেন– আল্লাহ আমরের দোয়া কবুল করে নিয়েছেন। আমরকে ওহূদের রক্তাক্ত উপত্যকায় অন্তিম শয়নে শুইয়ে দাও।

পঙ্গুত্ব হযরত আমরকে দ্বীনের শত্রুদের সাথে মোকাবেলায় কোনো বাধার সৃষ্টি করতে পারেনি। ইসলামী আন্দোলনের প্রতি বিন্দু পরিমাণ শিথিলতার জন্ম দিতে পারেনি তাঁর খোড়া পা। আন্দোলনের রক্ত ঝরা ময়দানে খোড়া পা নিয়ে তিনি বিচরণ করতেন। শাহাদাতের ঐন্দ্রজালিক সুরের মুর্চ্ছনায় তিনি ওহূদের রণপ্রান্তরে ছুটে যান। যে হৃদয় দ্বীন কায়েমের স্বপ্নে বিভোর, যে দেহ আল্লাহর রাস্তায় রক্ত ঝরাতে অতন্দ্র প্রহরীর মত সদা প্রস্তুত, যে চোখ শাহাদাতের পবিত্র শুভ্র জ্যোতির্ময় রূপ দর্শনে নিদ্রাহীন যামিনী অতিবাহিত করে– সে চোখ, হৃদয়, দেহের সামনে বাতিল শক্তি ভিত্তিমূলসহ মুখ থুবড়ে ধ্বসে পড়তে বাধ্য।

বদরের যুদ্ধের আরেকটি ঘটনা। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলছে। হযরত আব্দুর রহমান বলেন– আমি ছোট দুটি ছেলেকে যুদ্ধের ময়দানে দেখে বড়ই বিরক্ত হলাম। এত ছোট

বাচ্চাকে কেন যুদ্ধে আসার অনুমতি দেয়া হয়েছে, আমার মনে প্রশ্ন জাগলো। ছেলে দুটি আমার কাছে এসে জানতে চাইলো– চাচা, আমারা মদীনার আনসারের ছেলে। আমার শুনেছি আবু জেহেল আল্লাহর রাসূলকে সবথেকে বেশী কষ্ট দিয়েছে। তাকে আমরা চিনি না, দয়া করে দেখিয়ে দিন কোন লোকটি আবু জেহেল।

হযরত আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমি আবু জেহেলকে দেখিয়ে দিলাম। দু'ভাই আবু জেহেলকে দেখার সাথে সাথে সিংহের মত গর্জন করে এগিয়ে গেল। তাঁরা আবু জেহেলকে ঘিরে ধরে তরবারী চালাচ্ছে। হঠাৎ করে আবু জেহেলের তরবারীর আঘাতে কিশোর যোদ্ধার বাম হাতটি কেটে তা ঘাড়ের চামড়ার সাথে ঝুলতে লাগলো। ঝুলন্ত কাটা হাতটি যুদ্ধে অসুবিধার সৃষ্টি করছে। ছেলেটি আল্লাহু আকবর বলে গর্জন করে ঝুলন্ত কাটা হাতটি পায়ের নিচে ফেলে টান দিয়ে ছিড়ে ডান হাতের তরবারীর আঘাতে আবু জেহেলকে এ পৃথিবী থেকে বিদায় করে দিল।

বর্তমানে মুসলমানরা জিহাদের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। আপন শক্তির প্রতি এদের আস্থা নেই, এরা নিজের প্রাণের মায়ায় অস্থির। পৃথিবীর ভোগ-বিলাসের প্রতি এদের সীমাহীন আকর্ষণ। এ কারণেই মুসলিম মিল্লাত বর্তমানে পৃথিবীতে লাঞ্ছিত হচ্ছে। ইয়াহুদী-খৃষ্টান আর মুশরিকদের অন্যায়ের মৌখিক প্রতিবাদও এরা করতে পারে না। কারণ, এরা আল্লাহকে ভয় না করে– ভয় করে পৃথিবীর পরাশক্তির। আল্লামা ইকবাল বলেন–

জু ভরোসা থা উসে কুওয়াতে বাযু পর থা

হ্যায় তুমহে মওত কা ডর, উস কো খোদা কা ডর থা।

সে যুগের মুসলমানদের নিজ শক্তির প্রতি গভীর আস্থা ছিল। তাঁদের হৃদয়ে ভয় ছিল একমাত্র মহান আল্লাহর। এখন তোমরা মৃত্যুর ভয়ে বড়ই কাতর।

মুসলিম জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ শাহাদাত। আর এই শাহাদাতের তীব্র আকাংখাই মুসলমানদের বিজয় এনে দেয়। অগণিত বাতিল সৈন্য যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। আল্লাহর রাসূলের সকল স্তরের সাহাবায়ে কেরাম শাহাদাতের নেশায় যুদ্ধের ময়দানে ছুটে যেতেন। প্রাণের মায়া তাঁরা করতেন না, তাঁদের হৃদয়ে একমাত্র ভয় ছিল মহান আল্লাহর।

শহীদী গুলবাগে জীবন্ত গোলাপ

হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ মাত্র পনের বছর বয়সে ইসলাম কবুল করে দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শামিল হন। তিনি ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় ইসলাম কবুল করেন। ফলে তাঁকে অবর্ণনীয় অত্যাচারের সম্মুখিন হতে হয়েছিল। অসহনীয় নির্যাতনের মুখেও তিনি আল্লাহর রাসূলের দ্বীন-ঈমানের প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য আগমন করতেন। তিনি ধন-সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে ইসলামী অন্দোলনকে লক্ষ্য পানে এগিয়ে নিয়ে যান। আল্লাহর নবীকে তিনি নিজ প্রাণ অপেক্ষা অধিক প্রিয় মনে করতেন।

ওহূদের ময়দানে হক-বাতিলের সাথে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হচ্ছে। মুসলমানদের বিজয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। কিছু সংখ্যক মুসলিম যোদ্ধা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লো। আনন্দের অতিশয্যে ইসলামের তীরন্দাজ বাহিনী এক মারাত্মক ভুল করলো। তাঁদেরকে যে গিরি পথের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, যুদ্ধে নিজেদের বিজয় দেখে গিরি পথের প্রহরা ত্যাগ করে যুদ্ধের ময়দানের দিকে ছুটলো। সামান্য সংখ্যক সাহাবী রাসূলের আদেশ অনুযায়ী গিরিপথে প্রহরায় থাকলেন। প্রকৃত ঘটনা ছিল যুদ্ধ শুরুর পূর্ব মুহূর্তে আল্লাহর রাসূল মুজাহিদদের একটি দলকে গিরি পথে প্রহরার দায়িত্ব দেন । যেন ঐ পথে ইসলামের শত্রুরা মুসলিম বাহিনীর পশ্চাৎ দিক থেকে আক্রমন করতে না পারে।

যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে দেখে প্রহরায় নিযুক্ত বাহিনীর মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হলো। কেউ বললেন, যেহেতু আমাদের বিজয় হয়েছে। সেহেতু এখানে প্রহরার প্রয়োজন শেষ। কেউ বললেন আল্লাহর নবী আমাদেরকে এখানে অবস্থানের নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত আমরা এ স্থান অরক্ষিত করে যেতে পারিনা।

বাদানুবাদের এক পর্যায়ে অধিকাংশ যোদ্ধা গিরিপথ ত্যাগ করে যুদ্ধের ময়দানে চলে আসলেম। নেতৃ আদেশ অমান্য করার ভয়াবহ পরিণাম সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল। যুদ্ধ জয়ের আনন্দে মুসলমানরা আত্মহারা। পুনরায় যুদ্ধের কোন প্রস্তুতি নেই। পরাজিত কাফির বাহিনী যখন দেখলো, গিরি পথ প্রায় উন্মুক্ত। মুসলমানরা অপ্রস্তুত অবস্থা। এই সুযোগে তারা গিরি পথ দিয়ে মুসলমানদের পেছন থেকে আক্রমন করলো। হঠাৎ আক্রমনের তীব্রতায় মুসলিম বাহিনী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো। মুসলমানরা হতবিহবলতা কাটিয়ে উঠার পূর্বে অপ্রস্তুত মুজাহিদ বাহিনীর অনেক বীর

শক্রর আঘাতে শহীদ হলেন। কাফিরদের একমাত্র লক্ষ্য ইসলামের শক্তিকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া। এজন্য তারা আল্লাহর রাসূলের দিকেই ধাবিত হলো।

ইসলামী সংগঠনের প্রাণ হলো দায়িত্বশীলের আনুগত্য। আল কোরআন ইসলামী নেতৃত্বের আনুগত্য করা নামায-রোযার মতই ফরজ করে দিয়েছে। নেতার আদেশ অমান্য করে বাতিলদের অনুরূপ আন্দোলনের নামে জ্বালাও-পোড়াও, অবরোধ-ভাংচুর করলে ইসলামী আন্দোলনের প্রতি সাধারণ মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলে। সন্ত্রাস সৃষ্টি করলে আন্দোলনের প্রতি জনগণের ঘৃণা সৃষ্টি হয়। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের নেতৃআদেশ প্রাণ দিয়ে হলেও পালন করতে হবে। নেতার আদেশের প্রতি অবহেলা প্রদর্শনের ভয়ঙ্কর পরিণাম যে কি, তা ওহূদের ময়দানে প্রমাণিত হয়েছে।

শক্রদের আক্রমনে ওহূদের ময়দানে রক্তের প্লাবন বয়ে যাচ্ছে। তারা আল্লাহর রাসূলকে ঘিরে ফেলেছে। মুষ্টিমেয় কিছু জানবাজ সাহাবা নিজেদের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে আল্লাহ্র নবীকে ঘিরে রাখলেন। কাফিরদের অস্ত্রের আঘাত থেকে আল্লাহর রাসূলকে নিরাপদ রাখার উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের দেহকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছেন। এ সময় বীর মুজাহিদ হযরত আম্মার বিন ইয়াযিদ শহীদ হলেন। প্রতিপক্ষের তীরের আঘাতে তাঁর চোখ কোটর থেকে বেরিয়ে মুখের উপর ঝুলতে লাগলো। হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াককাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কাফিরদের দিকে তীর ছুড়তে লাগলেন। হযরত আবু দুজানা আল্লাহর রাসূলকে এমনভাবে বেষ্টন করলেন– যেন সমস্ত আঘাত তাঁরই দেহে লাগে– আল্লাহর নবী যেন অক্ষত থাকেন। হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ এক হাতে তরবারী ও অপর হাতে বর্শা নিয়ে কাফিরদের প্রচন্ড আঘাত থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেফাজত করার জন্য বীরবিক্রমে লড়াই করছেন।

এক পর্যায়ে মদীনার বারোজন আনছার ও মক্কার একজন মুহাজির হযরত তালহা ব্যতীত সকলেই আল্লাহর নবীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। ইসলামের দুশমনরা আল্লাহ্র নবীকে হত্যা করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলো। এই অবস্থায় আল্লাহর রাসূল ঘোষণা করলেন– ইসলামের দুশমনদেরকে যে ব্যক্তি পিছু হটিয়ে দিতে পারবে সে জান্নাতে আমার সাথী হবে।

হযরত তালহা আবেদন করলেন– হে আল্লাহর রাসূল! আমি যাবো।

আল্লাহর রাসূল তাঁকে নিষেধ করলেন। আনসারদের মধ্যে থেকে একজন বললেন– আমি যাবো।

আল্লাহর নবী তাঁকে অনুমতি দিলেন। আনসার সাহাবী প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করলেন। এক পর্যায়ে তিনি শাহাদাতবরণ করলেন। আল্লাহর রাসূল পুনরায় পূর্বের ঘোষণা দিলেন। এবারও হযরত তালহা যাবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। আল্লাহর নবী পুনরায় তাঁকে নিষেধ করলেন। মদীনার আনসারদের মধ্য থেকে আরেকজন এগিয়ে গেলেন। তিনিও শহীদ হলেন। এভাবে করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বার বার হযরত তালহাকে যেতে না দিয়ে আনসারদের যাবার অনুমতি দিচ্ছেন। আনসারদের বারোজনই যখন শহীদ হলে গেলেন তখন তিনি বললেন– তালহা এবার তুমি যাও।

আল্লাহর রাসূলের অনুমতি নিয়ে হযরত তালহা সিংহের মত গর্জন করে কাফিরদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অরক্ষিত পেয়ে কাফিররা আক্রমণ করলো। তিনি আহত হলেন। তাঁর দাঁত মোবারক শহীদ হলো। শোষিত নিপড়িত ও নির্যাতিত মানবতার মুক্তির দিশারী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তাক্ত দেহে পড়ে গেলেন। হযরত তালহা– তাঁর নিজের প্রতি কোনো লক্ষ্য নেই, যে কোনো মুহূর্তে শত্রুর অস্ত্র তাঁর জীবন প্রদীপ নির্বাপিত করে দিতে পারে। এই অবস্থায় তিনি অস্ত্র হাতে একাধারে শত্রুদলকে প্রতিহত করছেন, অপরদিকে আল্লাহর নবীর দিকে লক্ষ্য রাখাছেন। এক পর্যায়ে তিনি আল্লাহর রাসূলকে নিজের কাঁধে উঠিয়ে নিরাপদ দূরত্বে চলে যান। তাঁর পশ্চাতে আল্লাহর দুশমনরা ছুটে আসছে নবীকে হত্যা করার জন্য।

হযরত তালহা আল্লাহর নবীর রক্তাক্ত দেহ কাঁধে নিয়েই শত্রুদলের আক্রমণ প্রতিহত করছেন। অকস্মাৎ তিনি মারাত্মকভাবে আহত হলেন। নিজের আহত দেহের দিকে তাঁর দৃষ্টি নেই। আহত স্থান থেকে ঝর্ণার মত রক্ত গড়িয়ে মাটি ভিজিয়ে দিচ্ছে, সে দিকে তাঁর দৃষ্টি নেই। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য আল্লাহ্র নবীকে হেফাজত করতে হবে। তিনি আহত-রক্তাক্ত দেহে আল্লাহর নবীকে কাঁধে উঠিয়ে নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে যাচ্ছেন। একের পর এক অস্ত্রের আঘাত হযরত তালহার দেহে আঘাত হানছে। অধিক রক্ত ক্ষরণে তিনিও দুর্বল হয়ে পড়েছেন। শেষ পর্যন্ত পাহাড়ের এক গুহায় আহত নবীকে শুইয়ে দিয়ে তিনি জ্ঞান হারা হয়ে লুটিয়ে পড়লেন।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– আমি, আবু উবাইদা এবং অন্যরা অন্যদিকে যুদ্ধ করছিলাম। আমরা আল্লাহর নবীর সন্ধানে এসে দেখি তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন। আমরা দ্রুত তাঁর সেবার জন্য এগিয়ে গেলাম। তিনি বললেন– আমাকে নয়, তোমাদের বন্ধু তালহাকে দেখ। আমরা তাকিয়ে দেখি তালহা পড়ে আছে। তাঁর জ্ঞান নেই, একটি হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন প্রায়। গোটা

শরীরে বিভিন্ন অস্ত্রের সত্তরটিও বেশী আঘাত ছিল। এ জন্য পরবর্তীকালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন- কেউ যদি কোনো মৃত মানুষকে পৃথিবীতে বিচরণশীল দেখতে চায় তাহলে সে যেন তালহাকে দেখে নেয়।

হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে 'জীবন্ত শহীদ' বলা হয়। ওহূদের প্রসঙ্গ উঠলেই হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলতেন- সেদিনের যুদ্ধের সমস্ত কৃতিত্বই ছিল হযরত তালহার। আল্লাহর রাসূল তাঁকে পৃথিবীতে জীবিত থাকতেই জান্নাতুল ফিরদাউসের সুসংবাদ দেন।

আল্লাহ্র যমীনে কোরআনের বিধান প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সাহাবায়ে কেরাম শাহাদাতের উত্তপ্ত ময়দানে নিজের দেহে রক্তের বন্যা দেখেও পিছপা হননি। আল্লাহর দুশমনদের তীব্র আক্রমণের মুখে তাঁরা দৃপ্ত-কদমে ময়দানে এগিয়ে গেছেন। এ দুনিয়ার পার্থিব জীবনকে তাঁরা আখিরাতের জীবনের তুলনায় মূল্যহীন মনে করতেন। আল্লাহ্র রাস্তায় হাসি মুখে জীবন বিলিয়ে দেয়াতেই জীবনের পূর্ণ সাফল্য লাভ- আল কোরআনের এ ঘোষণার প্রতি তাঁদের অবিচল আস্থা ছিল। এ কারণে শত্রুর তরবারী যখন তাদের দেহ খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলতো তখন তারা বলতেন- আল্লাহ্র শপথ! আমি সফলতা অর্জন করেছি।

নিঃশেষে দিয়েছি বিলিয়ে প্রভু তোমারই তরে

তীরন্দাজ বাহিনীর অমনোযোগিতার কারণে ওহূদের প্রান্তরে মুসলমানদের চরম বিপর্যয় নেমে এলো। ইসলামের দুশমনদের একমাত্র টার্গেট আল্লাহ্র রাসূলকে হত্যা করা। তাঁকে অরক্ষিত পেয়ে কাফিররা তাঁর দিকেই ছুটে গেল। তাদের লক্ষ্য তাওহীদের বিপ্লবী কণ্ঠকে ওহূদের ময়দানে স্তব্ধ করে দেয়া। ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্বকে তারা খতম করে দিতে চায়। ওদের ধারণা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হলেই বোধহয় ইসলাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, তাওহীদী চেতনার বিলুপ্তি ঘটবে পৃথিবী থেকে। সত্যের আলো নির্বাপিত করে গোটা পৃথিবীকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করতে চায় বাতিল শক্তি।

তাদের এ ধরনের তৎপরতা শুধু ওহূদের ময়দানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। পৃথিবীর যেখানেই ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন গড়ে উঠেছে, সেখানেই ইসলাম বিরোধী শক্তি এই আন্দোলনকে নেতৃত্ব শূন্য করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। এই লক্ষ্যে তারা নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে মক্কার কাফিরদের অনুকরণে মিথ্যা

প্রচার-প্রপাগান্ডা চালাতে থাকে। মিথ্যা প্রচার-প্রচারণাতেও যখন কোরআনের রাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করতে পারে না, তখন দ্বীনের দুশমনরা নেতৃবৃন্দকে দৈহিকভাবে নির্মূল করার লক্ষ্যে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। নির্জনে অথবা একাকী পেলেই বাতিল শক্তি দ্বীনি আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের ওপরে হিংস্র হায়েনার মত আক্রমণ করে।

ইসলামের শত্রুরা আল্লাহর রাসূলের দিকেই ছুটে আসছে। হযরত মুসয়াব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বিপদের ভয়াবহতা উপলব্ধি করলেন। তিনি ক্ষণিকের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর দেহের প্রাণের স্পন্দন থাকা পর্যন্ত আল্লাহর রাসূলের সামান্যতম ক্ষতিও তিনি বরদাস্ত করবেন না। এই যুদ্ধে তিনি ছিলেন মুসলিম বাহিনীর পতাকা বাহক।

তিনি আল্লাহর রাসূলকে নিজ দেহের আড়ালে রেখে উল্কার গতিতে শত্রুর সম্মুখে এক হাতে পতাকা ও ওপর হাতে তরবারী নিয়ে ছুটাছুটি করতে লাগলেন এবং কণ্ঠ দিয়ে নেকড়ে বাঘের মত গর্জন করছেন এবং মাঝে মাঝে আল্লাহু আকবার বলে ধ্বনি দিচ্ছেন। তাঁর উদ্দেশ্য, নিজের প্রতি শত্রুর দৃষ্টি আকর্ষণ করা। হৃদয়ে আকাংখা, তাঁর এ ধরনের ভয়ংকর মূর্তি দেখে ইসলামের শত্রুরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মনোযোগ হারিয়ে যেন তাঁকেই আক্রমণ করে। নিজের প্রাণের বিনিময়েও যেন আল্লাহর নবী সুরক্ষিত থাকে। এভাবে করে তিনি ওহুদের ময়দানে মুসলমানদের এক করুণ মুহূর্তে নিজের একটি মাত্র সত্তাকে একটি বাহিনীতে পরিণত করেছিলেন। কাফিররা তাঁর দেহের ওপর দিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আঘাত হানার অপচেষ্টা করতে থাকে।

হযরত মুসয়াব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর শাহাদাতবরণ সম্পর্কিত ঘটনা হযরত ইবনে সাদ এভাবে বর্ণনা করেন যে, 'কাফিরদের তীব্র আক্রমণের মুখে মুসলমানরা যখনই বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়তো তখনই তিনি একাই শত্রু বাহিনীর সম্মুখে পাহাড়ের মতোই অটল হয়ে দাঁড়াতেন। আল্লাহর দুশমন ইবনে কামিয়া অশ্বে আরোহণ করে তাঁর দিকে এগিয়ে এসে তরবারীর আঘাতে তাঁর ডান হাতটি বিচ্ছিন্ন করে দিল। হযরত মুসয়াবের কণ্ঠ দিয়ে সেই মুহূর্তে উচ্চারিত হলো–

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ-قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ-

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন রাসূল ব্যতীত আর কিছু নন। তাঁর পূর্বে আরো বহু রাসূল অতিবহিত হয়েছেন।

হযরত মুসয়াব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বাম হাতে ইসলামের পতাকা উঁচে তুলে ধরলেন। শত্রুর তরবারীর আরেকটি আঘাতে তাঁর বাম হাতটিও দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এবারও তিনি পূর্বের বলা কথার পুনরাবৃত্তি করলেন এবং সেই কথাটি বলতে বলতে তিনি তাঁর রক্তাক্ত দুটো বাহু দিয়ে ইসলামের পতাকা বুকের মাঝে আঁকড়ে ধরলেন। ইসলামের দুশমনরা এবারে তাঁর প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করলো। বর্শার আঘাতে তিনি শাহাদাতের অমর পেয়ালা পান করে শহীদী মিছিলে শামিল হলেন।

তাঁর শাহাদাতবরণ কালে সবথেকে বিস্ময়কর ঘটনা হলো, ইসলামের দুশমনদের অস্ত্রের আঘাতে তিনি ক্ষতবিক্ষত হচ্ছেন এবং তাঁর কণ্ঠ দিয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ে উচ্চারিত হচ্ছে– وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ–قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ– একজন শহীদের উচ্চারিত এই কথাগুলোই মহান আল্লাহ তা'য়ালা পরবর্তীতে মহাগ্রন্থ আল কোরআরেন (সূরা ইমরানের ১৪৪ নং আয়াত) আয়াত হিসেবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে ওপরে অবতীর্ণ করলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আল কোরআনে যে সিদ্ধান্ত তাঁর বান্দাদেরকে জানিয়ে দিবেন, সে সিদ্ধান্ত যেন তিনি তাঁরই এক প্রিয় বান্দার কণ্ঠ দিয়ে শাহাদাতবরণের পূর্ব মুহূর্তে উচ্চারিত করালেন।

হযরত মুসয়াব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যেন বাতিল শক্তিকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে গেলেন– মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন রাসূল ছিলেন। তিনি পৃথিবীবাসীর কাছে মহাসত্য পৌঁছে দিয়ে অন্যান্য মানুষের ন্যায় পৃথিবী থেকে এক সময় বিদায় গ্রহণ করবেন। তাঁর পূর্বেও অগণিত নবী-রাসূল পৃথিবীর মানুষের সামনে মহাসত্য গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করেছেন, দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চেষ্টা-সাধনা, সংগ্রাম করেছেন এবং এক সময় ধ্বংসশীল এই পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করেছেন। সুতরাং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চির বিদায়ের মধ্য দিয়ে তাঁর আনিত আদর্শের বিলুপ্তি ঘটবে না। মহাসত্যের প্রজ্জ্বলিত আলোক শিখা চির অনির্বান। যে আদর্শের বীজ সত্যের বাহকরা বপন করেন, তার অঙ্কুরোদ্গাম সত্যের বাহকদেরকে হত্যা করে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না– একদিন তা ফলে-ফুলে সুশোভিত হয়ে মহিরুহ ধারণ করবেই করবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। ইসলামের পতাকাবাহী দলকে নিষিদ্ধ করে বা ব্যক্তিকে হত্যা করে আদর্শের বিলুপ্তি ঘটানো যায় না। শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করার পূর্ব মুহূর্তে হযরত মুসয়াব যেন এই কথাগুলোই ইসলামের শত্রুদেরকে দৃপ্ত কণ্ঠে জানিয়ে দিচ্ছিলেন।

অপরদিকে ইসলামের পতাকাবাহীদের তিনি যেন বলছিলেন- আজকের এই ওহুদের ময়দানে বাতিল শক্তি যদি আল্লাহর রাসূলকে হত্যা করতে সমর্থ হয়ও, পক্ষান্তরে রাসূলের আনিত আদর্শ পরিহার করে নিজেদের ধ্যান-ধারণা অনুসারে বা মানুষের বানানো মতবাদ-মতাদর্শ অনুসারে পৃথিবীতে নিজেদের জীবন পরিচালনা করা হবে সবথেকে মারাত্মক বোকামী। কারণ এই পৃথিবী চিরস্থায়ী বাসস্থান নয়, সময়ের ব্যবধানে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, এই পৃথিবীকে ছাড়তে হবেই। পৃথিবীর যাবতীয় কর্মকান্ডের হিসাব ঐ আল্লাহর সামনে দিতে হবে- যিনি তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছিলেন। আর রাসূলও একজন মানুষ এবং কোনো মানুষই অমর-অক্ষয় নয়। তাঁকেও একদিন আল্লাহর আদেশে এ পৃথিবী ছাড়তে হবে। অতএব রাসূলের বিদায়ের সাথে সাথে তার আনিত আদর্শ বিদায় নেবে না। তিনি যে আদর্শ রেখে যাবেন, সেই আদর্শ অনুসরণ করেই পৃথিবীতে জীবন পরিচালনা করতে হবে।

ওহুদ যুদ্ধের ময়দানে হযরত মুসয়াব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর লাশ পাওয়া গেল। শরীরে জোড়াতালি দেয়া শত ছিন্ন জামা, সেটাও রক্ত আর ধূলো-বালিতে বিবর্ণ, তবুও তাঁর চেহারায় জান্নাতী নূর বিকিরণ হচ্ছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসয়াব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুও এই করুণ অবস্থা দেখে নিজেকে সংবরণ করতে পারলেন না। তাঁর চোখ মোবারক দিয়ে বেদনার অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামদের চোখও অশ্রু সজল হয়ে উঠলো। তাঁকে দাফন দেয়ার মূহূর্তে সামান্য এক টুকরা কাপড় ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। তা দিয়ে মাথা ঢেকে দিলে রক্তাক্ত পা'দুটো উন্মুক্ত থাকে, আর পা'দুটো ঢেকে দিলে মাথা উন্মুক্ত হয়ে যায়। ধনীর আদরের দুলাল হযরতে মুসয়াব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর শরীরের জামা আর কাফনের আজ এই করুণ অবস্থা। অথচ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর মতো জাঁকজমক পূর্ণ পোষাক আর শ্রেষ্ঠ সুগন্ধি মক্কায় কেউ ব্যবহার করতো না।

পৃথিবীর সকল বিলাসিতা ও ধন-সম্পদের পাহাড়কে তরুণ বয়সে পদাঘাত করে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েমের আন্দোলনে যারা যোগদান করেছেন, হযরত মুসয়াব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন এবং বিশাল ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী। তিনি অত্যন্ত ঝলমলে মূল্যবান পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করতেন। শরীরে তিনি এমন সুগন্ধি ব্যবহার করতেন যে, যে পথে তিনি চলাফেরা করতেন সে পথ আকর্ষণীয় গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে যেত। তিনি তরুণ বয়সেই মহাসত্যের আহ্বানে

সাড়া দিয়ে প্রাথমিক যুগে ইসলাম কবুল করেন– অর্থাৎ তিনি ছিলেন সাবিকুনাল আওয়ালিন। যে সময়ে ইসলাম কবুল করার অর্থই ছিলো নির্যাতনের পাহাড়কে নিজের ওপরে ভেঙ্গে পড়তে নিজেই সাহায্য করা।

মহাসত্য কবুল করে ইসলামী আন্দোলনে শামিল হওয়ার অপরাধে তাঁকে তাঁর গর্ভধারিণী মা প্রহার করে ঘরে বন্দী করে রাখতেন। তিনি আল্লাহর আইন স্বাধীনভাবে পালন করার লক্ষ্যে হাবশায় হিজরত করেন। পুনরায় তিনি হাবশা থেকে মক্কায় এলে নির্যাতনের মুখে পড়েন। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ সংগঠক ও ভারসাম্যপূর্ণ মেজাজের অধিকারী। দাওয়াতী অভিযানে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি ইসলামী আদর্শ মানুষের সামনে তুলে ধরতেন। এ জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের পূর্বে হযরত তাঁকে দুত হিসাবে মদীনায় প্রেরণ করেন। মদীনায় তিনি ইসলামের পক্ষে জনমত গঠনে বিরাট অবদান রাখেন। ইসলামের ইতিহাসে তিনিই ছিলেন প্রথম দুত।

হযরত মুসয়াব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মদীনায় গিয়ে ব্যাপকভাবে ইসলামী আন্দোলনের পক্ষে জনগণকে সংগঠিত করেন। এই সাংগঠনিক সফরে তিনি মদীনার মানুষকে ইসলামী বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করেন। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের আলো জ্বলে ওঠে। একজন দক্ষ সংগঠক হিসেবে তিনি যে অসাধারণ ভারসাম্য মেজাজের অধিকারী ছিলেন তা একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। একদিন তিনি মদীনায় এক জনসমাবেশে ইসলামী আদর্শের অনুপম সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করে মানুষকে মহাসত্যের দিকে দাওয়াত দিচ্ছিলেন। এমন সময় বনি আবদিল আশহালের নেতা উসাইদ ইবনে হুদাইর সশস্ত্র অবস্থায় উত্তেজিত অবস্থায় উপস্থিত হলো। তিনি হযরত মুসয়াব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর প্রতি পূর্ব থেকেই রাগান্বিত ছিলেন। কারণ এই লোকটি মক্কা থেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুত হিসেবে মদীনায় আগমন করে এখানের মানুষকে বাপ-দাদার আদর্শ ত্যাগ করে এক নতুন আদর্শের দীক্ষা দিচ্ছে।

বনি আবদিল আশহালের নেতা উসাইদ ইবনে হুদাইরের চেহারা যেন ক্রোধে ফেটে পড়ছে। লোকটির রণমূর্তি দেখে উপস্থিত মুসলমানরা আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। কিন্তু হযরত মুসয়াব নির্ভীক চিত্তে মুখে স্মিত হাসি টেনে পরিস্থিতি দক্ষতার সাথে নিজের আয়ত্বে আনলেন। উসাইদ– হযরত মুসয়াব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে লক্ষ্য করে ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে বললো, 'তুমি আমাদের দেশের লোককে বিভ্রান্ত করছো। তোমার যদি প্রাণের প্রতি মমতা থাকে তাহলে এই মুহূর্তে মদীনা থেকে বেরিয়ে যাও।'

হযরত মুসয়াব মুখে মধুর হাসি টেনে উসাইদকে কোমল কণ্ঠে বললেন, 'আপনি অনুগ্রহ করে ধৈর্যের সাথে যদি কিছুক্ষণ আমার কথাগুলো শুনতেন! একটু বসুন না! আমার কথাগুলো আপনি শুনুন, যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে আমার দাওয়াত গ্রহণ করবেন আর না লাগলে আমরা চলে যাবো।'

যাকে ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে কথা বলা হলো, সেই লোকটি প্রতি উত্তরে কোমল কণ্ঠে ভদ্রতার সাথে কথা বলছে– বিষয়টি উসাইদের ক্রোধের অনলে যেন পানি ঢেলে দিল। লোকটির ভদ্র আচরণ উসাইদের বুকের ভেতরটা যেন নাড়া দিয়ে গেল। সে চিন্তা করলো, কথা শুনতে তো কোনো দোষ নেই। একটু শুনেই দেখি না, এরা কি বলে!' উসাইদের গর্বিত মস্তক নত হয়ে গেল। দ্বিতীয় কোনো কথা না বলে সে কোমল ভঙ্গিতে সমবেত জনতার মাঝে বসে পড়লো।

হযরত মুসয়াব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হৃদয়গ্রাহী-চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে সুললিত কণ্ঠে আল্লাহর কোরআন তিলাওয়াত করে পঠিত আয়াতসমূহের তাফসীর করলেন। তিনি যখন কোরআনের তাফসীর করছেন তখন উসাইদের চেহারায় খুশীর বন্যা বয়ে যাচ্ছে। আল্লাহর কোরআন উসাইদের ভেতরের জগৎ সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দিল। ক্ষণপূর্বের কলুষিত মন-মানসিকতা কোরআনের স্পর্শে মুহূর্তে কোথায় যেন হারিয়ে গেল। তিনি হযরত মুসয়াব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে তাঁর আলোচনা শেষ করতে না দিয়েই বলে উঠলেন, 'কথাগুলো তো খুবই সুন্দর! যুক্তি ভিত্তিক সত্য কথা! আপনি যে আদর্শের কথা বলছেন, তা গ্রহণ করতে হলে আমাকে কি করতে হবে?'

উসাইদের অদম্য আগ্রহ দেখে হযরত মুসয়াব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর চেহারা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। আল্লাহর শোকর আদায় করে তিনি বললেন, 'শরীর ও পোষাক পবিত্র করে কলেমা পাঠ করতে হয়।'

উসাইদ দ্বিরুক্তি না করে নীরবে বাড়িতে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে পুনরায় তিনি যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর শরীরে শোভা পাচ্ছে নতুন পোষাক এবং মাথার চুল দিয়ে পানি ঝরছে। তিনি দাঁড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে তাওহীদের ঘোষণা দিয়ে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এ ঘটনার পরে সাধারণ মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় ইসলামী শক্তির শক্ত ভিত্তি কায়েম করলেন। হযরত মুসয়াব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে ইসলামী আন্দোলনের কাজ আঞ্জাম দিতেন। তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বিলাসী জীবন ত্যাগ করে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের জীবন বেছে নেন। ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে তাঁকে সমস্ত ধন-সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হয়।

একদিন কিছু সংখ্যক সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসে ছিছেন। এমন সময় হযরত মুসয়াব দরবারে রেসালাতে উপস্থিত হলেন, তাঁর পরিধানে ছিলো জীর্ণ-মলিন তালিযুক্ত জামা। চেহারায় দরিদ্রতার প্রচন্ড কষাঘাত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর এই করুণ অবস্থা দেখে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম বেদনায় মুষড়ে পড়লেন। তাঁদের চোখ থেকে বেদনার অশ্রুধারা ঝড়ে পড়তে থাকলো। তাঁদের চোখের সামনে ভেসে হযরত মুসয়াবের ইসলাম পূর্ব জীবনের ছবি ভেসে উঠলো।

যে শরীর এক সময় শোভা পেত মহামূল্যবান ঝলমলে পোষাক এবং মন মাতানো সুগন্ধি ছিল যার প্রিয় বস্তু, আজ সে শরীরে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য শোভা পাচ্ছে জীর্ণ-ছিন্ন জোড়াতালি দেয়া পোষাক। তিনি ইসলামী আদর্শের আকর্ষণে শুধু ধন-সম্পদ ত্যাগ করেই ক্ষান্ত থাকেননি– পরিশেষে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে নিজের প্রিয় প্রাণটাও আল্লাহর রাস্তায় অকাতরে বিলিয়ে দিলেন। তাঁকে কাফন দেয়ার মুহূর্তে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কান্না ভেজা কণ্ঠ শুনে উপস্থিত সাহাবাদের মধ্যে কান্নার রোল পড়লো। কাফনের কাপড়ে যখন তার গোটা শরীর আবৃত হলো না তখন রাসূলের আদেশে ইযখির নামক এক ধরনের ঘাস দিয়ে তাঁর শরীর আবৃত করা হলো।

আল্লাহর রাসূল তাঁর কাফনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মুমিনদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পুর্ণ করেছে। হে মুসয়াব! মক্কায় আমি তোমার চেয়ে সুন্দর চাদর আর সৌন্দর্য পূর্ণ যুলফী কারো দেখিনি। আর আজ তুমি এখানে এই জীর্ণ চাদরে ধুলি মলিন অবস্থায় পড়ে আছো। আমি আল্লাহর নবী সাক্ষী দিচ্ছি, কিয়ামতের ময়দানে তোমরা অবশ্য অবশ্যই আল্লাহর দরবারে সাক্ষী দাতা হবে। আমি ঐ আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ– জীবিত মানুষেরা তোমরা শুনে রাখো, কিয়ামত পর্যন্ত যারা এই শহীদদের প্রতি সালাম জানাবে আর শহীদগণ সালামের জবাব দিবে।'

অন্ধ আঁখি পট যেন ধ্রুব তারা

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত লাভ করার পরে যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ এলো দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালিত করার জন্য তখন তিনি মানুষের ভেতরে দাওয়াতী কাজ শুরু করলেন। তাঁর দাওয়াতে বেশ কিছু

মানুষ ইসলাম গ্রহণ করলো। কিন্তু যাঁরা ইসলাম কবুল করলেন, তাদের মধ্যে হাতে গোনা সমাজের প্রভাবশালী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব দু'একজন ব্যতীত অন্য কেউ ছিল না। ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে সমাজের সাধারণ শ্রেণীই ছিল সর্বাধিক এবং সমাজে তাদের তেমন কোন প্রভাব ছিল না।

এ কথা সর্বজন বিদিত যে, যে সমাজে আল্লাহর রাসূল ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করেছিলেন, সে সমাজ ও পরিবেশ ছিল ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা কোনক্রমেই ইসলামী আদর্শ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং ইসলামের বিপরীতমুখী সে সমাজের সাধারণ মানুষদের মধ্যে যারাই ইসলাম কবুল করেছিল, প্রথম দিকে তারা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের শিকার হলো। সে সমাজের কায়েমী স্বার্থবাদী শক্তির ধারণা ছিল, ইসলাম তেমন একটা প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে না এবং অচিরেই তা হারিয়ে যাবে। কিন্তু পরিস্থিতি যখন তাদের চিন্তার বিপরীত দেখলো, তখন তারা ইসলাম গ্রহণকারীদের ওপরে শারীরিক নির্যাতন শুরু করলো। তৎকালীন সমাজের নেতৃবৃন্দ তাদেরকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে লাগলো।

অনুসারীগণ নির্যাতিত হচ্ছে দেখে রাহ্মাতুল্লিল আলামীন অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়লেন। ইসলামের প্রচার ও প্রসার এবং অনুসারীদের নিরাপত্তা দেয়া–এ দুটো বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে তিনি প্রচেষ্টা শুরু করলেন। স্বাভাবিকভাবেই তিনি চিন্তা করলেন, সমাজের প্রভাবশালী লোকজন ইসলাম কবুল করলে গোটা সমাজে এর বিরাট প্রভাব পড়বে এবং এ কারণে ইসলাম যেমন দ্রুত প্রসার লাভ করবে তেমনি যারা ইসলাম গ্রহণ করছে তারা নিরাপত্তা লাভ করবে। এই লক্ষ্য অর্জনের আশায় আল্লাহর রাসূল তৎকালীন সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। মনে বড় আশা–যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করতো, তাহলে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার পথ সুগম হতো।

আল্লাহর রাসূল এই আশায় কুরাইশ নেতা আবু জেহেল, রাবিয়ার দুই পুত্র উতবা, শাইবা,.উমাইয়া ইবনে খাল্ফ, ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা এবং আল্লাহর রাসূলের আপন চাচা আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব প্রমুখ নেতৃবৃন্দের কাছে এক মজলিসে ইসলামের দাওয়াত পেশ করতে গিয়ে এদের সাথে গভীর মনোনিবেশ সহকারে কথা বলছিলেন। তাঁর মনে বড় আশা, এসব নেতৃবৃন্দ ইসলাম কবুল করলে বর্তমানে মক্কায় ইসলামের যে দুর্দিন অতিবাহিত হচ্ছে, যে কঠিন অবস্থার মোকাবেলা তাঁকে ও ইসলাম গ্রহণকারীদের করতে হচ্ছে, এই চরম অবস্থার অবসান ঘটবে। ইসলামী আন্দোলনকে তার মঞ্জিলে মকসুদে পৌছানোর জন্য বিষয়টি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে এই বাতিল নেতৃবৃন্দ তাদের ধন-সম্পদ এবং সামাজিক

প্রভাব-প্রতিপত্তি, শক্তি-ক্ষমতা ও দাপট দিয়ে দ্বীনি আন্দোলনের গতিপথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে, প্রবল বাধা সৃষ্টি করে সমাজের সাধারণ জনগণকে এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় নিমজ্জিত রেখেছে, অপরদিকে এমন ধরনের ষড়যন্ত্রের জাল তারা বিছিয়ে দিচ্ছে যে, ইসলামী আদর্শ যেন কোনক্রমেই তার স্বরূপে বিকশিত হতে না পারে।

কোন মানুষের পক্ষে ইসলাম সম্পর্কে প্রকাশ্যে বা গোপনে কথা বলার সুযোগ না হয়, এর প্রচার ও প্রসারের গতি যেন রুদ্ধ হয়ে পড়ে। মক্কার ইসলাম বিরোধী এসব নেতৃবৃন্দ মক্কার বাইরে প্রভাব বিস্তার করে তাদের পরিচিতজন, আত্মীয়-স্বজন এবং ঘনিষ্ঠজনদেরকে সতর্ক দিয়েছিল, তারা যেন কোনক্রমেই ইসলামী আন্দোলনের সংস্পর্শে না আসে এবং ব্যা পারে তারা গোত্রীয় সংহতিকে ব্যবহার করেছিল। কারণ তৎকালীন আরবে গোত্রীয় বন্ধন ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। সত্য হোক আর মিথ্যা হোক, ন্যায় হোক আর অন্যায় হোক, বিষয়টি স্বগোত্রের হলে যে কোন মূল্যে বা যে কোন অবস্থায় তার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা দিতেই হবে আর এটাই ছিল আরব সমাজের অন্যতম নীতি।

এই প্রতিকুল পরিস্থিতিতে আল্লাহর রাসূল মক্কার নেতৃবৃন্দকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন, তিনি অত্যন্ত আগ্রহ ও ব্যগ্রতা সহকারে তাদের সামনে ইসলামের সুমহান আদর্শ উপস্থাপন করছিলেন। ঠিক সেই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে একজন দরিদ্র ও অন্ধ ব্যক্তি রাসূলের ব্যস্ততা ও ব্যগ্রতার মাঝেই অত্যন্ত আন্তরিকতা ও আগ্রহের সাথে নিজের অন্তরের অবস্থা প্রকাশ করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ! আল্লাহ আপনাকে যে জ্ঞান দান করেছেন তা থেকে আমাকে শিক্ষা দিন।'

বর্তমান মুহূর্তে আল্লাহর রাসূল কোন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত রয়েছেন এবং তিনি কতটা ব্যস্ত–আর এই ব্যস্ততাও তাঁর নিজের কোন স্বার্থে নয়–এসব কথা যে ঐ অন্ধ ব্যক্তির একেবারে অজানা ছিল– তা নয়। এই অবস্থায় রাসূলকে বার বার ডেকে কিছু বলতে চাওয়ায় তাঁর বাক্যালাপে বাধার সৃষ্টি হচ্ছিলো। কথার মাঝে কথা বলায় তাঁর কথার ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিলো এবং তাঁর কথার গুরুত্ব ও গাম্ভীর্যতা হালকা হয়ে যাচ্ছিলো। এ জন্য আল্লাহর রাসূল অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং মনের এই অসন্তুষ্টি তাঁর পবিত্র চেহারা মোবারকে রেখাপাত করেছিল-স্বভাবতই সে দৃশ্য সেই অন্ধ ব্যক্তির দৃষ্টিগোচর হয়নি, কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলের মনের ও চেহারার অবস্থা দেখলেন।

ইতিহাসে সেই অন্ধ ও দরিদ্র ব্যক্তির এভাবে পরিচিতি দেয়া হয়েছে যে, তিনি ইবনে উম্মে মাকতুম নামে পরিচিত ছিলেন। সাবিকুনাল আউয়ালিন–অর্থাৎ প্রথমে যাঁরা

ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। নবুওয়াতের প্রথম যুগেই তিনি ইসলাম কবুল করে ধন্য হয়েছিলেন। বিভিন্ন বর্ণনা অনুসারে হযরত ইবনে উম্মে মাকতুমের প্রকৃত নাম ছিল আমর অথবা আব্দুল্লাহ অথবা হাছিন। কিন্তু তিনি আপন মায়ের উপাধি সংযোগে ইবনে উম্মে মাকতুম নামেই পরিচিতি লাভ করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল কায়েস ইবনে যায়েদাহ্ এবং মায়ের নাম ছিল আতিকা। তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরার আপন মামা ছিলেন। এই সম্পর্কে হযরত উম্মে মাকতুম ছিলেন হযরত খাদিজাতুল কুবরার আপন মামাত ভাই। আবার কোন বর্ণনায় দেখা যায় যে, তিনি ছিলেন হযরত খাদিজাতুল কুবরার ফুফাত ভাই। যাই হোক, তিনি ছিলেন আল্লাহর রাসূলের পরিবারের ঘনিষ্ঠজন। আল্লাহর রাসূলের এই অন্ধ সাহাবী সূরা আবাসা অবতীর্ণ হবার পূর্বে না পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, এ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ বিরাজমান। তবে সমস্ত ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে একমত যে, তিনি সাবিকুনাল আউয়ালিন তথা প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন-এতে কোন দ্বিমত নেই।

তবে সূরা আবাসা অবতীর্ণ হবার পূর্বে অথবা পরে যখনই তিনি ইসলাম কবুল করুন না কেন, যে প্রেক্ষাপটে সূরা আবাসা অবতীর্ণ হয়েছে, সে সময়ে যে তাঁর মন ইসলামের প্রতি চরমভাবে আকৃষ্ট ছিল এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করার কোন অবকাশ নেই। কারণ তাঁর মন ইসলামী আদর্শের জন্য এতটাই ব্যগ্র হয়েছিল যে, তিনি রাসূলের চরম ব্যস্ততা উপেক্ষা করে বারবার তাঁকে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করছিলেন। ইতিহাসের যেসব সূত্রে এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তার কোনটিতে বলা হয়েছে এই সময়ে তিনি ইসলামের প্রতি অতিমাত্রায় আকৃষ্ট হয়ে দরবারে রেসালাতে আগমন করেছিলেন। তিরমিজী শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে হযরত উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, হযরত উম্মে মাকতুম এসে আল্লাহর রাসূলকে বলেছিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহি আরশিদ্‌নি' অর্থাৎ হে আল্লাহর রাসূল ! আমাকে সত্য ও সঠিক পথ দেখিয়ে দিন।

ইবনে জারীর উল্লেখ করেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন-তিনি রাসূলের কাছে কোরআনের একটি আয়াতের মর্ম জানতে এসে বলেছিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহি আল্লামানি মিম্মা আল্লামাকাল্লাহ্' অর্থাৎ 'হে আল্লাহর রাসূল ! আল্লাহ আপনাকে যে জ্ঞান দিয়েছেন তা থেকে আমাকে শিক্ষা দিন।' সুতরাং গবেষকদের এসব বর্ণনা থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এ সময়ে ইবনে মাকতুম তাওহীদ, রেসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান এনেছিলেন এবং তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই সত্য পথ লাভের একমাত্র মাধ্যম বলে বিশ্বাস করতেন।

তিনি এ সময়ে পার্থিব কোন স্বার্থের কারণে এসে আল্লাহর রাসূলের ব্যস্ততার মাঝেই কথা বলে রাসূলের কথার ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন করেননি, বরং তিনি হেদায়াত লাভ ও মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই এমনটি করেছিলেন। আর এ সময়ে রাসূল যাদের সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করছিলেন, ইতিহাসে তাদের নামের যে তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে করে দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে একমাত্র রাসূলের আপন চাচা ব্যতীত অন্য সকলেই ছিল ইসলামী আন্দোলনের মারাত্মক শত্রু।

এ কথাও ইতিহাস থেকে জানা যাচ্ছে যে, এই ঘটনা যে সময়ে সংঘটিত হয়েছিল, সে সময় পর্যন্ত ইসলামের ঐসব শত্রুদের সাথে আল্লাহর রাসূলের সম্পর্কের তেমন অবনতি ঘটেনি, যতটা অবনতি ঘটলে তাদের সাথে সামাজিক মেলমেশার পথরুদ্ধ হয়ে যায়। ইতিহাসের এসব দিক সামনে রাখলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সূরা আবাসা ইসলামী আন্দোলনের শিশু অবস্থায় এবং মক্কায় প্রাথমিক দিকে অবতীর্ণ হয়েছিল, এতে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না।

সূরা আবাসা যেভাবে শুরু হয়েছে তা পাঠ করলে যেন মনে হয়, একজন দরিদ্র ও জন্মান্ধ কিন্তু সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তির তুলনায় আল্লাহর রাসূল তৎকালীন সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে অধিক গুরুত্ব দিচ্ছিলেন, এটা স্বয়ং আল্লাহর অপছন্দ হলো এবং তিনি এ কারণে তাঁর রাসূলকে সাবধান করছেন। কিন্তু প্রকৃত বিষয় শুধু এটা নয়, মহান আল্লাহর কাছে এবং তাঁর ফেরেশ্‌তাদের কাছে কোন শ্রেণীর মানুষের সম্মান ও মর্যাদা সর্বাধিক, ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র কোন শ্রেণীর নাগরিকদেরকে অধিক সম্মান ও মর্যদা প্রদান করবে, এই বিষয়টিই সূরা আবাসায় মানব জাতিকে অবগত করা হয়েছে।

মানুষদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হলেন আল্লাহর নবী ও রাসূলগণ। আবার নবী রাসূলদের মধ্যে মহান আল্লাহর কাছে সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হলেন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা এত অধিক সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন যে, অন্য কোন নবীর যেখানে পৌঁছানোর সৌভাগ্য হয়নি অর্থাৎ আল্লাহর আরশে–সেখানে তাঁকে ডেকে নিয়ে সম্মানীত করা হয়েছে। সেখানে কোন ধরনের মাধ্যম ছাড়াই স্বয়ং আল্লাহ তাঁর সাথে কথা বলেছেন। সমস্ত নবী-রাসূলদেরকে নাম ধরে আহ্বান করা হয়েছে, কিন্তু তাঁকে কখনো 'হে মুহাম্মাদ' বলে আহ্বান করা হয়নি বরং আহ্বান করা হয়েছে, নবী, রাসূল বা অন্যান্য গুণবাচক শব্দের মাধ্যমে। কদাচিৎ তাঁর মাধ্যমে আল্লাহর কোন অপছন্দনীয় কাজ সংঘটিত হলে আল্লাহ তাঁকে এভাবে ধমক দিয়ে বলেননি

যে, 'কেন তুমি এ কাজ করলে?' বরং বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন, কেন তুমি এমনটি করলে?'

যেমন সূরা তওবার ৪৩ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। কিছু সংখ্যক মানুষ তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার জন্য অজুহাত পেশ করলো আর আল্লাহর রাসূল তা মেনে নিয়ে তাদেরকে অব্যাহতি দিলেন। বিষয়টি আল্লাহ পছন্দ করলেন না এবং সাথে সাথে তাঁর প্রিয় রাসূলকে ধমকও দিলেন না, যেমন করে কোন মনিব তার অধিনস্থকে ধমক দেয়। রাসূলের কাছে কৈফিয়তও চাইলেন না, বরং মমতা আর পরম স্নেহবিজড়িত ভাষায় বললেন, 'আ'ফাল্লাহু আ'নকা' অর্থাৎ আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন, কেন আপনি তাদেরকে অব্যাহতি দিলেন?

অর্থাৎ এমন ভদ্রোচিত ভঙ্গিতে করুণা বিগলিত শব্দসমূহের মাধ্যমে তিনি তাঁর রাসূলকে তাঁর অপছন্দনীয় বিষয়টি অবগত করলেন– যে কোন পাঠকই তা পাঠ করার সাথে সাথেই অনুভব করতে সক্ষম হবে যে, রাসূলের দ্বারা সংঘটিত অপরাধ রাসূলের জানার পূর্বেই ক্ষমা করে দিয়ে তারপর তাঁকে অবগত করা হচ্ছে যে, আপনার দ্বারা যে কাজটি সংঘটিত হয়েছিল, তা ছিল আমার অপছন্দনীয়। ঠিক সূরা আবাসার শুরুটাও সেই ভঙ্গিতেই উপস্থাপন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'সে ভ্রুকুঞ্চিত করলো, মুখ ফিরিয়ে নিলো। কারণ তাঁর সামনে একজন অন্ধ ব্যক্তি এসে হাজির হলো।'

অর্থাৎ কথাটি এমনভাবে পরিবেশিত হয়নি যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটিকে দেখে ভ্রুকুঞ্চিত করলো এবং অনাগ্রহের সাথে মুখ ফিরিয়ে নিলো।' এভাবে যদি বলা হতো তাহলে সরাসরি নবীকে অভিযুক্ত করে সম্বোধন করা হতো। কিন্তু তা না করে তৃতীয় ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে যে পদ্ধতিতে বলা হয়, ঠিক তেমনিভাবে বলা হয়েছে। সরাসরি বললে নবীর মনে একটা বেদনা সৃষ্টি হতো পারতো, মহান আল্লাহ এটা পছন্দ করেননি যে, তাঁর নবী অন্তরে বেদনা অনুভব করুক। এ জন্য অসন্তুষ্টি ও তিরস্কারের যাবতীয় ভাষা ও প্রকাশ ভঙ্গি এড়িয়ে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় তাঁর অপছন্দের বিষয়টি নবীর কাছে এভাবে প্রকাশ করেছেন যে, হে নবী ! আপনি অবগত রয়েছেন কি, হয়ত সেই অন্ধ ব্যক্তি আপনার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করে তা নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করে আমার নৈকট্য লাভ করবে এবং সেটা তার জন্য কল্যাণকর হতো।

যে ব্যক্তি কল্যাণ লাভ করার উদগ্র কামনা নিয়ে আপনার কাছে এলো, অথচ কি আশ্চর্য আপনি তার প্রতি অমনোযোগী রইলেন! যে ব্যক্তি নিজের অন্তরের কালিমা

দূর করে সেখানে মহাসত্যের আলো প্রজ্জ্বলিত করতে চরম আগ্রহী হয়ে আপনার কাছে ছুটে এলো–তার দৃষ্টিশক্তি নেই, অথচ সে পথ হাতড়ে অতিকষ্টে আপনার কাছে পৌঁছেছিল সত্যের আলোয় আলোকিত হবার উদগ্র কামনা নিয়ে, তার প্রতি আপনি গুরুত্ব না দিয়ে গুরুত্ব দিলেন ঐসব লোকদের প্রতি, যারা ইসলামী আন্দোলনের চরম দুশমন! যারা মুখের ফুঁ দিয়ে আমার দ্বীনের প্রদীপ নির্বাপিত করার লক্ষ্যে সাম্ভাব্য যাবতীয় পথ অনুসন্ধান করে, তাদের প্রতি আপনি আগ্রহ পোষণ করলেন, আর এই লোকগুলোর কারণেই আপনি ঐ লোকটির প্রতি অনাগ্রহী হলেন, যে লোকটি মহাসত্যের পেয়ালা পান করার জন্য তৃষ্ণার্ত ছিল?

যারা আপনার দাওয়াত কবুল করতে আগ্রহী নয়, দৃষ্টি থাকার পরেও যাদের চোখে মহাসত্য উদ্ভাসিত হয় না, অন্তর যাদের কালিমা লিপ্ত, পৃথিবীর জীবনকেই যারা একমাত্র সত্য বলে বিবেচনা করে, যাদের কাছে পবিত্রতার কোন গুরুত্ব নেই, অপবিত্রতার মধ্যে ডুবে থাকতে যারা আগ্রহী, তারা যদি আপনার আহ্বানে সাড়া না দেয়, এতে আপনার ক্ষতি কি? তাদের অপরাধের কারণে তো আপনাকে অভিযুক্ত করা হবে না। আপনার কর্তব্য ছিল মহাসত্য তাদের কাছে পৌঁছে দেয়া, আপনি আপনার কর্তব্য পালন করেছেন, এখন তাদেরকে সেই অবস্থার ওপরে ছেড়ে দিন, যে অবস্থায় তারা রয়েছে। ঐসব ব্যক্তি ইসলাম কবুল করলে এবং তাদের কারণে ইসলামের সম্মান ও মর্যাদা সমুন্নত হবে, এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ আমার দ্বীন কারো মুখাপেক্ষী নয়। আমি এমন আলো আপনার প্রতি প্রেরণ করেছি, সে আলো নিজের পথ নিজেই করে নেবে। আপনি শুধু আপনার প্রতি অর্পিত দায়িত্ব আমার নির্দেশিত পথে পালন করে যান। আমার দ্বীনের প্রতি কেউ সমর্থন করুক আর না-ই করুক, এতে আমার দ্বীনের সম্মান ও মর্যাদার কোন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না।

সূরা আবাসায় ঐ লোকদের প্রতি চরম অসন্তোষ প্রকাশিত হয়েছে, যারা নিজেদেরকে সমাজ ও দেশের প্রথম শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে বিবেচনা করে, নিজেদেরকে এলিট শ্রেণী মনে করে। ধন-সম্পদ, অর্থ-বিত্ত আর প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে সাধারণ মানুষদেরকে যারা মানুষ হিসাবে মর্যাদা দেয় না, তাদেরকে যাবতীয় অধিকার বঞ্চিত বলে ধারণা করে, অহঙ্কারের আবরণে যাদের দৃষ্টি অন্ধ, সত্য যাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, এসব লোকদের প্রতি চরম ক্রোধ প্রকাশ করা হয়েছে। কারণ এই শ্রেণীর লোকেরাই সমাজ-দেশে তাদের কামনার সাথে সাম স্যশীল সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রসার ঘটায় এবং মহাসত্যের প্রচার-প্রসারে বাধার সৃষ্টি করে। এ কথা চিরসত্য যে, সমাজের উঁচু শ্রেণীর লোকজন যে আদর্শ অনুসরণ করে, সমাজের নীচু শ্রেণীর মধ্যে তা এমনিতেই প্রসার লাভ করে থাকে। আর এ

জন্যই যারা নতুন কোন আদর্শ প্রচার করে, তারা এ প্রচেষ্টা চালায় যে-সমাজের প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী লোকজন এই নতুন আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হোক, তাহলে এই আদর্শ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তৎকালীন সমাজের উঁচু শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে চিন্তা করতেন, ঐ লোকগুলো যদি কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শামিল হতো, তাহলে আল্লাহর দ্বীন অতি সহজেই বিজয়ী হতো। ইসলাম প্রচারের শুরুতে তিনি যে কর্ম-পদ্ধতি অনুসরণ করতেন, তার সবটুকুই নিবেদিত ছিল আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে। এর ভেতরে এমন কোন দিক ছিল না, যার মাধ্যমে সমাজের সাধারণ শ্রেণীর লোকদের প্রতি সামান্যতম অবহেলা প্রদর্শন করা হতো। তবুও আন্দোলনের শুরুতে কর্মনীতি ও পদ্ধতির মধ্যে যেটুকু দুর্বলতা বিদ্যমান ছিল, সেই দুর্বলতার প্রতি সূরা আবাসায় অঙ্গুলী সংকেত করে তা দূর করা হয়েছে। সমাজের উঁচু শ্রেণীর লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হচ্ছিলো, যেখানে ব্যক্তি স্বার্থের নাম-গন্ধও ছিল না, সেখানে একজন দরিদ্র আর অন্ধ লোকের প্রতি অমনোযোগ প্রকাশ পেলো, এটাও দুর্বলতা হিসাবে চিহ্নিত করে তা দূর করে দেয়া হলো।

কারণ এ কথা স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়া হলো, মহান আল্লাহর কাছে ঐ ব্যক্তিই সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী, যে ব্যক্তি সত্যানুসন্ধিৎসু এবং মহাসত্যের আদর্শ অনুসারে নিজের জীবন পরিচালিত করে। সে ব্যক্তি অন্ধ বা দৃষ্টিমান হোক অথবা ধনী বা গরীব হোক, এতে তার ইসলাম প্রদত্ত মর্যাদার কোন তারতম্য হবে না। দ্বীনি আন্দোলন তাদের কাছেই ইসলামের দাওয়াত পেশ করবে, যারা সত্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। হতে পারে সে ব্যক্তি সমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন, অক্ষম-দুর্বল, হতদরিদ্র। আর যারা বড় বড় ডিগ্রী অর্জন করেছে, অতুল বৈভবের অধিকারী, অর্থের পাহাড় গড়ে তার উচ্চ শিখরে বসে রয়েছে, সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে যারা অতুলনীয় কিন্তু সত্য বিমুখ, তার প্রতিপালক মহান আল্লাহকে চেনা ও জানার সামান্যতম আগ্রহ অন্তরে নেই, ইসলামকে মৌলবাদ, সেকেলে, মধ্যযুগীয় বলে উপহাস করে, মহান আল্লাহর কাছে মাছির একটা তুচ্ছ পাখার যে গুরুত্ব রয়েছে, এসব লোকদের প্রতি তা নেই। দ্বীনি আন্দোলনের দৃষ্টিতে এসব লোকদের কোনই গুরুত্ব নেই।

আবু জেহেল, রাবিয়ার দুই পুত্র উতবা, শাইবা, উমাইয়া ইবনে খাল্ফ, ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা প্রমুখদের অঢেল ধন-সম্পদ ছিল, কারো দেহে কোন ত্রুটি ছিল না, দৈহিক সৌন্দর্য ছিল, প্রখর দৃষ্টিশক্তি ছিল। সমাজে তারা উঁচু শ্রেণী হিসাবে

সম্মান-মর্যাদা ভোগ করতো। তাদের ইশারায় বিশাল বাহিনী যে কোন যুদ্ধ ক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তো। সব দিক দিয়েই তারা পূর্ণ ছিল–ছিল না কেবল সত্যকে দেখার মতো স্বচ্ছ দৃষ্টিশক্তি আর মহাসত্যকে গ্রহণ করার মতো সত্যানুসন্ধিৎসু মন-মস্তিষ্ক। আর জন্মান্ধ ইবনে মাকতুম! তৎকালীন সমাজের উঁচু শ্রেণীর তুলনায় তাঁর কিছু না থাকলেও এমন সম্পদ তাঁর ছিল, যার মাধ্যমে তিনি মহাসত্য গ্রহণ করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে চিরদিনে জন্য অতুলনীয় সম্মান আর মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন।

ইতিহাস কথা বলে, পারস্যের বাতিল শক্তি যখন ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য হুমকী হয়ে দেখা দিল তখন দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু পারস্য শক্তিকে সমুচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী পারস্য সীমান্তে প্রেরণ করলেন। এই বাহিনীতে আল্লাহর রাসূলের জন্মান্ধ সাহাবী হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু শামিল ছিলেন। তিনি মুসলিম বাহিনীর পতাকা বাহকের দায়িত্ব গ্রহণ করে বলেছিলেন, 'হয় ইসলামের পতাকা সমুন্নত রাখবো আর না হয় শাহাদাতবরণ করবো।'

তিন দিনের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর মুসলিম বাহিনী বিজয়ী হলো। পারস্যে ইসলামের বিজয় কেতন স্বগৌরবে উড়তে থাকলো। যুদ্ধের ময়দানে শহীদদের লাশ দাফন করার সময় দেখা গেল, ইবনে মাকতুমের দেহ রক্ত-রঞ্জিত। ইসলাম বিরোধী শক্তির তরবারীর আঘাতে তার গোটা দেহ ক্ষত-বিক্ষত। শাহাদাতের শারাবান তহুরা তিনি পান করেছেন, দেহ স্পন্দনহীন কিন্তু ইসলামের পতাকা তিনি রক্তাক্ত বুকে আঁকড়ে ধরে আছেন। তাওহীদের পতাকা বুকে জড়িয়েই তিনি শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেছেন। মাতৃগর্ভ থেকে এই সুন্দর শ্যামল বসুন্ধরায় তিনি দৃষ্টিশক্তি নিয়ে আসতে পারেননি। সক্ষম হননি তিনি প্রকৃতির অপরূপ মনোমুগ্ধকর হৃদয়গ্রাহী চিত্তাকর্ষক নয়নাভিরাম দৃশ্য অবলোকন করতে। বঞ্চিত ছিলেন তিনি পূর্ণিমার পূর্ণ শশধরের উজ্জ্বল কিরণচ্ছটা দর্শনে। তিমিরাবৃত যামীনির ভ্রমর কৃষ্ণ সূচিভেদ্য আরণ ভেদ করে তরুণ তপন উদিত হয়ে তার কিরণচ্ছটা দুর্বাঘাসে পতিত শিশির বিন্দুগুলোকে কিভাবে মুক্তার মতই ঝলমলিয়ে তোলে–এ দৃশ্য প্রাণভরে অবলোকন করার পার্থিব সৌভাগ্য যদিও তাঁর হয়নি। কিন্তু তিনি এমন এক আলোর সন্ধান লাভ করেছিলেন, যে আলো তাঁর অন্ধ দৃষ্টিকে পদ্মলোচনে পরিণত করেছিল।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অবদান—তাঁর হৃদয় পদ্মলোচনের প্রভাময় আলোকচ্ছটা শুভ্র মেঘমালা অতিক্রম করে ঐ দূর নীলিমা ভেদ করে এমন এক জান্নাতী জগতে পৌঁছেছিল, যেখান থেকে তিনি লাভ করেছিলেন মহাসত্যের সন্ধান। পৃথিবীর ক্ষয়িষ্ণু সৌন্দর্য দর্শনে তিনি বঞ্চিত থাকলেও ইসলামের অন্তর্নিহিত অপরূপ চিরস্থায়ী সৌন্দর্য রাশি তিনি প্রাণভরে দর্শন করেছেন। এ কারণেই আল্লাহর পথে প্রাণ দেয়ায় অন্ধত্ব তাঁর জন্য কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। অন্তরের সুতীক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি দিয়ে শাহাদাতের জান্নাতী মাধুরীময় রূপের দ্যুতি তাঁকে জিহাদের উত্তপ্ত ময়দানে পথপ্রদর্শন করেছে। পার্থিব যাবতীয় সমস্যাকে যারা গুরুত্বহীন মনে করে শুধুমাত্র তাদের পক্ষেই সম্ভব আল্লাহর পথে জীবন বিলিয়ে দিয়ে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করা। সুতরাং যেসব অহঙ্কারী দাম্ভিক ব্যক্তিরা মনে করে যে, ইসলামী আন্দোলন তাদের সাহায্য-সহযোগিতার ওপরে নির্ভরশীল, এই আন্দোলন তাদের মুখাপেক্ষী, তারা শামিল না হলে বা সাহায্য সহযোগিতার হাত গুটিয়ে নিলে এই আন্দোলন মুখ থুবড়ে পড়বে, ইসলামকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে তাদের কাছে সাহায্যের জন্য যাওয়া ইসলামকে অপমান করার শামিল।

সূরা আবাসার ১৭ আয়াত থেকে শেষ পর্যায় পর্যন্ত ঐসব লোকদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তোমরা অস্তিত্বহীন ছিলে, সেখান থেকে তোমাদেরকে আমি অস্তিত্ব দান করেছি। এই পৃথিবীতে তোমাদের জন্য আমি অসংখ্য নেয়ামত দিয়েছি। তোমাদের পশু সম্পদকে টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা আমিই করেছি। অথচ তোমরা আমার দেয়া বিধানের মোকাবেলায় বিদ্রোহ করে ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে অবৈধ পথে সুখের উপকরণ যোগাড়ে ব্যস্ত রয়েছো। যাদের জন্য এসব করছো, কিয়ামতের দিনে মহাবিপদ অবলোকন করে সেই আপনজনদের কাছ থেকে ছুটে পালাতে থাকবে। সেদিন তোমার নিজের কথা ব্যতীত আর কারো কথা মনেও থাকবে না। পৃথিবীতে যারা আমার বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করেছে, সেদিন তাদের চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল থাকবে। আর তোমরা যারা আমার বিধানের বিপরীত জীবন পরিচালিত করেছো, তোমাদের চেহারা থাকবে অন্ধকারে আবৃত। সেদিন তোমাদের চেহারাই তোমাদের আল্লাহর বিধান বিরোধী হওয়ার পরিচিতি তুলে ধরবে।

ইসলামী আন্দোলনের এই জন্মান্ধ মুজাহিদ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমের উপলক্ষে আল কোরআনের মোট ষোলটি আয়াত অবতীর্ণ হয়। যাঁকে উপলক্ষ্য করে আরশে আযীমের অধিপতি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সাইয়েদেনা

জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামকে ওহীসহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে পাঠিয়েছেন , যাঁর সম্পর্কে আসমানে আরশে আযিমে আলোচনা করা হলো– তাঁর কি বিরাট মর্যাদা! এজন্য সূরা আবাসা অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উম্মে মাকতুমকে বিশষ মর্যাদার চোখে দেখতেন। অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামও উম্মে মাকতুমকে অত্যন্ত সম্মান করতেন।

আন্দোলনের রক্ত ঝরা ময়দানে তাঁকে বিভিন্ন মুখী নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। অবশেষে সমস্ত সহায় সম্পদ ত্যাগ করে মদীনায় হিযরত করেন। তিনি মদীনার বাড়ি বাড়ি গিয়ে ইসলামের বিপ্লবী আহ্বান পৌছিয়ে মদীনায় ইসলামী বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। আল্লাহর রাসূল মদীনায় হিযরত করে হযরত বেলাল ও উম্মে ইবনে মাকতুমকে ইসলামের মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করেন। তাঁরা তাওহীদের বিপ্লবী আওয়াজ উচ্চ কণ্ঠে দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে দিতে থাকেন। মুয়াজ্জিনুর রাসূল উম্মে মাকতুম কখনো আযান দিতেন আর হযরত বেলাল ইকামাত দিতেন। আবার কখনো বেলাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আযান দিতেন উম্মে ইবনে মাকতুম ইকামাত দিতেন। রমজান মাসে তাঁরা অতিরিক্ত একটি কাজ করতেন। হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর আযান শুনে লোকেরা সেহরী খাওয়া শুরু করতেন। উম্মে ইবনে মাকতুম সুবহে সাদিকের অপেক্ষায় বসে থাকতেন। তাঁর আযান শুনে লোকজন আহার বন্ধ করতেন।

যুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যাপারে অন্ধত্ব ছিলো প্রতিবন্ধকতা। ফলে তাঁর হৃদয় অব্যক্ত এক বেদনায় থাকতো ভারাক্রান্ত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মনে অবস্থা অনুভব করে তাঁকে নিজের অনুপস্থিতিতে মসজিদে নববীর ইমাম নিযুক্ত করতেন। আল্লাহর রাসূল যাঁকে মসজিদে নববীর ইমাম নিযুক্ত করেন তাঁর কত বিশাল মর্যাদা তা ভাষায় বর্ণনা করা যাবেনা। ঘরে অবস্থানকারী ও জিহাদে অংশগ্রহণকারীর মর্যাদার মধ্য যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে, এ সম্পর্কিত আয়াত যখন নাযিল হলো, তখন উম্মে ইবনে মাখতুম অস্থির হয়ে আল্লাহর নবীর কাছে আবেদন জানালেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি অন্ধত্বের কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারিনা।'

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর অক্ষম বান্দাদের সম্পর্কে মহাগ্রন্থ আল কোরআনে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন, 'যারা শারীরিক অক্ষমতার কারণে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম নয়, তাদেরকে আল্লাহ যুদ্ধের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি দিয়েছেন।' কোরআনের ফয়সালা জানার পরেও উম্মে ইবনে মাকতুমের শাহাদাতের আকাংখা শিথিল হলো না। তিনি অন্ধ হয়েও বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন এবং সেনা

অফিসারদের বলতেন, 'আমার হাতে পতাকা ধরিয়ে দিয়ে উভয় পক্ষের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দাও। আমি অন্ধ, পালিয়ে যাবোনা।'

হাফেজে কোরআন উম্মে ইবনে মাকতুম দৃষ্টি শক্তি না থাকার কারণে অতি কষ্টে পথ অতিক্রম করে মসজিদে নববীতে এসে জামায়াতে নামজ আদায় করেছেন। একবার তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাকে মসজিদে আনা-নেয়ার তেমন কোন লোক নেই, মসজিদে আসার পথে আমার কষ্ট হয়। আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি ঘরে নামাজ আদায় করতে করি।'

আল্লাহর রাসূল বললেন, 'তোমার ঘর থেকে আযান ইকামাত শোন কি?' তিনি বললেন, 'জ্বি, শোনা যায়।'

আল্লাহর নবী বললেন, 'তাহলে তোমাকে আমি ঘরে নামাজ আদায় করার অনুমতি দিতে পারি না।'

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর খেলাফতের সময় তাঁকে মসজিদে আনা নেয়ার জন্য একজন লোক নিযুক্ত করা হয়। দৃষ্টি শক্তি না থাকার যে কি মর্মবেদনা, তা যাদের নেই তারাই অনুভব করতে পারে। জন্মান্ধ হওয়ার অজুহাত দেখিয়ে হযরত উম্মে ইবনে মাকতুম নামাজের জামায়াত ত্যাগ করেননি বা সে অনুমতি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেননি। জামায়াতে নামাজের যে কি বিরাট গুরুত্ব তা আল্লাহর রাসূলের মন্তব্য থেকে জানা যায়। তিনি সে সমস্ত মানুষদের ঘর-বাড়ি আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছেন, যারা মসজিদ ছেড়ে জামায়াত ত্যাগ করে বাড়িতে নামাজ আদায় করে। আল্লাহর নবী জামায়াতে নামাজ আদায়ের এত গুরুত্ব কেন দিয়েছেন তা শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আল্লামা মওদূদী (রহঃ) তাঁর নামাজ রোজার হাকিকত নামক বইতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন।

আদর্শের অগ্নি শিখা চির অনির্বান

বদরের প্রান্তর। পবিত্র রমজান মাসের ১৭ তারিখ। হক বাতিলের প্রথম যুদ্ধ। মক্কার বাতিল শক্তি আনন্দে আত্মহারা। মুসলমানদের তুলনায় তাদের সৈন্য সংখ্যা ও অস্ত্র অধিক। তাদের ধারণা, যুদ্ধের সূচনাতেই মুসলিম সৈন্যরা তৃণ খন্ডের মত উড়ে যাবে। মুসলমানদের একটি প্রাণীকেও তারা আজ বদরের প্রান্তর থেকে জীবিত ফিরতে দিবেনা। আজই তারা ইসলামকে চিরতরে বিদায় করে দিবে। বাতিল শক্তির যুদ্ধ শিবিরে এ জন্য আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে।

তাওহীদের মুজাহিদ বাহিনীর যুদ্ধ শিবির। প্রতিপক্ষের তুলনায় তাদের সৈন্য সংখ্যা একবারেই নগন্য। প্রতিপক্ষের অস্ত্রের তুলনায় তাঁদের অস্ত্র শক্তি উল্লেখযোগ্য নয়। প্রত্যেক সৈন্যের কাছে অস্ত্রও নেই। তবুও তাঁদের মধ্যে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যাচ্ছে। কারণ, তাঁদের যুদ্ধ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। তাঁরা মরলে শহীদ আর বাঁচলে গাজী। তাঁদের আনন্দের সবথেকে বড় কারণ হলো, স্বয়ং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের সিপাহসালার। এ জন্য সবার চোখে শাহাদাতের অদম্য নেশা। তাঁরা যুদ্ধে এসেছে বাতিল শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েম করার জন্য। মানুষকে মানুষের বানানো মনগড়া মতবাদ তথা আইন-কানুনের জিঞ্জির থেকে মুক্ত করে আল্লাহর রঙে রঙিন করার জন্য। তাঁরা বদরের প্রান্তরে একমাত্র আল্লাহর সাহায্যের উপরে নির্ভর করে যুদ্ধ করতে এসেছে।

যুদ্ধের আয়োজন সম্পন্ন। গভীর রজনী। চারদিকের পরিবেশ নীরব-নিস্তব্ধ- সকলেই সুসুপ্তিতে নিমগ্ন। পূর্ব গগনে তরুণ তপন উদিত হয়ে তার কিরণচ্ছটা বদরের প্রান্তর আলোকিত করার সাথে সাথেই রণ দামাম ভয়ংকর শব্দে বেজে উঠবে। আল্লাহর নবী ঘুমাননি। তিনি সিজদায় নিপতিত। অশ্রু ধারায় সিজদার স্থান ভিজিয়ে মহান আল্লাহর আবেদন করছেন, 'রাব্বুল আলামীন! আমার পক্ষে যতটুকু শক্তি সঞ্চয় করা সম্ভব ছিলো, আমি তা-ই নিয়ে বাতিলের মুকাবেলা করার জন্য এসেছি। আমি দুনিয়ার কোন শক্তির ওপর নির্ভর করে এখানে আসিনি। একমাত্র তোমার ওপর নির্ভর করে এসেছি। আজ তুমি তোমার অঙ্গীকার পূর্ণ কর। রাব্বুল আলামিন! তুমি সাহায্য না কর, তাহলে তোমরা তাওহীদের এই সামান্য কায়েকজন সৈনিক আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর এরা যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তাহলে তোমার নাম নেয়ার মত এই যমীনে আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। হে আল্লাহ! তুমি ইসলামের এই বাহিনীকে সাহায্য কর।'

ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে বদরের রণক্ষেত্রে যুদ্ধাস্ত্রসমূহ রক্ত পিপাসায় লোলুপ জিহ্বা বিস্তার করলো। রণ-দূনধূভী একটানা আর্তনাদ করে প্রতিপক্ষের সৈন্যদের হৃদয়ে ত্রাস সৃষ্টি করছে। মুসলিম মুজাহিদদের 'আল্লাহু আকবর' গর্জনে আতঙ্কে বাতিল শক্তির কলিজার রক্ত হীম হয়ে যাচ্ছে। তাঁদের ঘোড়াগুলো বাতিল শক্তির রণবুহ্য ভেদ করে তীর বেগে ছুটে বেড়াচ্ছে। আল্লাহর প্রত্যক্ষ সাহায্যে মুসলিম মুজাহিদদের প্রত্যেকটি অস্ত্র অগণিত অস্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করেছে। আল্লাহর পথের এক বিপ্লবী মুজাহিদ শশব্যস্তে ছুটে এলেন যুদ্ধের সিপাহসালার বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে। মনে তাঁর আক্ষেপ, বাতিল শক্তির সাথে

প্রথম যুদ্ধে তিনি অস্ত্রের অভাবে অংশগ্রহণ করতে পারছেন না। অনুনয়ের স্বরে তিনি আল্লাহর রাসূলের কাছে আবেদন করলেন, 'ইয়া রাসূল্লাহ! আমাকে একটি অস্ত্রের ব্যবস্থা করে দিন– ইসলামের দুশমনদের সাথে যুদ্ধ করবো। সবাই যুদ্ধ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করবে আর আমি সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হবো, তাহতে পারেনা। আমাকে অস্ত্রের ব্যবস্থা করে দিন।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পথের এই মুজাহিদের প্রাণে ব্যাকুলতা দেখে মুখে জান্নাতি হাসি টেনে বললেন, 'আমার কাছে তো কোন অস্ত্র নেই। যা ছিল সবই দিয়ে দিয়েছি।'

রক্ত পিচ্ছিল পথের অকুতোভয় এই যাত্রী এদিক-ওদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। দেখলেন খেজুর গাছের একটি শুস্ক শাখা পড়ে রয়েছে। তিনি আল্লাহর রাসূলকে অনুরোধ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার পবিত্র হাত দিয়ে ঐ খেজুর গাছের শুস্ক শাখাটিই আমার হাতে উঠিয়ে দিন। আমি ওটা দিয়েই আল্লাহর দুশনদের ওপরে আঘাত হানবো।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাতে খেজুরের শুষ্ক শাখাটি সাহাবীর হাতে তুলে দিলেন। আল্লাহর পথের সৈনিক যখন 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর' মুখে উচ্চারণ করে শুকনো খেজুরের শাখা দিয়ে দুশমনের দেহে আঘাত করেছেন, তখন তরবারী দিয়ে আঘাত করলে যা হয় তা-ই হয়ে গেল।

হযরত আবু উবাইদা উল্কার বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে বাতিল শক্তির ওপরে এমনভাবে আঘাত হানছেন, তাঁর আঘাতে দুশমনদের প্রতিরক্ষা বুহ্য ভেঙ্গে তছনছ হয়ে পড়েছে। তিনি ক্রমাগত তীব্র আক্রমন করে শত্রু বাহিনীর মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করেছেন। প্রতিপক্ষ আবু উবাইদার হামলা থেকে বাঁচার জন্য এমন এক কৌশল অবলম্বন করলো, ফলে তিনি ঈমান রক্ষার ভয়ঙ্কর পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন। বাতিল শক্তির সাথে যুদ্ধরত আবু উবাইদার পিতাকে ইসলামের দুশমনরা তাঁর সামনে এনে বারবার দাঁড় করিয়ে দিতে লাগলো। পিতা যদিও ইসলাম কবুল করেননি, তবুও তো জন্মদাতা পিতা। আবু উবাইদা যখনই ইসলামের শত্রুদের ওপরে আক্রমন করার জন্যে শত্রু বাহিনীর দিকে ছুটে যাচ্ছেন, তখনই তাঁর পিতা এসে শত্রু সৈন্য ও তাঁর মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। আবু উবাইদা এক মহাপরীক্ষার সম্মুখীন হলেন।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে তিনি ইসলাম কবুল করে কাফিরদের লোমহর্ষক নির্যাতনের মুখেও নীজ আদর্শের ওপরে অবিচল-অটল ছিলেন। যে কোন পরীক্ষায়

তিনি ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু আজ বদরের প্রান্তরে সবথেকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়েছে। একদিকে ঈমান রক্ষা, অপরদিকে তাঁর পিতার জীবন রক্ষা। আল্লাহর দুশমন পিতাকে যদি তিনি আঘাত না করেন, তাহলে তাওহীদের বাহিনী বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। অপরদিকে আপন জন্মদাতা পিতাকে নিজ হাতে হত্যা করার কথা তো কল্পনাও করা যায়না!

পিতা চাচ্ছেন দুনিয়ার যমীন থেকে ইসলামের প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে শিরক্, বাতিল ও পৌত্তলিকতার প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত রাখতে। পৃথিবীর বুক থেকে তাওহীদের আওয়াজ চীরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্যই ইসলামের বিপরীত আদর্শে বিশ্বাসী পিতা তাওহীদের পাতাকাবাহী আবু উবাইদার সামনে আগমন করে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। আল কোরআনের বিপ্লবী সৈনিক আবু উবাইদার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা– আল্লাহর যমীনে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েম করে পৃথিবী থেকে যে কোন ধরনের শোষণ-নিষ্পেষণ ও জুলুমের অবসান ঘটাতে। আর তাঁর পিতার প্রচেষ্টা, মানুষের মন-মস্তিষ্ক প্রসূত চিন্তাধারা, মতবাদ-মতাদর্শের নিষ্পেষণে আর্ত মানবতার করুণ আর্তনাদকে পদদলিত করে পৃথিবীতে শোষকের বিজয় কেতন উড়াতে। অথচ তারই পুত্র আবু উবাইদা চেষ্টা-সংগ্রাম করছেন, পৃথিবীর মানুষকে আল্লাহর রঙে রঙিন করে জান্নাতের দিকে অগ্রসর করাতে। আর তাঁরই পিতা চেষ্টা করছে, পৃথিবীর মানুষের কণ্ঠে পৌত্তলিকতার কালো ঘৃণ্য জিঞ্জির লাগিয়ে ধ্বংসের অতল গহ্বর জাহান্নামের শেষ স্তরে নিক্ষেপ করতে।

হযরত আবু উবাইয়দা জীবনের সবথেকে কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এবার যদি পিতা এসে তাঁর সম্মুখে যুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাহলে সেই পিতারূপী আল্লাহর দুশমন, কুফুরী শক্তির প্রতিমূর্তি শোষকের প্রতিচ্ছবি পিতার প্রতি আর অনুকম্পা প্রদর্শন করবেন না। তিনি যদি তাঁর পিতাকে এই অবস্থা সৃষ্টি করার সুযোগ দিয়ে ইসলামের বিপর্যয় ডেকে আনেন, তাহলে আদালতে আখিরাতে আল্লাহ যখন প্রশ্ন করবেন, 'আবু উবাইদা! আমার ইসলামের তুলনায় কি তোমার পিতা তোমার কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল?'

আল্লাহর এই প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর দেয়া যাবেনা। পরিশেষে জাহান্নামে যেতে হবে। হযরত আবু উবাইদা আল্লাহু আকবর গর্জন করে উল্কার গতিতে যুদ্ধের ময়দানে এগিয়ে গেলেন। তাঁর পিতাও পুনরায় সামনে এসে তাকে কাফিরদের প্রতি হামলা করা থেকে বিরত রাখার জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলেন। মুহূর্তে আবু উবাইদা তরবারীর আঘাতে পিতার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। তিনি

প্রমাণ করলেন, বাতিল শক্তির প্রতিভূ সে যে-ই হোক না কেন, যত প্রিয়জনই হোক না কেন, তার সাথে ইসলামী আদর্শের মোকবেলায় কোন আপোষ নেই। বদরের প্রান্তরে সেদিন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুও তাঁর আপন মামাকে নিজ হাতে হত্যাত্র করে আদর্শের উজ্বল শিখা চির অনির্বাণ করেন।

হযরত আবু উবাইদাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং তাঁর পিতার মধ্যের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মহান আরশে আযীমের অধিপতি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন খুশী হয়ে কোরআনের সূরা আল মুজাদিলার আয়াত অবতীর্ণ করেন–

لَاتَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْا اٰبَاۤءَهُمْ اَوْ اَبْنَاۤءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ

তোমার কখনো এমনটি দেখতে পাবে না যে, আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী লোকেরা কখনো তাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে, যারা আল্লাহ এবং রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। তারা তাদের পিতাই হোক বা আত্মীয়-স্বজন হোক। (সূরা মুজাদিলা-২২)

হযরত আবু উবাইদা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে 'আমীনুল উম্মাত' বলা হতো। ওহূদের যুদ্ধে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথায় বর্মের কড়া প্রবেশ করলে তা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু খুলতে গেলে আবু উবাইদা তাঁকে বাধা দিয়ে বলেন, 'আল্লাহর শপথং আমাকে খুলতে দিন।'

তিনি প্রথমে হস্ত দ্বারা কড়াটি উঠানোর চিন্তা করলেন। পরক্ষণেই ভাবলেন, এভাবে হাত দিয়ে উঠানোর সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি ব্যথা পান! তখন তিনি লোহার কড়া দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে খুলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যাথা মুক্ত করেন। তিনি যখন দাঁত দিয়ে কড়া খুলতে চেষ্টা করেন তখন তাঁর সামনের দাঁতও ভেঙ্গে যায়।

নাজ্জাশীর দরবার থেকে মূতার প্রান্তরে

ইসলামী আন্দোলনের সংগ্রাম মুখর ইতিহাসে পরিলক্ষিত হয় যুবকদের অবদানই সবথেকে বেশি। যুবকরা যেহেতু আর্তমানবতার দুঃখ-দুর্দশা চোখের সামনে দেখলে তাদের ধমনীর রক্ত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মানুষকে এই অবস্থা থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে। তারা সমাজ থেকে যাবতীয় অভাব-অনটন, জুলুম-অত্যাচারের মূলোৎপাটন করার

জন্য পুরাতন সমাজ ভেঙ্গে এমন একটি আদর্শ দিয়ে নতুন সমাজ গড়তে চায়, যে সমাজে থাকবে না কোন ধরনের অনিয়ম-অব্যবস্থা। আর ইসলামই যেহেতু এমন একটি কালজয়ী আদর্শ, যে আদর্শই সক্ষম একটি নিরাপত্তা পূর্ণ, ভীতিহীন-শোষণমুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধশালী সমাজ গড়তে। এ জন্য ইসলামের ইতিহাসের প্রতিটি বাঁকে যুবকদের ভীড়ই সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও যুবকদেরকে অধিক ভালবাসতেন।

ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে সংঘটিত একটি ঘটনায় দেখা যায়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআনের বিভিন্ন নীতিমালা সাহাবায়ে কেরামদের সমাবেশে বর্ণনা করছেন। সবাই পিন-পতন নিরবতার মধ্য দিয়ে আল্লাহর নবীর কথা শুনছেন। আল্লাহর রাসূল দেখলেন, যুবক সাহাবী হযরত জারির রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বসার জায়গা পাননি। তিনি দাঁড়িয়ে প্রিয় নবীর বক্তৃতা শুনছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে লক্ষ্য করে স্নেহ জড়িত কণ্ঠে মমতার সাথে বললেন, 'জারির তুমি দাঁড়িয়ে আছো কেন, আমার চাদরের ওপরে বসো।' একথা বলে তিনি তাঁর নিজের পবিত্র চাদরটি হযরত জারির রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর দিকে ছুড়ে দিলেন।

ইসলামের মর্দে মুজাহিদ যুবক সাহাবী আল্লাহর নবীর চাদরটি হাত দিয়ে লুফে নিয়ে চাদরে চুমো দিতে লাগলেন। চোখ দুটো অশ্রুয় পূর্ণ হয়ে গেলা, অশ্রু ধারায় গোলাপী গন্ডদ্বয় ভিজে উঠলো। কান্নারুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বললেন, 'আকরামাকুমুল্লাহ, কামা আকরাম তানি ইয়া রাসূলাল্লাহ।' হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনার সম্মান-মর্যাদা অধিক বৃদ্ধি করে দিন। আপনি আমাকে সম্মানিত করেছেন। আমি কি পারি আপনার চাদরে বসতে! আপনার কত বড় মর্যাদা!' এ কথা বলে তিনি নবীর চাদর বুকের সাথে গভীর মমতায় জড়িয়ে ধরলেন।

এ ঘটনা থেকে দেখা যায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবকদের সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। কারণ, যুবকরাই আন্দোলনের রক্তঝরা ময়দানে বাতিলের রক্ত চক্ষু উপক্ষে করে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করতে সক্ষম। এমনই ধরনের এক অমিত তেজী যুবক জাফর ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। সদ্য বিবাহিত যুবক ইসলামী আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে বাতিল শক্তির অকথ্য নির্যাতন সহ্য করে যাচ্ছেন, তবুও এই নব-দম্পত্তির মনে কোন কষ্ট নেই। কষ্ট মাত্র একটিই, আর তাহলো তাঁরা স্বাধীনভাবে মহান আল্লাহর দাসত্ব করতে পারছেন না। প্রাণভরে, স্বাধীনভাবে মুক্ত মনে আল্লাহর আইন মেনে চলার জন্য তাঁরা একটি সুন্দর

পরিবেশের আকাংখা করেন। আকাংখা করেন এমন একটি ভূ-খন্ড– যেখানে কোন শক্তি আল্লাহর আইন পালনে বাধার সৃষ্টি করবে না।

হযরত জাফর, তাঁর স্ত্রী এবং কিছু সংখ্যক মুসলিম নারী-পুরুষসহ আল্লাহর নবীর কাছে আগমন করে হাবশায় হিজরত করার অনুমতি কামনা করলেন। তাঁরা শুনেছিলেন, হাবশার শাসক নাজ্জাশী অত্যন্ত ন্যায়-পরায়ণ শাসক। সেখানে হিজরত করলে শঙ্কাহীন চিত্তে স্বাধীনভাবে আল্লাহর দাসত্ব করতে পারবেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত ব্যথা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অশ্রু-সজল নেত্রে তাঁদেরকে হিজরতের অনুমতি দিলেন। তাঁরা যখন হাবশার উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাসূলের সামনে থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বুকের ভেতরটা নাড়া দিয়ে উঠলো। তিনি তাঁদের গমন পথের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তাঁরই আনিত আদর্শ গ্রহণ করে এই মানুষগুলো যাবতীয় সৎগুণাবলীর অধিকারী হয়ে সমাজের সর্বোৎকৃষ্ট মানুষে পরিণত হয়েছেন। ইসলামী আদর্শের অনুপম মাধুর্যে এই উৎপীড়িত মানুষগুলো আপন প্রভায় চির উজ্জল। আল্লাহর প্রেমে যাঁদের হৃদয়-কন্দর পরিপূর্ণ। সৎগুণাবলীর মাপকাঠিতে যাঁরা সাফল্যের উচ্চ শিখরে সমাসীন।

তাঁদের অপরাধ কি? কেন তাঁরা আজ লাঞ্ছিত, অবহেলিত, প্রবঞ্চিত, অপামিনত, অত্যাচারিত হচ্ছে? তাঁদের অপরাধ তো মাত্র একটি। তারা বলে, 'আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক, আমরা একমাত্র তাঁর বিধান ব্যতীত অন্য কোন বিধান অনুসরণ করবো না। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের একমাত্র অনুসরণীয় নেতা। কোরআন আমাদের সংবিধান।'

এই অপরাধেই তাঁদের আজকে দেশের অতুল বৈভব-সম্পদ রাশি ত্যাগ করে নিঃস্ব অবস্থায় ভিন দেশে অচেনা-অজানা জায়গায় চলে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে। আর তিনি (আল্লাহর রাসূল) এই মযলুম মানুষগুলোর জন্যে এখন কিছুই করতে পারছেন না। মনের মনি কোঠায় এসব প্রশ্নের উদয় হতেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ শ্বাস ছাড়লেন। সে দীর্ঘ শ্বাস বোধহয় অত্যাচারী বাতিল শক্তির তখ্‌তে-তাউশের ভিত্তিমূলে গিয়ে আঘাত করলো। ফলে কয়েক বছরের ব্যবধানে আল্লাহদ্রোহী বাতিল শক্তি মক্কা থেকে চিরতরে লাঞ্চিতাবস্থায় বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য হলো।

শৈশব-কৈশর ও যৌবনের প্রিয় চারণভূমি ত্যাগ করে তাঁরা হাবশায় বাদশাহ নাজ্জাশীর দরবারে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁরা ন্যায়-নিষ্ঠ সত্য পরায়ণ বাদশাহ

নাজ্জাশীর দরবারে সম্মানের সাথে সমাদৃত হলেন। কোরআনের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়ার পর এই প্রথম বারের মত তাঁরা নিঃশঙ্ক চিত্তে আল্লাহর দাসত্বের অনুপম মাধুর্য অনুভব করলেন। স্বাধীনভাবে আল্লাহর আইন পালন করার মধ্যে কি যে আনন্দ! কি যে তৃপ্তি তা উপভোগকারীই অনুভব করতে পারে। ইসলামী আইন স্বাধীনভাবে অনুশীলনের মধ্যে হৃদয়ের আকাশে যে জান্নাতী আবেশের সৃষ্টি হয়, জান্নাতী বিমলের যে সুবাস স্পর্শ করে, তা উপভোগকারী ব্যতীত অন্য কেউ অনুভব করতে পারে না। এদিকে ইসলামী আন্দোলনের দুশমনরা সংবাদ পেয়ে গেল মুসলমানরা হাবশায় গিয়ে নাজ্জাশীর দরবারে সম্মান-মর্যাদার সাথে সমাদৃত হয়েছে। সে আশ্রয় থেকে মুসলমানদের বঞ্চিত করার লক্ষ্যে শুরু হলো মক্কায় ষড়যন্ত্র। তারা মুসলমানদের এই দলটিকে হত্যা অথবা মক্কায় ফিরিয়ে এনে কঠোর নির্যাতন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো।

এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হযরত উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন, 'আমরা হাবশা পৌছে সৎ প্রতিবেশী লাভ করলাম। আমরা আমাদের আদর্শের ব্যাপারে কোন ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হলাম না এবং নিরাপত্তা লাভ করলাম। আমরা ইবাদাত-বন্দেগী করতে গিয়ে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হলাম না। এ সংবাদে মক্কার কাফিররা ক্ষোভে ফেটে পড়লো। তারা শক্তিশালী দু'জন ব্যক্তি আমর ইবনুল আস ও আবদুল্লাহ ইবনে আবি রাবিয়াকে প্রচুর উপঢৌকনসহ হাবশায় নাজ্জাশীর দরবারে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো।

তারা হাবশায় আগমন করে বাদশাহের দরবারের দরবারি পাদ্রীদের প্রচুর ধন-সম্পদ ঘুষ দিয়ে তাদেরকে স্বপক্ষে আনলো। পাদ্রীদের তারা অনুরোধ করলো, আমার যখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে বাদশাহের সামনে বক্তৃতা করবো তখন যেন তারা আমাদের কথার প্রতি সমর্থন দেয়। পাদ্রীরা তাদের প্রস্তাবে রাজি হলো। তারা পাদ্রীদেরকে শিখিয়ে দিলো, বাদশাহ যেন তাঁদের আদর্শ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করার সুযোগ না পায় সেদিকে আপনারা লক্ষ্য রাখবেন। বাদশাহকে বুঝাবেন, এ সমস্ত বিদ্রোহী দেশ ত্যাগী বিভ্রান্ত লোকদের আদর্শ, উদ্দেশ্য, নৈতিক চরিত্র ও আচরণ সম্পর্কে তাদের দেশের নেতারাই বেশী অবগত রয়েছে।

হযরত উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, বাদশাহ আমাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করুক, এর থেকে চরম বিরক্তকর আর কিছু আমর ইবনুল আস ও আবদুল্লাহ ইবনে আবি রাবিয়ার কাছে না। তারা বাদশাহের দরবারে উপস্থিত হয়ে বাদশাহ নাজ্জাশীর জন্য নিয়ে আসা মূল্যবান উপঢৌকন সামনে

রাখলো। বাদশাহ উপহারসমূহের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। মনে হলো, তিনি খুবই খুশী হয়েছেন। তারপর মক্কা থেকে আগত দু'জন, বাদশাহের কাছে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করলো এভাবে-

বাদশাহ নামদার, আমাদের দেশের কিছু দুস্কৃতিকারী বিদ্রোহী আপনার সাম্রাজ্যে প্রবেশ করেছে। তারা আমাদের দেশে মারাত্মক ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। এরা এমন এক আদর্শ অনুসরণ করা শুরু করেছে, যে আদর্শ তাদেরকে তাদের বাপ-দাদার আদর্শ ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। তারা আমাদের ধর্ম পালন করেনা, আপনাদের ধর্মও গ্রহণ করেনি। তাদের দুস্কর্ম, অপরাধ দেশদ্রোহীতা ও চরিত্র সম্পর্কে আমাদের নেতারা বেশী অবগত। এই সমস্ত বিদ্রেহীদেরকে আমাদের হাতে সমর্পন করুন। আমাদের নেতৃবৃন্দ তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

মক্কা থেকে আগত দু'জনের কথার প্রতি দরবারী পাদ্রীরা সমর্থন জানিয়ে বললো, বাদশাহ নামদার, তারা সত্য কথাই বলেছে। বিদ্রোহীদেরকে এদের হাতে সমর্পন করুন। তাদের অপরাধ সম্পর্কে এরাই বেশী অবগত। তাদের নেতৃবৃন্দ তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

বাদশাহ নাজ্জাশী পাদ্রীদের কথায় দারুন ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! তা হতে পারে না। প্রকৃত ব্যাপার না জেনে আমি কিছুতেই তাদেরকে এদের হাতে সোপর্দ করবো না। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবো। তাদের বক্তব্য আমি শুনবো। যদি তারা অপরাধী হয় তাহলে তাদেরকে এদের হাতে সমর্পন করবো। আর যদি অপরাধী না হয় তাহলে তারা যতদিন আমার রাজ্যে বাস করতে ইচ্ছুক ততদিন করবে। আমি তাদেরকে পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে আমার রাজ্যে বাস করার পরিবেশ সৃষ্টি করে দিব।

উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, বাদশাহ নাজ্জাশী এবার আমাদেরকে দরবারে ডেকে পাঠালেন। আমরা বাদশাহের দরবারে যাওয়ার পূর্বে সবাই একত্রিত হলাম। আমরা অনুমান করলাম, বাদাশাহ আমাদেরকে আমাদের আদর্শ সম্পর্কে জানতে চাইবেন। আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম, আমরা প্রকৃত সত্য বাদশাহের সামনে প্রকাশ করবো। আর আমাদের পক্ষ থেকে জাফর ইবনে আবু তালিব বক্তব্য পেশ করবেন।

আমরা মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে বাদশাহের দরবারে গিয়ে দেখলাম, বাদশাহের ডানে-বামে পাদ্রীরা তাদের ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় পোষাক পরিধান করে ধর্মীয় গ্রন্থ খুলে বসে আছে। আমর ইবনুল আস ও আব্দুল্লাহ ইবনে আবি রাবিয়াকেও

দেখলাম। বাদশাহ্ আমাদের দিকে তাকিয়ে গম্ভির কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, কোন সে আদর্শ যা তোমরা অনুসরণ করছো? কোন আদর্শের কারণে তোমরা তোমাদের আবহমান কালের ধর্ম ত্যাগ করেছো? আমাদের ধর্মই বা গ্রহণ করনি কেন?

উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমাদের সবার পক্ষ থেকে জাফর ইবনে আবু তালেব নিঃশঙ্ক চিত্তে নির্ভীক কণ্ঠে বললেন, বাদশাহ্ নামদার! আমরা ছিলাম মুর্খ জাতি, আমরা সুবিচার করতে জানতাম না। মানুষের ওপরে অত্যাচার করতাম। অপরের সম্পদ জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিতাম, সামান্য ব্যাপারে রক্তপাত করতাম। কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে জ্যন্ত প্রোথিত করতাম। প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করতাম না। মিথ্যা কথা বলতাম, অশ্লীল-নগ্নতা ও বেহায়াপনার গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে চলতাম। এমন কোন অশালীন-অশ্লীল কর্ম নেই যা আমাদের দ্বারায় সংঘটিত হতো না। নিজের হাতে মূর্তি নির্মাণ করে তাকে মাবুদ জ্ঞানে পূজা অর্চনা করতাম, মূর্তির সামনে মাথা নত করতাম।

হযরত জাফর বলতে থাকলেন, আমরা যখন নিচ্ছিদ্র অন্ধকারে নিমজ্জিত, তখন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন আমাদের প্রতি একান্ত অনুগ্রহ করে আমাদের মধ্য তাঁর এক বান্দাকে রাসূল নির্বাচিত করে সত্য জীবন ব্যবস্থা-দ্বীনে হকসহ প্রেরণ করলেন। তিনি আমাদেরকে পরিশুদ্ধ করলেন। আমরা নৈতিকতা বিরোধী যাবতীয় কর্ম থেকে বিরত হলাম। মহান আল্লাহ পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা কিতাব মহাগ্রন্থ আল কোরআন দিয়ে তিনি আমাদের জীবনধারা পবিত্র করলেন। আমরা মিথ্যে দেব-দেবীর উপাসনা ত্যাগ করে এক আল্লাহর দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হলাম।

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শিক্ষা দিলেন, মিথ্যা কথা থেকে বিরত থাকতে, সতী নারীর ওপরে অপবাদ দেয়া থেকে। মৃত জীব-জন্তু ভক্ষণ করা, ইয়াতিমদের সম্পদ আত্মসাৎ করা, জেনা ব্যভিচার থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দিলেন। অপরের সম্পদ ছিনিয়ে বা চুরি করে নিতে নিষেধ করলেন। জীবন্ত শিশু কন্যাকে হত্যা করতে তিনি কঠোরভাবে নিষেধ করলেন। অবৈধভাবে রক্তপাত করা থেকে তিনি আমাদেরকে বিরত করলেন। আমরা নারীর মর্যাদা দিতাম না, তিনি নারীর মর্যাদা সমুন্নত করলেন। যাবতীয় অশ্লীলতা, অশালীনতা, অসভ্যতা বেহায়াপনা থেকে তিনি আমাদের জীবনকে মুক্ত করলেন। তিনি যেসব জিনিস হালাল করেছেন এবং যেসব বস্তু হারাম করেছেন আমরা তা হালাল-হারাম বলে বিশ্বাস করি। আমরা তাঁকে সত্য নবী বলে বিশ্বাস করে তাঁর

প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁর প্রতি নাযিলকৃত আল কোরআনকে জীবন বিধান হিসেবে অনুসরণ করছি।

হযরত জাফর ইবনে আবু তালিব বিরতি না দিয়ে বলতে থাকলেন, বাদশাহ নামদার! আমরা যখন কোরআনকে জীবন বিধান হিসেবে অনুসরণ করে নিজেদেরকে কলুষমুক্ত করলাম, তখন মক্কার লোকজন আমাদের প্রতি নির্যাতন শুরু করলো। তারা অসাড়-অথর্ব মূর্তির উপাসনা করতে আমাদেরকে বাধ্য করতে চাইলো। আল্লাহর আইন অমান্য করে মানুষের বানানো আইন-কানুনকে মেনে চলার জন্য অত্যাচার শুরু করলো। আমরা যখন আমাদের পূর্বের গ্লানীময় কলুষ জীবনে প্রত্যাবর্তন করতে সম্মত হলাম না, তখন তারা অত্যাচারে আমাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুললো। তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমরা আপনার রাজ্যে নিরাপত্তা লাভের জন্য আগমন করেছি। আমাদের বিশ্বাস এবং প্রত্যাশা, আমরা আপনার এখানে অত্যাচারিত হবনা।

হযরত উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, হযরত জাফরের বক্তব্য বাদশাহ মনযোগ দিয়ে শুনলেন। তারপর তিনি মাথা উঁচু করে হযরত জাফরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। সে দৃষ্টি ছিল সত্যকে জানার অদম্য আগ্রহে পরিপূর্ণ। তিনি বললেন, তোমাদের নবীর প্রতি যা অবতীর্ণ হয় তা কি আমাকে শুনাতে পারো?

হযরত জাফর পবিত্র কোরআনের সূরা মরিয়ামের প্রথম অংশ পাঠ করে শুনালেন। হযরত জাফর যখন কোরআন তিলাওয়াত করছিলেন, তখন নাজ্জাশী ও তাঁর দরবারের পাদ্রীরা জাফরের সুললিত কণ্ঠে আল্লাহর বাণী শুনে নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হলেন না। তাদের চোখ অশ্রুয় পরিপূর্ণ হয়ে গেল। অশ্রু ধারায় নাজ্জাশীর দাড়ি ও পাদ্রীদের সামনে রক্ষিত ধর্ম গ্রন্থ ভিজে গেল। পবিত্র কোরআনের হৃদয় হরণকারী ঐন্দ্রজালিক সুরের মূর্ছনায় গোটা দরবারে এক বেহেশ্তী আবেশের সৃষ্টি হলো। বাদশাহ বললেন, ঈসা ইবনে মারিয়াম ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, তা একই স্থান থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। উভয় বাণীর উৎসমূল অভিন্ন।

একথা বলে তিনি মক্কা থেকে আগত আমর ও তার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, তোমরা চলে যাও। আল্লাহর শপথ! আমি এদেরকে তোমাদের হাতে সমর্পন করবো না।

হযরত উম্মু সালামা বলেন, আমরা যখন বাদশাহের দরবার থেকে বেরিয়ে আসছি

তখন আমর তার সঙ্গীকে আমাদের শুনিয়ে বলতে লাগলো, আল্লাহর শপথ! আগামীকাল আমরা পুনরায় বাদশাহ্‌র দরবারে আগমন করে ওদের বিরুদ্ধে এমন ধরনের কথা বলবো, যা শুনে বাদশাহ্‌র মন-মানসিকতা মুসলমানদের প্রতি ঘৃণায় পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। আমরা মুসলমানদেরকে স্বমূলে উৎখাত করেই তবে বিরত হবো। আমরা বাদশাহকে জানাবো, মুসলমানদের বিশ্বাস হলো–ঈসা ইবনে মারিয়াম অন্য মানুষদের মতই একজন মানুষ।

এরপর মক্কা থেকে আগত আমর ইবনুল আস বাদশাহের দরবারে গিয়ে জানালো, আপনি যাদেরকে সম্মান-মর্যাদার সাথে আশ্রয় দিয়েছেন, তাঁরা আপনাদের নবী ঈসা সম্পর্কে এক মারাত্মক ধারণা পোষণ করে। আপনি তাঁদের কাছে লোক পাঠিয়ে প্রশ্ন করে দেখুন তাঁরা ঈসা ইবনে মারিয়াম স ম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে। বাদশা তার কথা শুনে সত্য-মিথ্যা যাচাই করার জন্য মুসলমানদেরকে পুনরায় দরবারে ডেকে পাঠালেন।

উম্মু সালমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমরা ভীষণ দুশ্চিন্তায় নিমজ্জিত হলাম। আমাদের মধ্যে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হলো, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত ঈসা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে যা বলেছেন, আমরা তা-ই বলবো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্পর্কে আমাদেরকে যা শুনিয়েছেন আমরা তা-ই প্রকাশ করবো। নবীর কথা একবিন্দু পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করবো না। এতে আমাদের ভাগ্যে যা হয় হবে, ত বু আমরা সত্য প্রকাশে দ্বিধাগ্রস্থ হবোনা।

আমরা দরবারে উপস্থিত হয়ে পূর্বের দিনের মতই দেখতে পেলাম, পাদ্রীরা ধর্মীয় গ্রন্থসহ তাদের ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় পোষাকে আবৃত হয়ে বাদশাহের দু'দিকে উপবিষ্ট। মক্কার আমর ও তার সংগীও রয়েছে। বাদশাহ আমাদেরকে প্রশ্ন করলেন আমরা ঈসা ইবনে মারিয়াম সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করি। হযরত জাফর বললেন, আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈসা ইবনে মারিয়াম সম্পর্কে আমাদেরকে যে কথা বলেছেন আমরাও সে-ই কথাই বলি।

বাদশাহ জানতে চাইলেন, তোমাদেরকে তিনি ঈসা ইবনে মারিয়াম সম্পর্কে কি কথা বলেছেন?

হযরত জাফর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু– বললেন, আমাদের নবী ঈসা ইবনে মারিয়াম সম্পর্কে বলেন, তিনি আল্লাহর একজন সম্মানিত নবী-রাসূল ও বান্দাহ। আল্লাহ তা'য়ালা রুহ ও কালাম-যা তিনি কুমারী ও পবিত্র মারিয়ামের প্রতি নিক্ষেপ করেছেন।

বাদশাহ নাজ্জাশী হযরত জাফরের কথা শুনে হস্ত দ্বারা মাটির ওপর আঘাত করে বললেন, আল্লাহর শপথ! তোমাদের নবী আমাদের নবী সম্পর্কে যা বলেছেন, বিন্দু পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করেননি।

বাদশাহের মুখ থেকে অকপটে সত্য কথা উচ্চারিত হবার সাথে সাথে দরবারের পাদ্রীরা তাদের নাক দিয়ে ঘৃণাসূচক নিঃশ্বাস ছাড়লো। বাদশাহ বললেন, আপনারা ঘৃণাই করুন বা আমার কথা অপছন্দ করুন, আমি কোনক্রমেই মুসলমানদেরকে ওদের হাতে সমর্পন করবো না। পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আমাকে দেয়া হলেও আমি তার বিনিময়ে মুসলমানদের প্রতি কোন ধরনের বিপদ সহ্য করবো না।

এ কথা বলে তিনি মক্কার আমর ও তার সঙ্গীকে চলে যাবার আদেশ দিয়ে দরবারের লোকদেরকে বললেন, ওদের উপঢৌকন ওদেরকে ফেরৎ দিয়ে দাও। ওদের উপহারে আমার কোন প্রয়োজন নেই।

হযরত সালামা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, এভাবে মক্কার কাফিরদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হলো। আমরা পূর্ণ নিরাপত্তা সহকারে রাষ্ট্রীয় মেহমানের মর্যাদা পেলাম। মুক্ত মনে স্বাধীনভাবে ইসলামের বিধান মেনে চলার পরিবেশ লাভ করলাম।

ইসলামী আদর্শের মোকাবেলা করা সম্ভব নয় বিধায় বাতিল শক্তি এই আদর্শের ধারক-বাহকদের সম্পর্কে পৃথিবী ব্যাপী অপপ্রচার শুরু করে। আবহমান কাল থেকে ইসলামী আন্দোলনের শত্রুরা এ ধরণের ঘৃণ্য তৎপরতা চালিয়ে আসছে। কখনো তারা বলে, ইসলামপন্থী লোকগুলো প্রগতি বিরোধী, দেশদ্রোহী স্বাধীনতা বিরোধী, সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী, রগকাটা সন্ত্রাসী বাহিনী, ধর্মীয় বিধানে মতভেদ সৃষ্টিকারী, জঙ্গী ইত্যাদি ধরনের মিথ্যে অভিযোগে ইসলামী আন্দোলনকে অভিযুক্ত করে। সংবাদ মাধ্যমে বাতিল শক্তি এমন ধরনের ভিত্তিহীন সংবাদ ইসলামী দলের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেয় যে, সাধারণ মানুষ প্রকৃত সত্য জানা থেকে সাময়িকভাবে বঞ্চিত হয়। মক্কার ইসলাম বিরোধী লোকগুলো যেমন নাজ্জাসীর দরবারের ধর্মীয় নেতাদের অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করে, নাজ্জাশীকে প্রকৃত সত্য জানা থেকে বঞ্চিত করার অপচেষ্টা করেছিল, বর্তমানেও তেমনই বাতিল শক্তি দুনিয়া পূজারী এক শ্রেণীর নামধারী পীর-মাওলানাদেরকে অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করে ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়ে সাধারণ মানুষকে কোরআনের সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত করার অপচেষ্টা করছে।

ইসলামের জিন্দাদিল মুজাহিদ হযরত জাফর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম বাতিল শক্তিকে বিন্দুমাত্র পরোয়া না করে বাদশাহের সম্মুখে

প্রকৃত সত্য তুলে ধরেছেন। বাদশাহ যদি মুসলমানদেরকে আশ্রয় না দিতেন তাহলে আল্লাহর দ্বীনের এই কয়েকজন মুজাহিদকে চরম নির্যাতনমূলক মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হতো। ইসলামী আন্দোলনের বীর সৈনিকেরা দুনিয়ার কোন স্বার্থকে সামনে রেখে, নির্যাতনের ও আশ্রয় হারানোর ভয়ে বাদশাহের সামনে সত্য প্রকাশ থেকে বিরত থাকেনি। তাঁরা তাঁদের একমাত্র আশ্রয়দাতা মহাশক্তিমান আল্লাহর ওপরে নির্ভর করে হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস্ সালামের অনুসারী নাজ্জাশীর সামনে তাঁদের সম্পর্কে প্রকৃত সত্য কোরআনের ভাষ্য তুলে ধরে দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন– আমরা সে কথাই বিশ্বাস করি, যা পবিত্র কোরআন আমাদেরকে জানিয়েছে।

ইসলামের মুজাহিদরা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে নিজেদের ও জাতির অবস্থা কতটা শোচনীয় ছিল সেটাও অকপটে প্রকাশ করে এ কথা প্রমান করেছেন যে, মানুষ ইসলামী আন্দোলনে মন-প্রাণ দিয়ে শামিল হলে মানুষের জীবনের সার্বিক দিকে এই আন্দোলন কিভাবে পরিবর্তন আনে। গোটা আরবের নিকৃষ্ট মানুষগুলো যে কোরআনের সোনালী স্পর্শে পৃথিবীর বুকে একটি সুসভ্য জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বর্তমানেও সেই কোরআন অক্ষত রয়েছে, প্রয়োজন শুধু কোরআনের বিধান অনুসরণের।

হযরত জাফর ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মদীনায় ফিরে এলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুদিন পর রোমানদের উৎপাত থেকে ইসলামী রাষ্ট্রকে হেফাজত করার জন্য হযরত যায়িদ বিন হারিসার নেতৃত্বে মাত্র তিন হাজার মুজাহিদ বাহিনীকে দুই লক্ষ রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন মুতার প্রান্তরে।

কল্পনা করা যায়! মাত্র তিন হাজার সৈনিক যাচ্ছে তদানীন্তন পরাশক্তি রোম সাম্রাজ্যের সুসজ্জিত দুই লক্ষ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে? যে মানুষগুলো এই অসম যুদ্ধে যাচ্ছে তাঁদের মধ্যেও কোন ভীতির চিহ্ন নেই। সবার চোখে শাহাদাতের অদম্য কামনা। তাঁরা সৈন্য সংখ্যা বা আধুনিক সমরাস্ত্রের ওপরে নির্ভর না করে একমাত্র মহান আল্লাহর রহমতের আশায়, আর তাঁরই সাহায্যের ওপরে ভরসা করে, বিশাল রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সামান্য সংখ্যক সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ইসলামের মুজাহিদরা আল্লাহর ওয়াদার প্রতি অবিচল বিশ্বাসে, দুনিয়ার কোন শক্তিকে পরোয়া করতেন না। তাঁরা জানতেন, দ্বীন কায়েমের জন্য যখন আল্লাহর পথের মুজাহিদরা ময়দানে জান্-মাল দিয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় তখন

তাঁদেরকে অসহায় অবস্থায় আল্লাহ ছেড়ে দেন না। আল্লাহ কোরআনে ওয়াদা করেছেন–তিনি অবশ্য অবশ্যই বাতিলের মুকাবিলায় ইসলামপন্থীদের বিজীয় করবেন।

যুদ্ধে রওয়ানা হয়ার পূর্বে আল্লাহর রাসূল ঘোষণা করলেন, যদি যায়িদ শহীদ হয়ে যায় তাহলে সেনাপতি হবে জাফর, আর যদি শহীদ হয়ে যায় তাহলে সেনাপতি হবে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা। তিনিও যদি শহীদ হয়ে যান তখন মুসলিম সৈন্য বাহিনী নিজেদের পরামর্শের ভিত্তিতে তাদের সেনাপতি নির্বাচিত করবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথায় উপস্থিত সেনাবাহিনী ও তাদের আত্মীয়-স্বজন স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, এ তিনজনই মূতার যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করবেন। তাঁদের দুনিয়ার জীবনের ইতি ঘটতে যাচ্ছে। যোদ্ধা তিনজনও বুঝতে পারলেন এই সুন্দর পৃথিবী থেকে তাঁরা মূতার প্রান্তরে চির বিদায় গ্রহণ করবেন। পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্রদের মাঝে আর ফিরে আসতে পারবেন না। ইসলামের শত্রুদের নির্মম অস্ত্র তাঁদেরকে তাঁদের সকল প্রিয়জনদের থেকে চীরতরে বিচিছন্ন করে দিবে। কাফিররা নিষ্ঠুরভাবে তাঁদেরকে হত্যা করবে। তাঁদের পিতা-মাতাকে করবে পুত্রহারা, স্ত্রীকে করবে বিধবা আর সন্তানদের চিরদিনের জন্য ইয়াতিম করবে বাতিল শক্তির রক্ত পিপাসু অস্ত্র।

সব কিছু জেনে বুঝে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্য তাঁরা হাসি মুখে শাহাদাতের নেশায় মূতার প্রান্তরের দিকে চলেছেন। সন্তানদের 'আব্বা আব্বা' বলে বুক ফাটা আর্তনাদ, পিতা-মাতার করুণ আহাজারি আর প্রিয়তম স্ত্রীর সজল চোখ কোন কিছুই তাঁদেরকে শাহাদাতের ময়দান থেকে বিরত রাখতে পারলোনা। তাঁরা আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েমের জন্য উল্কার গতিতে যুদ্ধের উত্তপ্ত ময়দানের দিকে ধাবিত হলেন। শাহাদাতের অমূল্য মওতকে যাঁরা মনের আনন্দে স্বাগত জানাতে পারে, কেবল মাত্র তাদেরই পক্ষেই সম্ভব হয় ইসলামী আদর্শ আল্লাহর যমীনে বাস্তবায়িত করা। বাতিল শক্তির শেষ চিহ্ন শুধু তাঁরাই মুছে দিতে সক্ষম, যারা রক্ত পিচ্ছিল পথে দৃঢ় কদমে এগিয়ে যায়। শোষিত নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানবতার মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার জন্য ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে কেবল মাত্র তারাই সক্ষম, যাঁরা ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে শাহাদাতের নেশায় পাগলপারা হয়ে যায়। মৃত্যুর ভয়ে ভীত কাপুরুষদেরকে এ পৃথিবী সম্মান ও নেতৃত্বের আসন ছেড়ে দেয় না। পৃথিবীর নেতৃত্বের আসন মৃত্যুঞ্জয়ী বীরদেরই শুধু স্বাগত জানায়।

হক-বাতিলের মধ্যে মূতার প্রান্তরে রণদামামা বেজে উঠলো। হযরত যায়িদ সিংহ গর্জনে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বাতিল শক্তির রণবুহ্য ভেদ করে তিনি সম্মুখে এগিয়ে চললেন। তাঁর তাওহীদের তরবারীর তীব্র আঘাতে কাফির সৈন্য তৃণখন্ডের মত উড়ে যেতে লাগলো। ইসলামের দুশমনদের রক্তে হযরত যায়িদের রূপালী তরবারী রঞ্জিত হয়ে গেল। উপস্থিত হলো আল্লাহর এই সৈনিকের শাহাদাতের মহেন্দ্রক্ষণ। তিনি প্রাণভরে শাহাদাতের অমিয় সঞ্জীবনী শুধা পান করে চির অমরত্ব অর্জন করলেন।

এবার এলো হযরত জাফরের পালা। তিনি ইসলামের পতাকা হাতে নিয়ে আল্লাহু আকবার বলে গগন বিদারী গর্জনে রোমান সৈন্যদের কলিজা কাঁপিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে যুদ্ধ শুরু করলেন। তাঁর তরবারী থেকে অগ্নিস্ফূলিঙ্গ নির্গত হতে লাগলো। সারিবদ্ধ কাফির সৈন্যরা হযরত জাফরের তরবারীর আঘাতে দ্বি-খন্ডিত হয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়তে লাগলো। হঠাৎ করে কাফিরদের তরবারীর আঘাতে হযরত জাফরের ডান হাত কব্জি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তিনি ক্ষিপ্র গতিতে বাম হাতে ইসলামের ঝান্ডা উচ্চে তুলে ধরলেন। বাম হাতের কব্জিও যখন শত্রুদের আঘাতে বাহু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তখন তিনি কাটা রক্তাক্ত দুটি বাহু দিয়ে তাওহীদের পতাকা বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

অবশেষে বাতিল শক্তির নিষ্ঠুর আঘাতে তাঁর দেহ যখন জিহাদের ময়দানে লুটিয়ে পড়লো, তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ইসলামের পতাকা উচ্চে তুলে ধরলেন। তিনিও যখন বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে শাহাদাতবরণ করলেন, তখন সেনাবাহিনী হযরত খালিদকে সিপাহসালার নিযুক্ত করলেন। পরিশেষে মাত্র তিন হাজার মুসলিম সৈন্য ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে আল্লাহর প্রত্যক্ষ মদদে দুই লক্ষ রোমান বাহিনীকে পরাজিত করে তাওহীদের বিজয় কেতন উড্ডিন করলো।

এই যুদ্ধে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুও অংশ গ্রহন করেন। তিনি বলেন, যুদ্ধ শেষে যখন শহীদদের দাফন-কাফনের আয়োজন চলছে, তখন দেখা গেল হযরত জাফরের দেহের সামনের দিকেই ৯০ টি আঘাতের চিহ্ন। একটি আঘাতও পৃষ্ঠদেশে নেই। শত্রুর সম্মুখে তিনি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেননি। অস্ত্রের প্রত্যেকটি আঘাত তিনি বুক পেতেই গ্রহণ করেন। আঘাতে আঘাতে তাঁর দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ যখন একটি একটি করে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে তখনও তিনি অস্ত্রের নিষ্ঠুর আঘাতের তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করেও ইসলামের পতাকা ধূলি ধূষরিত হতে দেননি। তাওহীদের পতাকা ভূলুণ্ঠিত হবে এই ধরনের কল্পনাও তিনি করেননি।

মাত্র তিন হাজার সৈন্য নিয়ে দুই লক্ষ রোমান সৈন্যের সম্মুখীন হতে তিনি বিন্দু পরিমান দুর্বলতার প্রশ্রয় দেননি।

রক্তের আখরে লিখে যাই বিজয়ের বার্তা

দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের মহিলা কর্মী কাবশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বনু হারেসার গর্তের মধ্যে বসে আছেন অধির আগ্রহ নিয়ে। সাথে রয়েছেন উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা। তাঁরই আপন গর্ভজাত সন্তান যাবে দ্বীনের দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। মায়ের চোখে গর্বের চিহ্ন। তাঁর সন্তান ইসলামের মুজাহিদ। তিনি ভাবছেন, প্রাণপ্রিয় পুত্র সায়াদ যুদ্ধের ময়দানে যেতে এত দেরী করছে কেন! মমতাময়ী মা তাকিয়ে দেখেন, মাদীনার আউস গোত্রের শাখা বনু আবদুল আশহালের নেতা তাঁরই কলিজার টুকরা সন্তান সায়াদ যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হয়ে খন্দকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মা তাঁর সন্তান সায়াদকে ডেকে বললেন, 'সায়াদ, তুমি তো তো পিছনে পড়ে গেছ। দ্রুত গতিতে জান্নাতের দিকে এগিয়ে যাও।'

কিয়ামতের ময়দানে শহীদের মা হিসেবে আল্লাহর দরবারে নিজেকে পরিচয় দেয়ার জন্য হযরত সায়াদের মা সন্তানকে উৎসাহ দিলেন। হযরত সায়াদ ইবনে মায়াজ যে বর্ম পরিধান করেছিলেন, তা দ্বারা তাঁর হাত সম্পূর্ণ আবৃত হয়নি। হাতের কিছু অংশ অনাবৃত রয়ে গিয়েছিলো। তা দেখে হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেছিলেন, সায়াদের মা! তোমার সন্তানের যিরাহ যদি একটু বড় হতো। তাঁর হাত তো বাইরে বের হয়ে রয়েছে।

যুদ্ধের ময়দানে হযরত সায়াদ ইবনে মায়াজ বিষাক্ত তীরের আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হলেন। হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হযরত সায়াদের মায়ের কাছে যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে, তোমার সন্তানের হাত বেরিয়ে রয়েছে। সে আশঙ্কাই সত্য প্রমাণ হলো। অনাবৃত হাতে হাব্বান বিন আবদি মান্নাফ নামক আল্লাহর দুশমন– সে ইবনুল আরকা নামে পরিচিত ছিলো। লোকটি হযরত সায়াদের অনাবৃত হাতে বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করলো। আঘাতে হযরত সায়াতের দেহের প্রধান ধমনী কেটে গিয়েছিলো। স্রোতের মতোই রক্ত নির্গত হতে লাগলো। তাঁর আহত হওয়ার সংবাদ শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আঘাতকারীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, আল্লাহ ইবনে আরকার চেহারা আগুনে ঝলসে দিবেন।

হযরত সায়াদ ইবনে মায়াজের পক্ষে যুদ্ধের ময়দানে টিকে থাকা সম্ভব হলোনা। সেনাপতি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহত সায়াদকে দ্রুত মসজিদে নববীর কাছে তাঁবুতে নিয়ে আসলেন। চিকিৎসক নিয়োগ করা হলো হযরত রাফিদা আসলামিয়াকে। বিষাক্ত তীরের আঘাতে তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকলো। কিন্তু শাহাদাত পিয়াসী সায়াদের নিজের অবস্থা সম্পর্কে কোন চিন্তা নেই। মন বার বার বিষন্ন হয়ে পড়ছে, তিনি যুদ্ধে দুশমনদের মোকাবেলা করতে পারলেন না। অন্যরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে সম্মানিত হচ্ছেন আর তিনি আহত অবস্থায় তাঁবুতে অবস্থান করছেন। মানসিক যন্ত্রণায় তাঁর চোখ দুটো অশ্রু সিক্ত হয়ে উঠছে। তিনি মহান আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলেন, 'রাব্বুল আলামীন! পুনরায় কুরাইশদের সাথে যদি যুদ্ধ করতে হয় তাহলে তুমি আমাকে জীবিত রেখ। আমার আকাংখা, আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করবো। দুশমনরা তোমার রাসূলকে কষ্ট দিয়ে মক্কায় থাকতে দেয়নি। আর যদি কুরাইশদের সাথে পুনরায় যুদ্ধ করতে না হয়, তাহলে তুমি আমাকে শাহাদাতের মৃত্যু দাও।' খন্দক যুদ্ধের পরে প্রকৃত অর্থে কুরাইশদের সাথে আর কোন যুদ্ধ হয়নি।

খন্দক যুদ্ধে আহত হযরত সায়াদ আর আরোগ্য লাভ করলেননা। শহীদী মিছিলের দিকে তিনি এগিয়ে চলেছেন। মসজিদে নববীর তাঁবুতে রেখেই স্বয়ং আল্লাহর নবী তাঁর সেবা-যত্ন করছেন। হযরত সায়াদ ইবনে মায়াজের দুনিয়ার জীবন-প্রদীপ নিভে আসছে । তিনি শহীদী বাগানের ফুল হয়ে আল্লাহর জান্নাতে চলে গেলেন। সেদিনটি ছিলো পঞ্চম হিজরীর জিলক্বদ মাসের এক শোকার্ত দিন। শোক বিহ্বল চোখগুলো অশ্রু সজল নয়নে দেখতে থাকলো, মসজিদে নববীর তাঁবুতে আল্লাহর হাবীব বসে রয়েছেন। আলোক উজ্জ্বল চেহারা আর সুন্দর সুঠাম স্বাস্থ্য এবং লম্বাদেহের অধিকারী একজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের পবিত্র উরুর ওপর মাথা রেখে চির নিদ্রায় নিদ্রিত।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখ থেকে মর্মবেদনার অশ্রুধারা গড়িয়ে তাঁর পবিত্র দাড়ি মোবারক ভিজিয়ে দিচ্ছে। শোক সংবাদ পেয়ে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দ্রুত আগমন করলেন এবং হৃদয় বিদারক এই দৃশ্য অবলোকন করে কান্না ভেজা কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'আহ্! আজ আমার কোমর ভেঙ্গে গেল।'

আল্লাহর রাসূল তাঁকে সান্তনা দিয়ে বললেন, 'আবু বকর এমন করে বলতে হয়না।' নরশার্দুল হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর পানি গন্ড বেয়ে স্রোতের মতোই

প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি বার বার ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়ছেন। হযরত সায়াদের মমতাময়ী মা সংবাদ পেয়ে পাগলিনীর ন্যায় মসজিদে নববীর তাঁবুতে আপন গর্ভজাত সন্তানের লাশের পাশে ছুটে এলেন। চোখ তার অশ্রু ভেজা। তিনি ছেলের শাহাদাত প্রাপ্ত লাশের দিকে তাকিয়ে কান্না ভেজা কণ্ঠে বললেন, 'হে সায়াদ! সত্যই তুমি সৌভাগ্যশালী। বীরত্ব ধৈর্য ও দৃঢ়তাই তোমাকে আল্লাহর পথে প্রতিষ্ঠিত করেছে।'

সাহাবায়ে কেরাম সকলেই শোকাভিভূত। মদীনার জান্নাতুল বাকী–কবরস্থানের দিকে শোকের মিছিল চলেছে। অগণিত জিন্দাদিল মুজাহিদদের নেতৃত্বে রয়েছেন আল্লাহর হাবীব। প্রত্যেকেই পালাক্রমে জানাযা কাঁধে বহন করছেন। কেউ কেউ মন্তব্য করছেন, 'লাশ এত হাল্কা কেন!'

আল্লাহর রাসূল জানিয়ে দিলেন, 'হ্যাঁ, সায়াদের লাশ আল্লাহর ফেরেশ্তারা বহন করছে, এ জন্যই জানাযা তোমাদের কাছে হাল্কা বোধ হচ্ছে।'

জান্নাতুল বাকীতে হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত সায়াদ ইবনে মায়াজের জন্য শেষ বিশ্রামস্থল নির্মাণ করছিলেন। অর্থাৎ তিনি করব খুড়ছিলেন এবং বার বার বলছিলেন, 'আল্লাহর শপথ! আমি এই কবর থেকে মিশ্কের সুঘ্রাণ পাচ্ছি।'

দাফন শেষে সবাই অবাক-বিস্ময়ে দেখলো, আল্লাহর হাবীব যেন শোকে মুহ্যমান। তিনি দাড়ি মোবারক নিজের হাতে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আর তাঁর চোখ থেকে অশ্রুর বন্যা প্রবাহিত হচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ পর তাঁর পবিত্র মুখ থেকে উচ্চারিত হলো, 'মৃত ব্যক্তির মৃত্যুতে আল্লাহর আর্শ কেঁপে উঠলো। আকাশের দরজা তাঁর রুহ্-এর জন্য প্রশস্ত করে দেয়া হলো এবং অগণিত ফেরেশ্তা তাঁর জানাযায় শরীক হয়েছিলো।'

হযরত সায়াদ ইবনে মায়াজ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর গোত্রের লোকজন তাঁর সম্মান ও মর্যাদার কারণে গর্ব করে বলতেন, 'কোন মৃত ব্যক্তির মৃত্যুতে আল্লাহর আর্শ কেঁপে উঠেনি। কিন্তু আমাদের নেতা সায়াদের মৃত্যুতে আল্লাহর আর্শ কেঁপে উঠেছিল।'

প্রাণ কাঁদে-মন কাঁদে শহীদী মিছিলে হবো শামিল

ওহূদের যুদ্ধের সকল আয়োজন প্রায় সমাপ্ত। তমশাবৃত রজনীর ঘনকালো অন্ধকার ভেদ করে তরুণ তপন উদয়ের সাথে সাথেই বেজে উঠবে রণ দামামা। সত্য আর মিথ্যার চূড়ান্ত দ্বন্দ্বের পরিণতি ওহূদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। সত্যপন্থীদের দু'জন মুজাহিদ যোদ্ধা আলোচনায় ব্যস্ত। একজনের নাম আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ অপরজনের নাম সায়াদ বিন আবী। আলোচনার বিষয় এই যুদ্ধের ময়দানে কে কি কামনা করছে। দু'জন বিপরীত ধর্মী কামনা নিয়ে সত্যপন্থীদের একমাত্র আশ্রয়স্থল মহান আল্লাহর দরবারে হাত উঠালেন। একজন দোয়া করছেন অপরজন দোয়া কবুলের জন্য আল্লাহর কাছে আমীন আমীন বলছেন।

প্রথমেই আল্লাহর দরবারে হাত উঠালেন হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। তিনি দোয়া করছেন, 'রাব্বুল আলামিন! আগামী কালকের যুদ্ধে আমাকে এমন এক বীরের মোকাবেলা করার তাওফিক দাও, আমি যেন তাকে পরাজিত করে তার সমস্ত ধন-সম্পদ নিয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে গাজী হয়ে ফিরে আসতে পারি।'

হযরত সায়াদ যখন এ দোয়া করছিলেন তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আমীন আমীন বলছিলেন। এবার হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে দু'চোখে অশ্রুর বন্যা প্রবাহত করে আল্লাহর কাছে বললেন, 'রাব্বুল আলামীন! আগামীকালের যুদ্ধে এমন এক বীর যেন আমার মোকাবেলায় আসে, আমি তার সাথে প্রাণপন যুদ্ধ করে শাহাদাতবরণ করি। শাহাদাতের পর বাতিল শক্তি যেন আমার নাক কেটে নেয়। আদালতে আখিরাতে আমি যখন নাক কাটা অবস্থায় তোমার সামনে দাঁড়াবো, তখন তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে, 'আব্দুল্লাহ! তোমার নাক কাটা কেন?'

আমি তখন জবাবে বলবো, 'রাব্বুল আলামীন! তুমি তো জানো, তোমার যমীনে তোমার দ্বীন কায়েম করার লক্ষ্যে ইসলামী আন্দোলনে শামিল হয়েছিলাম। বাতিল শক্তি তোমার দ্বীনকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য যুদ্ধ করেছে। সেই যুদ্ধে ইসলামের শত্রুরা আমাকে শহীদ করে আমার নাক কান কেটে নিয়েছে। হে আল্লাহ! তোমার এবং তোমার রাসূলের প্রিয় রাস্তায় আমার নাক কাটা গিয়েছে।

তখন তুমি আল্লাহ আমার কথার উত্তরে বলবে, 'আব্দুল্লাহ! তুমি সত্য কথাই বলেছো'

হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যখন এই দোয়া করেন তখন হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আমীন আমীন বলতে থাকেন। তাঁদের দোয়া মহান আল্লাহ কবুল করেছিলেন। পরের দিন ওহূদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে হযরত সায়াদ গাজী হয়ে গনীমাতের মালামাল নিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ফিরে এলেন। কিন্তু হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ফিরে এলেন না। অনুসন্ধানে দেখা গেল, যুদ্ধের ময়দানে মাঝখানে তাঁর লাশ চিন নিদ্রায় শায়িত। তাঁর নাক কান সত্যের শত্রুরা কেটে নিয়েছে। শাহাদাতের কি উদগ্র বাসনা! জীবনের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় কাজ করে আল্লাহর জান্নাতে যাবার যতটা নিশ্চয়তা না আছে, ততটা নিশ্চয়তা রয়েছে শাহাদাতের মৃত্যুতে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যার হৃদয়ে শাহাদাতের ইচ্ছে নেই তার মৃত্যু হবে মুনাফেকের মৃত্যু।'

আমাকে শহীদ করে সেই মিছিলে শামিল করে দিও

সুন্দর সুঠাম দেহের অধিকারী সুদর্শন যুবক সুন্দরী তন্বী তরুণী ষোড়শী যুবতীকে বিয়ে করেছেন। স্ত্রীর সাথে রাত অতিবাহিত করলেন হযরত হানযালা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। তিনি গোসলের প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন। এমন সময় সংবাদ পেলেন ওহূদের ময়দানে তাঁরই প্রিয় নবী সঙ্গী-সাথীসহ বাতিল শক্তি কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছে। তাঁর আর গোসল করা হলো না। গোসল উপেক্ষা করে তিনি রূপালী তরবারী নিয়ে ছুটলেন ওহূদের ময়দানের দিকে। কাফিরদের ভীড়ের মধ্যে সিংহ শাবক হযরত হানযালা আল্লাহু আকবর বলে গর্জে উঠে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ইসলামের শত্রুদের নিধন করতে করতে ইসলামের এই ত্যাগী সাহসী মুজাহিদ বাতিল শক্তির নির্মম আঘাতে শাহাদাতবরণ করলেন।

ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই বীর মুজাহিদকে পৃথিবীর কোন আকর্ষণই শাহাদাতের অদম্য কামনা থেকে বিরত রাখতে পারেনি। সুন্দরী তন্বী তরুণী স্ত্রীর কোন মধুর স্মৃতিই হযরত হানযালাকে জিহাদের আহ্বান থেকে দূরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। স্ত্রীর মধূর আলিঙ্গনের তুলনায় তিনি বাতিল শক্তির রক্তলোলুপ তরবারীর নিষ্ঠুর আলিঙ্গনকেই অধিক পছন্দ প্রিয় মনে করেছেন। ইসলামী আন্দোলনের পথপ্রদর্শক আল কোরআনের বিপ্লবী আহ্বানে হযরত হানযালার ন্যায় অসংখ্য বীর মুজাহিদ সর্বস্ব ত্যাগ করে সাড়া দিয়েছেন বলেই একদিন ইসলামই বিশ্ব মানবতার মুক্তির পথ দেখিয়েছিল। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসনের

এক স্বর্ণ যুগের। আকাশের নীচে ও পৃথিবীর বুকে এমন স্বর্ণালী যুগের সূচনা হয়েছিল- যেখানে মানুষ প্রাণভরে আস্বাদন করেছিল সুখ-শান্তি, নিরাপত্তা ও জান্নাতের স্বাদ। সে যুগ সম্পর্কে স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষনা করেছিলেন, 'খায়রুল কুরুনে কারনী' আমার এই যুগই সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ।

ইসলামী আদর্শের প্রতি হানযালা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর মতো যুবকদের এতটা তীব্র আকর্ষণ ছিল বলেই তাঁদের তপ্ত রক্তের ওপরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আল কোরআনের রাজ। তাঁদের রক্তই সাহায্য করেছিল বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিজয় কেতন উড়াতে। তাঁরা ইসলামের জন্য তপ্ত রক্ত ঢেলে দিয়ে আল কোরআনের আদর্শে এমন মানুষ তৈরী করেছিল, যে মানুষদের আদেশ জঙ্গলের হিংস্র পশু পর্যন্ত নতশিরে অনুসরণ করতে বাধ্য হতো।

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাছ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর নেতৃত্ব মুসলিম বাহিনী তাওহীদের কালিমা বুলন্দ করার জন্য ছুটে গেলেন আফ্রিকার দিকে। প্রাণ সংহারী হিংস্র জানোয়ারে পরিপূর্ণ ঘন জঙ্গলের পাশে মুসলিম বাহিনী শিবির স্থাপন করলো। আফ্রিকার কালো বিশাল দেহী মানুষগুলো চিন্তা করলো, আরেকটু পরেই যখন রাতের নিকষ ঘন কালো অন্ধকার গোটা পৃথিবীকে ঢেকে ফেলবে, তখনই বনের হিংস্র জানোয়ারগুলো মুসলমানদের দেহ নিয়ে নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি শুরু করবে।

হযরত সা'দ বুঝতে পারলেন, মুসলিম বাহিনী এই হিংস্র শ্বাপদ সঙ্কুল পরিবেশে রাত্রি যাপন করতে ইতস্তত করছে। তিনি জঙ্গলের পাশে একটি উঁচু মঞ্চ স্থাপন করে ঐ মঞ্চের ওপরে দাঁড়িয়ে বজ্রকণ্ঠে হুংকার দিয়ে ঘোষণা করলেন-

يَـاَيـُّهَاالْـحَـشَـرَتُ والسِّـبَاعُ نَحْنُ اَصْحَابُ رَسُـوْلَلّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَارْجِعُوْا فَاِنَّ نَازِلُوْنَ فَمَنْ وَجَدْنَا بَعْدَهٗ قَتَلْنَاهُ-

হে বনের হিংস্র প্রাণীরা। আমরা আল্লাহর রাসূলের সাহাবী। আমরা এসেছি আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের উদ্দেশ্য নিয়ে। সুতরাং এই রাত্রির জন্য আমাদেরকে নিরাপত্তা দাও। তা যদি না দাও তাহলে আমাদের তরবারী তোমাদের মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত।

আফ্রিকার মানুষগুলো হযরত সা'দের এই অভাবনীয় কান্ড দেখে মন্তব্য করলো, এরা পাগল নাকি! বনের পশুরা কি কখনো মানুষের কথা শোনে? কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, হযরত সা'দের এই কথা শোনার সাথে সাথে সিংহ, বাঘ, সাপ এবং অন্যান্য

প্রাণীসমূহ যার যার সারিতে শাবক মুখে নিয়ে আল্লাহর পথের সৈন্যদের জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়ে জঙ্গল ত্যাগ করলো। আল কোরআনের রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা এমন মানুষ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। আর আল কোরআনের রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা তখনই কেবল প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যখন ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত লোকগুলো হযরত হানযালার অনুরূপ ত্যাগ স্বীকার করে আন্দোলনের উত্তপ্ত ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

যুদ্ধ শেষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদদের জানাযা দিবেন এমন সময় হযরত হানযালার স্ত্রী এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামীর প্রতি গোসল ফরজ ছিল, কবর দেয়ার পূর্বে তাঁকে গোসল করানো প্রয়োজন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হানযালার লাশের অনুসন্ধান করবেন, এমন সময় সাইয়েদেনা হযরত জিব্রাইল আলাইহিস্ সালাম এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! হানযালাকে গোসল দেয়ার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রতি খুশী হয়েছেন। তাঁকে ফেরেশ্তা কর্তৃক গোসল দেয়া হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদের এ কথা জানিয়ে দিলেন। তাঁরা ছুটে গেলেন হযরত হানযালার রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর লাশের কাছে। দেখলেন, তাঁর লাশ থেকে জান্নাতের ঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছে এবং দাড়ি ও চুল থেকে পানি ঝরছে। আল্লাহর পথে যে ব্যক্তি দুনিয়ার সমস্ত পিছুটান ভুলে দ্বীন কায়েমের জন্য প্রাণ দেয় তাঁকে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এমন বিরাট মর্যাদা দান করেন।

নেতার আদেশ মেনেছি প্রভু তোমারই লাগি

আয়োজন চলছে হোদায়বিয়ার সন্ধিপত্র লেখার। এমন সময় আবু জিন্দাল নামক একজন নও মুসলিম আহত অবস্থায় রাসূলের সামনে উপস্থিত হলেন। তিনি শিকল পরা অবস্থায় শরীরে নির্যাতনের চিহ্ন নিয়ে কাফিরদের বন্দীশালা থেকে কোন ক্রমে পালিয়ে এসেছেন। ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও সাথী ভাইদের কাছে বিস্তারিত বর্ননা করলেন, এই আন্দোলনে শামিল হওয়ার কারণে মক্কার লোকেরা তাঁর ওপরে কি নির্মম নিষ্ঠুর নির্যাতন চালিয়েছে। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিম ভাইদের কাছে নিজের নিরাপত্তা চাইলেন। আবু জান্দালের পিতা ইসলাম বিরোধীদের নেতা সোহাইল তীব্র প্রতিবাদ করে বললো, আপনারা

আমার সন্তান আবু জান্দালকে কোন ক্রমেই মদীনায় নিয়ে যেতে পারবেন না। সন্ধির শর্ত পূরণ করার এখনই উপযুক্ত সময়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্মিত হেসে বললেন– সোহাইল! সন্ধিপত্র এখনো লিপিবদ্ধ হয়নি-সুতরাং সন্ধির শর্তানুযায়ী চলতে আমরা আইনত বাধ্য নই।

তর্কবিতর্ক চরমে উঠলো। আবু জান্দাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর পিতাসহ মক্কার কাফিররা কোনক্রমেই আবু জান্দালকে মদীনায় যেতে দেবেনা। আবু জান্দাল তাঁর দেহের নির্যাতনের চিহ্নসমূহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদেরকে প্রদর্শন করে করুণ কণ্ঠে আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমাকে ওদের মধ্যে ফিরিয়ে দেন তাহলে ওরা আমাকে প্রাণেই মেরে ফেলবে। দেখুন, কি নির্মমভাবে ওরা আমার প্রতি নির্যাতন করেছে। দিনের পর দিন আমাকে ক্ষুধা-পিপাসায় কষ্ট দিয়ে শুধুই প্রহার করেছে। শিকল দিয়ে আমাকে বেঁধে রেখেছে। আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে সাথে নিয়ে যান।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশ্রু সজল চোখে, বুকে পাথর চাপা দিয়ে বাস্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, হে আবু জান্দাল! সন্ধির শর্তানুযায়ী তোমাকে ওদের কাছেই ফীরে যেতে হবে।

আল্লাহর রাসূল ইসলামী আন্দোলনের মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত নেতা। তাঁর কথা শুনে আবু জান্দালের আশার প্রদিপ মুহূর্তে নিভে গেল। মুক্তির প্রত্যাশায় তিনি কষ্টের পাহাড় ডিঙিয়ে নেতার সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন। উপস্থিত মুসলমানদের মনে তাঁদেরই এক মুসলিম ভাই আবু জান্দালের জন্য ব্যথার বহ্নিশিখা জ্বলে উঠলো। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আল্লাহর রাসূলকে ব্যথা কাতর কণ্ঠে বলে উঠলেন, আপনি তো প্রকৃতই আল্লাহর নবী। তাহলে আপনি কেন এমন অপমানজনক সন্ধি মেনে নিচ্ছেন?

আল্লাহর নবী শান্ত-স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, ওমর আমি অবশ্যই আল্লাহর নবী এবং এ জন্যই তো আল্লাহর অভিপ্রায়ের বিপরীতে আমি যেতে পারিনা। সর্বাবস্থায় আমি আল্লাহর প্রতি নির্ভর করি। আল্লাহই আমাদের একমাত্র সহায়। তিনি আমাদেরকে যেদিকে পরিচালিত করবেন, আমরা সেদিকেই যাবো।

সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ করা হলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু জান্দালকে অশ্রুসিক্ত নয়নে বললেন, তুমি ফিরে যাও। আল্লাহর হেফাজতে তোমাকে দিলাম। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সকল বিপদ হাসি মুখে মেনে নেবে।

তোমার জন্য আল্লাহ্ অবশ্যই একটা সুন্দর পথ বের করে দেবেন। সকল অবস্থায় আল্লাহর প্রতি নির্ভর করবে।

কি কঠিন আনুগত্য! একদিকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে অপমানজনক সন্ধি গ্রহণ অপরদিকে আর এক মুসলিম ভাইকে নির্যাতনের মুখে নিক্ষেপ করা। এ অবস্থায় নেতার আনুগত্য করা চরম কঠিন পরীক্ষা। আবু জান্দালকে ঐ শিকল পরা অবস্থায় ফিরে যেতে হলো মক্কার কাফিরদের মধ্যে। উপস্থিত মুসলমানরা সজল চোখে তাঁদের এক ভাইকে সন্ধির শর্তানুযায়ী নির্যাতনের মুখে ঠেলে দিতে বাধ্য হলেন। ঈমানের অগ্নিপরীক্ষায় নেতার প্রতি আনুগত্যের প্রশ্নে ইসলামী আন্দোলনের নির্যাতিত কর্মীরা উত্তীর্ণ হলো। এজন্য এই আন্দোলনের কর্মীদেরকে সকল অবস্থায় নেতার প্রতি আনুগত্য ও প্রবল ধৈর্য্য নিয়ে প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলা করতে হবে। হোদায়বিয়াতে ইসলামের মুজাহিদরা যে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলো, পরবর্তী বছরেই মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে তার সুফল পাওয়া গেল। ইসলাম একটি বিজয়ী অপ্রতিরোধ্য শক্তি হিসাবে পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করলো।

পিতা! তোমাকে হারিয়ে দিলাম

হযরত সা'দ সালমী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আফ্রিকার বিশাল দেহী কালো মানুষ। চেহারার গঠনও তেমন সুন্দর নয়। কিন্তু হৃদয় তাঁর আল্লাহ ও তাঁর নবীর প্রেমে পরিপূর্ণ। একদিন তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে লজ্জা জড়িত কণ্ঠে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার বিয়ের প্রয়োজন, কিন্তু আমি কালো কুৎসিত বলে কেউ আমার সাথে মেয়ে বিয়ে দিতে আগ্রহী নয়। আপনি অনুগ্রহ পূর্বক আমার বিয়ের ব্যবস্থা করে দিন।

আল্লাহর নবী তদানীন্তন সমাজের সম্মানিত ধনী ব্যক্তি হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর কাছে পত্র পাঠালেন। পত্রে লিখা হলো, 'আমের! পত্র বাহকের সাথে তোমার মেয়েটির বিয়ে দাও।'

হযরত সা'দ আনন্দিত চিত্তে আল্লাহর রাসূলের পত্র নিয়ে হযরত আমরের হাতে দিলেন। পত্র পাঠ করে হযরত আমর বিচলিত হয়ে উঠলেন। তিনি হযরত সা'দ সালমীকে বললেন, 'তুমি এখানে অপেক্ষা কর, আমি আমার মেয়ের মতামত জেনে তোমাকে জানাবো।'

হযরত আমরের মেয়ে আড়াল থেকে তাঁর পিতা ও পত্র বাহকের কথপোকথন শুনলো এবং পিতার মনোভাব বুঝতে পারলো যে, তাঁর পিতা তাঁকে ঐ কালো মানুষটির সাথে বিয়ে দেবেন না। মেয়েটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। হযরত আমর মেয়ের কান্না দেখে স্নেহ মাখা কণ্ঠে বললেন, 'মা, তোমার মত সুন্দরী মেয়ের সাথে ঐ কুৎসিত মানুষটির বিয়ে আমি দেবনা। তুমি কেঁদনা, আমি পিতা হয়ে তোমার জীবন নষ্ট করতে পারিনা।'

হযরত আমরের মেয়ে কান্না জড়িত কণ্ঠে বললো, 'আব্বা! আফ্রিকার ঐ কালো কুৎসিত দর্শন মানুষটির সাথে আমাকে বিয়ে দেবেন, এ জন্য আমি কাঁদছি না।'

পিতা বিস্মিত দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন, 'তাহলে তোমার কারণ কি?

মেয়েটি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে পিতাকে জানালো, 'আব্বা কাঁদছি এ জন্য যে, আমার কত বড় সৌভাগ্য যে, স্বয়ং আল্লাহর রাসূল আমার বিয়ের জন্য পাত্র নির্বাচন করে প্রেরণ করেছেন। আজ যদি আল্লাহর হাবীবের নির্বাচিত পাত্রকে আপনি ফেরৎ দেন, তাহলে পুনরায় কি আমার ভাগ্যে স্বামী হিসেবে আল্লাহর নবীর নির্বাচিত কোন পাত্র জুটবে?'

হযরত আমর তাঁর মেয়ের কথা শুনে বিস্ময়ের ধাক্কা খেলেন। তিনি বিস্মায়িভূত দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে নত মস্তকে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। আল্লাহর রাসূলকে ভালোবাসার প্রতিযোগিতায় তিনি পিতা হয়ে মেয়ের কাছে হেরে গেলেন। গর্বে তাঁর বুকের ভেতরটা ভরে উঠলো। কিয়ামতের ময়দানে এই মেয়ের কারণে তিনি গর্ববোধ করবেন।

হযরত আমের কিছু অর্থ হযরত সা'দ সালমীর হাতে দিয়ে বললেন, 'যাও, বাজার থেকে বিয়ের সরঞ্জামাদি ক্রয় করে নিয়ে এসো। আজই তোমার সাথে আমার মেয়ের বিয়ে দেবো।

হযরতে সা'দ সালমীর অনেক দিনের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। মনে রঙিন কল্পনার জাল বুনতে বুনতে তিনি বাজারে গিয়ে বিয়ের সামগ্রী ক্রয় করে হযরত আমরের বাড়ির দিকে ফিরছেন। এমন সময় তিনি শুনতে পেলেন কে যেন উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করছে, 'প্রস্তুত হও, জিহাদে অংশগ্রহণ করে আল্লাহর জান্নাতের দিকে চলো।'

জিহাদের আহ্বানে ইসলামী আন্দোলনের জিন্দাদিল মুজাহিদ হযরত সা'দ সালমী পৃথিবীর যাবতীয় অস্তিত্ব ভুলে গেলেন। তিনি বিয়ে উপলক্ষ্যে ক্রয় করা সামগ্রী

দোকানীকে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'ভাই, এগুলোর বিনিময়ে আমাকে একটি ভাল তরবারি দাও।'

তরবারী হাতে হযরত সা'দ সালামী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু 'আল্লাহু আকবার' বলে গর্জন করে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অবিশ্রান্তভাবে তিনি তরবারী চালিয়ে যাচ্ছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিপাহ্সালার হিসেবে যুদ্ধের ময়দান পরিদর্শনে এসেছেন। তিনি দেখলেন, হযরত সাদে সালমীর কালো হাত আল্লাহর দুশমনদের রক্তে লাল হয়ে গিয়েছে। তিনি হযরত সা'দের নাম ধরে আহ্বান করলেন।

অনেক সময় গত হয়েছে, আল্লাহর নবীকে হযরত সা'দ দেখেননি। নবীর সুমধুর কণ্ঠের আওয়াজ কর্ণকুহরে প্রবেশ করার সাথে সাথে হৃদয়ের মধ্যে নবী প্রেমের স্রোত প্রবাহিত হলো। 'আমি উপস্থিত হে আল্লাহর রাসূল!' হযরত সা'দ আল্লাহর নবীর আহ্বানে সাড়া দিলেন। নবী কণ্ঠের আওয়াজ লক্ষ্য করে হযরত সা'দ পেছনের দিকে ফিরেছেন। এই সুযোগে আল্লাহর এক দুশমন নবীর এই প্রেমিককে তরবারী দিয়ে আঘাত করলো। হযরত সাদ শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন।

যুদ্ধ অবসানে শহীদদের জানাযা হচ্ছে। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম হযরত সা'দ সালমীর জন্য নিরবে অশ্রু বিসর্জন করছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সা'দ সালমীর লাশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছেন। তাঁর পবিত্র মুখে ফুটে উঠেছে জান্নাতী হাসি। সাহাবায়ে কেরাম কাঁদছেন আর আল্লাহর রাসূলের মুখে হাসি! উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম বিস্ময় বোধ করলেন। তাঁরা জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রাসূল!

জানতে চাইলেন– ইয়া রাছুলুল্লাহ্, আমরা সা'দের বিচ্ছেদে কষ্ট অনুভব করছি। কিন্তু আপনার মুখে হাসি!

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আমি যেসব দৃশ্য দেখতে পাই তোমরা তা দেখতে পাও না। আমি দেখছি, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সা'দের প্রতি এত অধিক খুশী হয়েছেন যে, জান্নাত থেকে তাঁর লাশের ওপরে পুষ্প বর্ষিত হচ্ছে।

হযরত আমর এবং তাঁর কন্যা আল্লাহর রাসূলের প্রতি তথা নেতার প্রতি আনুগত্যের যেমন পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন, তেমনি তাঁরা রাসূলের প্রতি ভালোবাসার এক অভাবনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আদর্শ নিষ্ঠা ও নেতার প্রতি এ ধরনের আনুগত্যের কারণেই ইসলাম দ্রুত পৃথিবীময় বিস্তৃতি লাভ করেছিল। হযরত সা'দ

সালমীও আদর্শের প্রতি অপরিসীম প্রেমের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন । আদর্শকে মায়দানে টিকিয়ে রাখার জন্য তিনি সুন্দরী স্ত্রী লাভের কথা ভুলে গেলেন। আদর্শের প্রতি এমন সীমাহীন প্রেম ভালবাসা না থাকলে কোন আদর্শকে পৃথিবীব্যাপী বিজয়ী আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এভাবে অকাতরে জীবন বিলিয়ে দেয়ার মনোভাব না থাকলে বাতিল শক্তিকে পরাজিত করা সম্ভব নয়।

নীতি বদলায় না স্বজনের লাগি

তায়েফের পার্শ্ববর্তী স্থান জেরানার বন্দী শিবিরে হুনাইনের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে বন্দীদের মধ্যে এখনো ছয় হাজার বন্দীর মুক্তির ব্যবস্থা হয়নি। এদের মধ্যে অধিকাংশ হাওয়াযেন গোত্রের লোক। হাওয়াযেন গোত্রের একটি অংশ বনি সাদ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বনি সাদ গোত্রের বিদুষী নারী হযরত হালিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার দুধপান করেছেন। হযরত হালিমাতুস্ সাদিয়া আল্লাহর রাসূলের দুধমাতা।

এই বনি সাদ গোত্রেই আল্লাহর রাসূল শৈশবকাল অতিবাহিত করেছেন। সে গোত্রের লোকজন মুসলমানদের হাতে যুদ্ধের ময়দানে বন্দী হয়েছে। বন্দীদের পক্ষ থেকে একটি সম্মানিত প্রতিনিধি দল আগমন করলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে। দলনেতা যুহাইর বিন সাদ আল্লাহর রাসূলের কাছে নিবেদন করলেন, বন্দী শিবিরে আপনার দুধ মাতার পক্ষ থেকে আপনার আত্মীয়, আপনার কয়েকজন ফুফু ও খালা রয়েছেন। আল্লাহ্ সাক্ষী, আরব ভূ-খন্ডের মধ্যে থেকে যদি কোন বাদশাহ আমাদের বংশের কারো দুধ পান করতো তাহলে তাঁর কাছে আমাদের অনেক কিছুই চাওয়ার ছিল। কিন্তু আপনার কাছে আমাদের দাবী আরও অনেক বেশী।

আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে আগত প্রতিনিধিদলের কথা শুনলেন। তাঁর স্মৃতির পাতায় ভেসে উঠলো অতীত জীবনের শত সহস্র মধুময় স্মৃতি। শৈশবে যে এলাকায় তিনি বিচরণ করেছেন, যাদের সাথে জীবনের অনেকগুলো দিন অতিবাহিত করেছেন, তাঁরা আজ তাঁরই অনুসারী মুসলমানদের বন্দী শিবিরে অবস্থান করছে। বুকের ভেতরটা তাঁর নাড়া দিয়ে উঠলো। তিনি জানেন, তাঁর অঙ্গুলী সংকেতেই এরা মুক্তি পেতে পারে। কিন্তু না, সে অধিকার তার নেই। এ যে সমস্ত মুসলমানদের অধিকার। তিনি তো একনায়ক নন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মমতা জড়িত কণ্ঠে বললেন, আমি আমার গোত্রের পক্ষ থেকে যুদ্ধ বন্দীদের ওপর যতটুকু অধিকার রাখি, আমি তা ত্যাগ করলাম। নামাযের পরে আমি সমবেত মুসলমানদের সিদ্ধান্ত আপনাদের জানাবো। আপনারা ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করুন।

নামাযের জামায়াত অনুষ্ঠিত হলো। তারপর আল্লাহর রাসূল সমবেত মুসলমানদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, আমি আমার গোত্রের দাবী যুদ্ধবন্দীদের ওপর থেকে প্রত্যাহার করছি এবং তোমাদের কাছে সকল বন্দীদের মুক্তির জন্য সুপারিশ করছি। সমবেত মুসলমান বলে উঠলো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সিদ্ধান্তই আমাদের সিদ্ধান্ত। আমাদের গোত্রের অধিকার আপনার ওপরে আমরা অর্পন করলাম।

সকল বন্দী মুক্তি লাভ করলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইচ্ছে করলে মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতীরেকেই সকল বন্দীকে মুক্তি দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি সে সময়ে মুসলমানদের শাসক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং একজন সাধারণ মুসলমান যে অধিকার ভোগ করবে তার থেকে এ্রকবিন্দু বেশী তিনি ভোগ করতে পারেন না। দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নেতৃবৃন্দের এই অধিকার নেই যে, তিনি নিজ ইচ্ছায় কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। মজলিশে শুরার পরামর্শ ব্যতীরেকে নেতা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম নন। ইসলাম সাধারণ মানুষকে এই অধিকারই প্রদান করেছে। গনতন্ত্রের নামে ইসলাম ধোকাবাজি আর স্বজন প্রীতি প্রশ্রয় দেয়নি।

পাশ্চাত্যের গনতন্ত্রের মাধ্যমে জাতিকে ধোকা দিয়ে সমাজ ও দেশে অসৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথ যেমন সুগম করা হয়েছে, তেমনই স্বজন প্রীতির কারণে যোগ্য ও দক্ষ ব্যক্তিবর্গ যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা পাচ্ছে না। অধিকাংশ মুসলিম দেশসমূহের শাসক গোষ্ঠী ও দেশের রাজনৈতিক দলসমূহ পাশ্চত্যের ভোগবাদী গণতন্ত্রের অনুসারী। এসব নামধারী মুসলিম নেতৃবৃন্দ মৃত্তিকা-পাথরে নির্মিত মূর্তির পূজা বাহ্যিকভাবে পরিহার করলেও এরা এদের হৃদয়ের কোণে স্বযত্নে এমন এক মূর্তির পূজা করে, যে মূর্তি কোথাও গণতন্ত্রের কোথাও বা রাজতন্ত্রের আবরণে আবৃত। মৃত্তিকা-পাথরে নির্মিত মূর্তি জড়পদার্থ, তাদের কোনো অনুভূতিই নেই। তাদের দেহে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজিত থাকলেও সেগুলো তারা ব্যবহার করার ক্ষমতা রাখে না। কিন্তু পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের যে মূর্তি, তা অধিকাংশ মানুষের রায় তথা মতামতকে গ্রহণ করে, অনুসরণ করে এবং আইন হিসাবে দেশের বুকে প্রয়োগ করে। ভোগবাদী গণতন্ত্রের এই মূর্তি সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য, সাধুকে চোর, চোরকে সাধু, বৈধকে অবৈধ, অবৈধকে বৈধ বানানোর ক্ষমতাও সংরক্ষণ করে।

পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র নামক এই মুর্তির অন্ধ পূজারীদের কাছে স্থায়ী কোন মূল্যমান নেই- এদের কাছে সত্য আর মিথ্যা, ন্যায় আর অন্যায়ের চিরন্তন কোন মানদন্ড নেই। এদের মানদন্ড হলো দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণের রায় বা মতামত। আবার সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণের রায়ের যথাযথ প্রতিফলনের ব্যবস্থাও পাশ্চাত্যের তথাকথিত গণতন্ত্রে যেমন অনুপস্থিত- তেমনি সুক্ষ্ম কারচুপি, অনিয়ম ও অস্বচ্ছতার আশ্রয় গ্রহণ করে প্রকৃত জনরায়কে ভিন্ন পথে পরিচালিত করার সুযোগ রয়েছে।

দেশের জনসমষ্টির মধ্যে যদি ৫১ জন মানুষ সত্যকে মিথ্যা বলে রায় দেয়, তাহলে পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র সত্যকে মিথ্যা বলেই গ্রহণ করতে বাধ্য। পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রে সংখ্যা গরিষ্ঠের রায় বা মতামতের মোকাবেলায় আল্লাহর নাযিল করা কোরআনও বড় সত্য নয়। ৫১ জন মানুষ যে রায় বা মতামত দিলো, সেই ৫১ জন মানুষের চিন্তা-চেতনা, নীতি-আদর্শ, রুচিবোধ, মননশীলতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, সামাজিক অবস্থান, ন্যায়-নীতির বিচারবোধ, সত্য-মিথ্যা যাচাই করার যোগ্যতা কোনোটিই ধর্তব্য নয়। অশিক্ষিত, বিবেক-বুদ্ধি, বিচারবোধ শূন্য, দেশ-সমাজ ও সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে যাদের ন্যূনতম জ্ঞান নেই, এমন ধরনের ভোঁতা ও জড় বুদ্ধির অধিকারী সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী একদিকে রায় বা মতামত দিলো, অপরদিকে ইসলামী চিন্তা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ, উন্নত বিবেক-বুদ্ধি, চিন্তাধারা, মননশীলতা, রুচিবোধ, সমাজ, সভ্যতা-সংস্কৃতি সচেতন দেশ ও সমাজের সংখ্যা লঘিষ্ঠ জনগোষ্ঠী তথা ৫০ জন মানুষ আরেকদিকে রায় বা মতামত পেশ করলো, পাশ্চাত্যের এই ভোগবাদী গণতন্ত্র নামক মূর্তি সংখ্যা লঘিষ্ঠের সুচিন্তিত রায়কে পদদলিত করে অবিবেচনা প্রসূত অজ্ঞ জড়বুদ্ধির অধিকারী সংখ্যা গরিষ্ঠের রায়কেই সমাদরে গ্রহণ করলো।

শুধু তাই নয়, পাশ্চাত্যের ভোগবাদী গণতন্ত্রের অনুসারীরা ক্ষেত্র বিশেষে সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণের মতামতেরও মূল্য দেয় না। সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আল্লাহর বিধান অনুসরণের লক্ষ্যে নির্বাচনে ইসলামপন্থী দলের পক্ষে যদি রায় দেয়, পাশ্চাত্যের ভোগবাদী গণতন্ত্রের অনুসারীরা সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণের সে রায়কে পদদলিত করতে সামান্যতম দ্বিধা করে না। এর প্রমাণ আলজেরিয়া ও তুরস্ক। ১৯৯২ সনে আলজেরিয়ার সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোরআন-সুন্নাহর বিধান অনুসরণ করার লক্ষ্যে ইসলামপন্থী দলকে নির্বাচনে বিজয়ী করলো। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্যের ভোগবাদী গণতন্ত্রের অনুসারীরা অস্ত্রের জোরে সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণের রায়কে পদদলিত করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করলো। তুরস্ক ও মিসরের দিকে দৃষ্টি দিলেও একই অবস্থা পরিলক্ষিত হবে। তুরস্কের সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণ

ইসলামপন্থী দলকে নির্বাচনে বিজয়ী করে রাষ্ট্র ক্ষমতায় পাঠায়, কিন্তু পাশ্চাত্যের ভোগবাদী গণতন্ত্রের অনুসারীরা নির্বাচনে বিজয়ী দলকে- দলের আদর্শ ইসলামের বিধান অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ দেয় না। এমনকি ইসলামপন্থী দল ও ব্যক্তিত্ব যেন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না পারে, এই জন্য আইনের মোড়কে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে মিশর ও তুরস্কে। পাশ্চাত্যের ভোগবাদী গণতন্ত্রের অনুসারীরা তাদের ভোগের পথে অন্তরায় সৃষ্টি হতে পারে, এ ধরনের কোন ব্যবস্থাকে সহ্য করে না।

পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র নামক এই মূর্তির কাছে মানুষের মেধা, যোগ্যতা, মননশীলতা, রুচিবোধ, উন্নত চিন্তাধারা, বিচার-বিবেচনাবোধ কোনো কিছুই বিবেচিত বিষয় নয়। বিবেচিত বিষয় শুধু সংখ্যাধিক্য। দেশ ও জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ পন্ডিত ব্যক্তির মতামত আর তারই গৃহের অশিক্ষিত বিবেক-বুদ্ধি ও বিচারবোধহীন পরিচারিকার মতামতের একই মূল্য পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র নামক মূর্তির কাছে। অর্থাৎ উভয়ের মতামতের একই মূল্য। এই গণতন্ত্র শতকরা ৫১ জন মানুষের মতামত বা রায়ের ভিত্তিতে কোরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল করার ক্ষমতা রাখে। পার্লামেন্টে সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে এরা চিরন্তন মূলবোধ ও সত্যকে মুহূর্তে কবরস্থ করতে পারে। পাশ্চাত্যের ভোগবাদী এই গণতন্ত্র নামক মূর্তির পূজারীদের কাছে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকল শক্তির উৎস নয়– দেশের জনগণই সকল ক্ষমতা ও শক্তির উৎস। অথচ আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেন–

وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الاَرْضِ يُضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ–

(হে নবী) আপনি যদি সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের অনুসরণ করেন তাহলে আপনি আল্লাহর পথ থেকে (সত্য পথ থেকে) পথভ্রষ্ট হয়ে যাবেন। (সূরা আনআ'ম-১১৬)

মুসলিম দেশসমূহে বাস্তব অবস্থার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে, খোলাফায়ে রাশেদীনের অনুসৃত নীতি পরিত্যাগ করে পাশ্চাত্যের ভোগবাদী গণতন্ত্রের মূর্তির পূজা করা হচ্ছে। এই গণতন্ত্রের নামে এমন এক নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে যে, যেখানে অজ্ঞ ও বিজ্ঞ লোকের মতামতের মূল্যমান সমান। অজ্ঞ ও বিজ্ঞ লোকের মতামতের মূল্যমান সমান হেতু এই সুযোগটির সদ্ব্যবহার করার জন্য কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে সমাজের অসৎ, অপরাধ প্রবণ ও পরস্বার্থ হরণকারী হিংস্র প্রকৃতির দুষ্কৃতিকারী লোকজন। তারা দেশ ও সমাজ সম্পর্কে অসচেতন, অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও ন্যায়-অন্যায়ের বিচার বোধহীন অভাবী লোকদের মধ্যে অর্থ বিলি-বন্টন করে নিজেদের পক্ষে রায় ক্রয় করছে। এ পথে নেতৃত্বের

আসন লাভ করার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা দেখা দিলে নানা ধরনের কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করছে। নেতৃত্বের আসন লাভ করার যাবতীয় কূট-কৌশল ব্যর্থ হলে তখন পেশী শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে সন্ত্রাসের মাধ্যমে নেতৃত্বের আসন দখল করে।

এর অনিবার্য বিষময় ফল দেশ ও সমাজের প্রত্যেক স্তরে প্রতিভাত হচ্ছে। অপরাধ প্রবন, অসৎ ও প্রকৃতির দুষ্কৃতিকারী লোকজন দেশ ও সমাজের নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়ে অশ্লিলতা, নগ্নতা, বেহায়াপনা, নোংরামী, অন্যায়-অত্যাচার, অবিচার, খুন-রাহাজানী, হত্যা-ধর্ষণ, শোষণ-নির্যাতন, শঠতা-প্রতারনা, প্রবঞ্চনা ও জুলুমের প্রত্যেকটি জ্বালা মুখ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। সর্বপ্লাবী বন্যার বেগে মুসলিম সমাজে নানা ধরনের অপরাধমূলক কর্মকান্ড ছড়িয়ে পড়েছে। কোরআন-সুন্নাহর মূল্যবোধ বিদায় করে দেয়া হয়েছে। নানা কৌশলে কোরআন-সুন্নাহর ধারক-বাহক ওলামা-মাশায়েখদের প্রতি মুসলিম জন-মানসে অভক্তি আর অশ্রদ্ধা সৃষ্টি করা হচ্ছে।

অপরাধ প্রবণ জালিম নেতৃত্বের অপরাধমূলক কর্মকান্ডের কারণে মুসলিম জনগোষ্ঠী ঈমানী দুর্বলতার শিকার হয়েছে। ঠিক এই সুযোগে সিংহসম সাহসের অধিকারী মুসলমানদের ঘাড়ের ওপর ইয়াহুদী-নাসারা ও মুশরিক নামক চির ভীরু শৃগালের গোষ্ঠী উদ্বাহু নৃত্য শুরু করেছে। মুসলমানদের এই করুণ অবস্থা দেখে বিশ্বকবি আল্লামা ইকবাল (রাহঃ) বলেছেন–

শের কি সার পে বিল্লি খেল রাহি, ক্যায়সা হ্যায় মুসলমাঁ কা বদ নসীব,
শাহাদাত্ কি তামান্না ভুল গ্যায়ি, তাছ্‌বি কি দাঁনু মেঁ, জান্নাত ঢুঁড্ রাহী।

সিংহের মাথার ওপর আজ বিড়াল খেলা করছে। বড়ই দুর্ভাগ্য মুসলমানদের, তারা শাহাদাতের আকাংখা ভুলে গিয়ে তছ্‌বিহ্ দানার মধ্যে জান্নাত অনুসন্ধান করছে।

অপরাধ প্রবণ ভোগ-বিলাসে মত্ত নামধারী মুসলিম নেতৃত্ব ও মুসলিম জনতার ঈমানী দুর্বলতার সুযোগে মানবতার দুশমন, পাশ্চাত্যের ভোগবাদী গনতন্ত্রের অনুসারীগণ, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তাদের সহাযোগিরা দস্যু-তস্কর এবং নরখাদকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে মুসলিম দেশসমূহে আগ্রাসন চালিয়ে মুসলমানদের রক্তস্রোত বইয়ে তাদের যাবতীয় সম্পদ লুট করে নিজেদের ভান্ডার পরিপূর্ণ করছে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সৃষ্টিগতভাবে মানুষকে যে মৌলিক অধিকারসমূহ প্রদান করেছেন, গুটি কয়েক শক্তিমান ও প্রভাবশালী মানুষ তা হরণ করেছে। অধিকারহারা বঞ্চিত মানুষ সর্বত্র শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। ইনসাফ নামক শব্দটিকে কফিন আবৃত করে পেরেক ঠুকে দেয়া হয়েছে। কোথাও ন্যায় বিচার নেই, সর্বত্র মজলুম মানুষের হাহাকার। বঞ্চিত জনতার করুণ আর্তচিৎকারে আকাশ-বাতাস বেদনা বিধূর হয়ে উঠেছে।

এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে কোরআন-সুন্নাহর আলোকে জাতীয় ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে নেতা নির্বাচনের মানদন্ড নিরুপন করতে হবে। একদিকে যেমন নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রত্যেক ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনতে হবে, অপরদিকে নেতৃত্বের যোগ্য কোন্ শ্রেণীর মানুষ, সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার ভিত্তিতে নির্বচনে মনোনয়ন দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে দেশের রাজনৈতিক দলসমূহকে অগ্রণী ভুমিকা পালন করেতে হবে। বর্তমানে নেতা নির্বাচিত করার বা নির্বাচনে নমিনেশন দেয়ার য়ে পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে, এই পদ্ধতি ইসলাম অনুমোদন করে না। কারণ এই পদ্ধতি অত্যন্ত ক্রুটিপূর্ণ এবং দেশ ও জাতীর জন্য ক্ষতিকর।

নির্বাচন কালে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলসমূহ যে প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিকে নমিনেশন প্রদান করে, এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করে আল্লাহভীরু সৎ মানুষের পক্ষে নির্বাচিত হয়ে নেতৃত্বের পদে আসীন হওয়া প্রায় অসম্ভব। কারণ, যখন নমিনেশন দেয়া হয় তখন প্রার্থী– নির্বাচনে সর্বাধিক অর্থ ব্যয় করতে সক্ষম কিনা অথবা যে কোনো প্রকারে বিজয়ী হতে সক্ষম কিনা, সেদিকটিই দলের নীতি-নির্ধারকদের কাছে মুখ্য হয়ে দেখা দেয়। কারণ, দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার লক্ষ্যে। এ ক্ষেত্রে সর্বাধিক সংখ্যক সদস্যকে বিজয়ী করে আনার প্রতিই দলের লক্ষ্য থাকে নিবদ্ধ।

সুতরাং প্রার্থী আল্লাহভীরু-সৎ, চরিত্রবান কিনা, তার অর্থ-সম্পদ বৈধ পথে অর্জিত কিনা, তিনি প্রকৃত অর্থেই জনগণের সেবা করবেন, না নেতৃত্বের পদ দখল করে যে কোনো উপায়ে অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করবেন, অথবা নিজের নাম-যশ, প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারের লক্ষ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন কিনা, প্রার্থী নিজের এলাকায় সর্বাধিক সৎ ও ভদ্র কিনা, প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, মেধা, জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি, নীতি-আদর্শ, রুচিবোধ, মননশীলতা ইত্যাদি কোন্ পর্যায়ের, ক্ষমতা লিপ্সু রাজনৈতিক দল এসব দিকে দৃষ্টি দেয়ার কোনো প্রয়োজন বোধ করে না। ফলে অসৎ উপায়ে যারা ধন-সম্পদ অর্জন করেছে এবং পেশীশক্তি প্রয়োগ করে প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করেছে, এই শ্রেণীর অসৎ লোকগুলোর জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে নেতৃত্বের আসন দখল করার পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়।

সুতরাং এই পদ্ধতি পরিহার করে রাজনৈতিক দলসমূহকে ঐসব লোককেই স্ব-স্ব এলাকায় নমিনেশন দিতে হবে, যে লোক আল্লাহভীরু, সৎ-চরিত্রবান। নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে নেতৃত্বের আসন দখল করার অর্থই হলো, তিনি জনগণের সেবা করতে চান। জনগণের সেবা করা সর্বাধিক দায়িত্বপূর্ণ, কষ্ট, ত্যাগ ও পরিশ্রমের

কাজ। তদুপরি এই কঠিন কাজের পেছনে অর্থাৎ জনগণের সেবা করার পেছনে নগদ স্বার্থ জড়িত থাকবে না, এই কাজ হতে হবে নিঃস্বার্থ। আর সাধারণ মানুষের স্বভাব হলো, যে কাজ অত্যন্ত কঠিন, দায়িত্বপূর্ণ, কষ্টের-পরিশ্রমের ও ত্যাগের এবং যে কাজে নগদ প্রাপ্তি নেই, সে কাজ থেকে নিজেকে স্বযত্নে দূরে রেখে অন্যের ওপরে তা চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। নিজেকে দায়িত্ব মুক্ত রাখতে চায়।

তাহলে যারা জনগণের সেবা করার নামে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে নেতৃত্বের আসন দখল করার উদ্দেশ্যে দলের পক্ষ থেকে নমিনেশন লাভের জন্য রীতি মতো প্রতিযোগিতা করে, নমিনেশন লাভের পথ কন্টক মুক্ত করার জন্য প্রতিযোগীকে প্রতিযোগিতা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা ব্যর্থ হলে হত্যা করাতেও দ্বিধা করে না, দলের পক্ষ থেকে নমিনেশন লাভে ব্যর্থ হলে দলের সিদ্ধান্ত অমান্য করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে, অঢেল অর্থ ব্যয় করা সহ যে কোনো উপায়ে নেতৃত্বের আসন দখলে মরিয়া হয়ে ওঠে। জনগণের সেবা করা ও নেতৃত্ব দেয়ার এই চরম কঠিন, দায়িত্বপূর্ণ, কষ্টের, ত্যাগের ও পরিশ্রমের কাজের দায়িত্ব নিজের কাঁধে উঠিয়ে নেয়ার পেছনে তাদের নিশ্চয়ই সৎ উদ্দেশ্য নিহিত থাকে না– এ বিষয়টি অনুধাবন করা কঠিন কিছু নয়।

ঠিক এ কারণেই নেতৃত্বের পদ চেয়ে নেয়া বা এই পদের ব্যাপারে অভিলাষ পোষন করার ক্ষেত্রে ইসলাম অনুমতি দেয়নি। হযরত আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, দুই জন লোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলো এবং তাঁদের একজন আবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! মহান আল্লাহ আপনাকে যে বিরাট দায়িত্ব-ক্ষমতা দান করেছেন তার কোনো দায়িত্বপূর্ণ কাজে আমাকে নিযুক্ত করুন। অন্যজনও অনুরূপ প্রার্থনা জানালো। তাঁদের কথা শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন– আল্লাহর শপথ, আমি এই কাজে এমন কাউকেও নিযুক্ত করবো না, যে এর জন্য প্রার্থনা করে এবং তা পাবার জন্য লোভ পোষন করে। (মুসলিম)

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– নেতৃত্বের পদ লাভের জন্য আগ্রহ পোষণ করো না। কারণ এই পদ যদি তুমি প্রার্থনা করে লাভ করো, তাহলে তোমাকে এই পদের কাছে সোপর্দ করে দেয়া হবে। আর নেতৃত্বের পদ যদি প্রার্থনা ব্যতীতই পাওয়া যায়, তাহলে (সেখানে দায়িত্ব পালনের জন্য অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে) তোমাকে সাহায্য করা হবে। (বোখারী, মুসলিম)

সুতরাং নেতৃত্বের পদ অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ পদ, এটা এমন কঠিন দায়িত্ব যে-কোনো বুদ্ধিমানই এই পদের জন্য আগ্রহী হতে পারে না বা তা লাভ করার জন্য চেষ্টা-সাধনা করতে পারে না। এরপরও যদি কোনো ব্যক্তি চেষ্টা-সাধনা করে নেতৃত্বের পদ লাভ করতে আগ্রহী হয়, তাহলে বুঝতে হবে, সে নেতৃত্বের পদের গুরুত্ব, তীব্রতা ও কঠোরতা অনুধাবন করেত পারেনি-অথবা সব কিছু জেনে বুঝে নিছক স্বার্থ ও ক্ষমতার লোভ-লালসার কারণেই সে নেতৃত্বের পদ লাভের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। এই ধরণের কোন ব্যক্তি নেতৃত্বের পদ পাওয়ার যোগ্য নয় এবং যে ব্যক্তি নেতৃত্বের পদ লাভের জন্য চেষ্টা-সাধনা করবে, তাকে এমন সুযোগ দেয়াও ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

পক্ষান্তরে নেতৃত্বের পদ লাভের আগ্রহ, চেষ্টা-সাধনা ব্যতীতই যার ওপরে দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার অর্পণ করা হয়েছে, সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার জন্য আল্লাহর কাছ থেকে রহমত ও সাহায্য নাযিল হবে। কারণ এই নেতৃত্বের পদ সে নিজে প্রার্থনা বা চেষ্টা করে লাভ করেনি, এ জন্য তার আগ্রহও ছিলো না। আগ্রহ, চেষ্টা-সাধনা ও প্রার্থনা ব্যতীতই আল্লাহর মঞ্জুরীক্রমে জনগণের পক্ষ থেকে তার ওপর অর্পিত হয়েছে। এ জন্য এই দায়িত্ব পালনে সে আল্লাহর রহমত ও জনগণের আন্তরিক সহযোগিতা লাভ করতে পারবে।

এ জন্য নির্বাচনে নমিনেশন দেয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলসমূহকে আল্লাহভীরু সৎ লোক বাছাই করে নমিনেশন দিতে হবে। রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ প্রত্যেক এলাকায় অনুসন্ধান করে দেখবেন, সে এলাকায় কোন্ ব্যক্তি সবথেকে বেশী আল্লাহকে ভয় করেন, সৎ-চরিত্রবান, উত্তম জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী, মেধাবী, নিঃস্বার্থ, ত্যাগী, দক্ষ-যোগ্য, জনপ্রিয় ইত্যাদি গুণ-বৈশিষ্টের অধিকারী, তাকেই নির্বাচনে নমিনেশন দিতে হবে। অপরদিকে জনগণের মধ্যেও এই অনুভূতি শানিত করতে হবে যে, ভোট একটি আমানত। এই আমানত সম্পর্কে আদালতে আখিরাতে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এ জন্য এই আমানতের খেয়ানত তথা অপব্যবহার করা যাবে না। অর্থাৎ এমন কোনো ব্যক্তিকে ভোট দেয়া যাবে না, যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে না, যার মধ্যে আল্লাহর ভয় নেই, অসৎ-অযোগ্য। হতে পারে সে ব্যক্তি নিজের পিতা, ভাই বা কোনো ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। সে ব্যক্তি যদি আল্লাহর বিধান অনুসরণে নিষ্ঠাবান না হয়, অসৎ-অযোগ্য হয় তাহলে তাকে ভোট দেয়া যাবে না– এ ব্যাপারে জনগণকে সজাগ করতে হবে। এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করলে আল্লাহভীরু, সৎ-চরিত্রবান, দক্ষ ও যোগ্য নেতৃত্ব লাভ করার সুযোগ জাতি লাভ করবে এবং সমাজ ও দেশ থেকে যাবতীয় অনাচার দূরিভূত হবে ইন্‌শাআল্লাহ্।

জীবন ধন্য হলো পেয়ে জান্নাতের সনদ

সাহাবায়ে কেরাম একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন এসেছেন? আল্লাহর রাসূল জবাবে বললেন, এসেছি গোটা পৃথিবীর মানুষের শিক্ষক হিসেবে।
আল্লাহর রাসূল ইসলাম গ্রহণকারীকে কালিমা পাঠ করিয়েই ছেড়ে দিতেন না। তাঁর প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করতেন। তদানীন্তন যুগের ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে ইসলামের বিধি-বিধান শিক্ষা দিতেন। একবার এ ধরনের এক শিক্ষা শিবিরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইলেন, এখানে তোমাদের মধ্যে এমন কে আছো, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রোজা রেখেছো?

সিদ্দিকে আকবর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সর্বাগ্রে উত্তর দিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি রোজা রেখেছি।

তিনি পুনরায় জানতে চাইলেন, এমন কে আছো যে আজকে কোন মৃতদেহের জানাযায় অংশ গ্রহণ করেছো?

এবারও সিদ্দিকে আকবর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এই মাত্র এ কাজ করে ফিরছি।

আল্লাহর হাবীব পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, এমন কে আছো যে আজকে কোন রোগীর সেবা-যত্ন করেছো?

সিদ্দিকে আকবর স্বলজ্জ ভঙ্গিতে বললেন, আমি আজ কিছুক্ষণ এক রোগীর সেবা যত্ন করেছি।

সর্বশেষে আল্লাহর নবী জানতে চাইলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছো, আজ কোন অসহায় আল্লাহর বান্দাহকে কিছু সাহায্য করেছো?

এবারও হযরতে আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আজ একজন অভাবগ্রস্থ ব্যক্তিকে আমার সাধ্যানুযায়ী আর্থিক সাহায্য দিয়েছি।

প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর একা সিদ্দিকে আকবর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর মুখ থেকে শুনে শোষিত নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানবতার মুক্তির দীশারী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনন্দিত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, এতগুলো ভালো কাজ যিনি একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করেছেন, তিনি অবশ্যই আল্লাহর জান্নাতে প্রবেশ করেছেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন চরিত্রের কর্মী গড়ে ছিলেন, যাঁরা মানুষের দুঃখ-বেদনায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। অপরের দুঃখ কষ্টে তাঁরা সঞ্চল হয়ে উঠতেন। নিজেরা অভাব-অনটনের যন্ত্রনা সহ্য করে, ক্ষুধার্ত থেকে অন্যের অভাব ও ক্ষুধা দূর করতেন। দ্বীনি ভাইদের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখতেন। কেউ কোন অসুবিধায় আছে- জানতে পারলে সাথে সাথে তাঁরা প্রতিকারের ব্যবস্থা করতেন। কোন দ্বীনি ভাই-বোন অসুস্থ হলে তাঁরা শশব্যাস্তে ছুটে গিয়ে এমনভাবে সেবা যত্ন করতেন, মনে হতো যেনো তার আপন কলিজার টুকরা সন্তান অসুস্থ হয়ে পড়েছে। পরস্পরের প্রতি তাঁরা অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন বলেই তাঁদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল ইস্পাত নির্মিত প্রাচীরের ন্যায় ঐক্য। আর কেবল মাত্র এ ধরনের ঐক্য সৃষ্টি হতে পারে পরস্পরের দুঃখ-দুর্দশায় সাহায্যের অবারিত-উন্মুক্ত হস্ত প্রসারিত করলে। আর পরস্পরের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত না হলে ময়দানে বাতিল শক্তির সামনে টিকে থাকাও যায়না।

খোলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতকালে রাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত সর্বত্র অন্যায়-অবিচার, দুর্নীতি, দুষ্কৃতি তথা যাবতীয় অপরাধ থেকে মুক্ত ছিলো। সর্বত্রই সততা আর ন্যায়-নীতির চিহ্ন ছিলো আকাশের প্রজ্জ্বল সূর্যের মতোই স্পষ্ট। কারণ, তদানীন্তন সমাজের মানুষ পরস্পরের দুঃখ-বেদনা, অভাব-অনটন, বিপদ-মুসিবতে সাহায্যের হাত প্রসারিত করে দিয়েছে। ফলে তাঁদের মধ্যে অনৈক্য, ঝগড়া-বিবাদ বা কারো প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়নি। খলীফাতুর রাসূল হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর খেলাফতকালে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে প্রধান বিচারপতির পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছিলো। পরবর্তী অবস্থা ইতিহাসে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে–

فَمَكَثَ عَامًا كَامِلاً وَلَمْ يَخْتَصِمْ اِلَيْهِ اثْنَانِ فَقَالَ عُمَرُ (رضـ) مَا حَاجَةُ بِىْ عِنْدَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–

দীর্ঘ একটি বছর তিনি সেই পদে অবস্থান করলেন, কিন্তু একটি মামলা-মোকদ্দমাও তাঁর কাছে এলো না। তিনি খলীফার কাছে অনুযোগের সুরে বলেছিলেন, 'দীর্ঘ একটি বছর যাবৎ দেশের প্রধান বিচারপতির পদে আসীন রয়েছি, অথচ একটি মামলাও আমার কাছে এলো না। হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! মুমীন লোকদের জন্য আমার মতো বিচারকের কোনো প্রয়োজন নেই।'

খলীফা জানতে চাইলেন, 'বিশাল একটি দেশের বিপুল সংখ্যক জনতার পক্ষ থেকে একজন নাগরিকও দীর্ঘ এক বছরেও কারো বিরুদ্ধে একটি মামলাও দায়ের করলো না, এর কারণ কি?' জবাবে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন–

دِيْنَهُمُ النَّصِيْحَةُ وَمَنْهَجُهُمُ الْقُرْآنُ وَ عَمَلُهُمْ الاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهِيُ عَنِ الْمُنْكَرِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَعْرِفُ حَدَّهُ فَيَقِفُ عِنْدَهُ وَ اِذَا مَرِضَ اَحَدُ هُمْ عَادَوْهُ وَ اِذَا افْتَقَرَ نَصَرُوْهُ وَ اِذَا احْتَاجَ سَعَادُوْهُ فَفِيْمَا هُمْ يَخْتَصِمُوْنَ اِلَيَّ يَا رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟

তাঁদের তথা দেশের জনগণের দ্বীন-ই হলো পরস্পরকে সৎ উপদেশ দেয়া, তাঁদের জীবন চলার নির্দেশক হলো আল-কোরআন এবং তাদের কাজ হলো সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং অসৎ কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। দেশের প্রত্যেকটি মানুষ জানে তাদের নিজের চলার সীমা রেখা কোন্ পর্যন্ত এবং এজন্য তাঁরা নিজের সীমার কাছে থেমে যায়। তাঁদের মধ্যে কেউ একজন অসুস্থ হলে তাঁরা তাঁর সেবা করে, কেউ বিপদে নিপতিত হলে তাকে সাহায্য করে এবং কেউ অভাবী হলে তাকে সহায়তা করে। সুতরাং হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! তাঁরা কোন্ প্রয়োজনে কেন আমার কাছে বিচারের জন্য আসবে?

উল্লেখিত ঘটনাটির মধ্য দিয়ে সে যুগের সার্বিক অবস্থা প্রতিভাত হয়েছে। তাঁদের পরস্পরের মধ্যে ঐক্য ছিলো সুদৃঢ়, এ জন্য একের প্রতি অপরের ছিল গভীর মমতা। সে সময়ে প্রত্যেকটি মানুষ এ কথা অবগত ছিলো যে, জীবনের প্রত্যেকটি ব্যাপারে কে কতটুকু অগ্রসর হতে পারবে। কোন্ সীমা রেখা অতিক্রম করলে আখিরাতের কঠিন ময়দানে মহান আল্লাহর আদালতে জবাবদিহি করতে হবে, এ কথা তাঁদের হৃদয়ে জাগরুক ছিলো। এ কারণেই তাঁরা পরস্পরের অধিকারের প্রতি সজাগ ছিলেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু খলীফার প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছিলেন, তার সারমর্ম হলো, দেশের জনগণ পরস্পরে আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে জীবন পরিচালিত করে, ফলে তাদের মধ্যে কোনো সমস্যাই সৃষ্টি হয় না। তারা পরস্পর ইনসাফের ভিত্তিতে বসবাস করছে। কেউ কারো প্রতি সামান্যতম অবিচার করার প্রবণতাও প্রদর্শন করে না। সুতরাং আদালতে কেউ কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না।

অতিথিকে আপ্যায়ন করি নিজে থাকি অভুক্ত

আল কোরআনের সমাজ ও রাষ্ট্র নির্মাণের এক জিন্দাদীল কর্মী, পেটে অসহনীয় ক্ষুধা। ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে আবেদন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! ক্ষুধার যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারছি না, আমার জন্য কিছু খাদ্যের ব্যবস্থা করুন।'

আল্লাহর রাসূল বাড়িতে খবর নিয়ে জানলেন, সেখানেও কারো ঘরে কোন খাদ্যদ্রব্য নেই। তিনি উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামদের লক্ষ্য করে বললেন, একরাতের জন্য আমার এই মেহমানের দায়িত্ব কেউ গ্রহণ করতে সক্ষম কিনা।

হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমিআমার বাড়িতে দেখি, সেখানে কোন খাবার আছে কিনা।'

তিনি বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীর কাছে জানতে চাইলেন ঘরে কোন খাবার আছে কিনা। স্ত্রী জবাবে বললেন, বাচ্চাদের খাবার ব্যতীত অন্য কোন খাবার নেই। হযরত তালহা নিজ স্ত্রীকে বললেন, তোমার বাচ্চাদের তুলনায় আল্লাহর রাসূলের মেহমানের মর্যাদা অধিক। সুতরাং বাচ্চাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দাও। বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়লে আমরা মেহমানের সাথে আহারে বসবো। আহারের সময় তুমি কোন ছলে আলো নিভিয়ে দেবে। তখন আমি আর তুমি খাদ্য পাত্র নাড়াতে থাকবো, মেহমান বুঝবে আমরাও খাচ্ছি।

স্ত্রীকে প্রয়োজনীয় কৌশল শিখিয়ে হযরত তালহা আল্লাহর রাসূলের মেহমানকে বাড়িতে এনে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী মেহমানকে তৃপ্তি সহকারে আহার করালেন। মেহমান বুঝতে পারলেন না, যে ব্যক্তির বাড়িতে সে আহার করলো সে ব্যক্তি স্বপরিবারে অভুক্ত রইলো। খাদ্যের সবটুকু তাকেই আহার করিয়েছে। মেহমানকে পেট পূর্ণকরে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী ও ছোট বাচ্চাদের নিয়ে অনাহারে রাত অতিবাহিত করেছেন।

হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যখন ফজরের জামায়াতে উপস্থিত হলেন তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দিকে মমতার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, তালহা তুমি রাত্রে যেভাবে মেহমানদারী করেছো, ফলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তোমার প্রতি ভীষণ খুশি হয়েছেন এবং এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াত নাজিল হয়েছে–তারা তাদের নিজেদের প্রয়োজনের তুলনায় অপরের প্রয়োজনকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে যদিও তারা অভাবগ্রস্থ থাকে। (আল কোরআন)

সুতরাং ইসলামী আন্দোলনের এক কর্মী অপর কর্মীদের জন্য কঠিন ত্যাগ স্বীকারে সর্বদা প্রস্তুত থাকে। ফলে পরস্পরের মধ্যে শিশা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্য গড়ে ওঠে।

বেসেছি ভালো শুধু আল্লাহকেই

হযরত হানযালা ইবনে রুবাই তামিমী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু শশব্যস্তে ছুটে চলেছেন আল্লাহর রাসূলের কাছে। তাঁর ব্যস্ততা দৃষ্টে অনুমিত হচ্ছে তিনি যেন মহামূল্যবান কোন কিছু হারিয়ে ফেলেছেন। পথে সিদ্দিকে আকবর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর সাথে দেখা। হযরত হানযালার শশব্যস্ততা দেখে তিনি জানতে চাইলেন, ব্যাপার কি? এভাবে ছুটে যাচ্ছো কোথায়?

হযরত হানযালা হতাশ কণ্ঠে উত্তর দিলেন, ভাই! হানযালা মুনাফিক হয়ে গিয়েছে।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর কথায় বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলেন, সুব্‌হানাল্লাহ! সে কি?

হানযালা বললেন, ভাই আমি যখন আল্লাহর রাসূলের সান্নিধ্যে অবস্থান করি, তখন আমার অন্তরে প্রেম থাকে একমাত্র আল্লাহ ও তার রাসূলের জন্য। আল্লাহর নবী যখন জান্নাত-জাহান্নাম ও আখিরাতের বর্ণনা দেন তখন মনে হয় নিজ চোখে আখিরাতের ময়দান, জান্নাত-জাহান্নাম দেখছি। কিন্তু যখনই জাগতিক প্রয়োজনে রাসূলের সান্নিধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হই, তখন আমার মনের সে অবস্থা থাকে না। আমার মনে হয় আমি মুনাফিক হয়ে গিয়েছি। এ জন্য আল্লাহর রাসূলের কাছে যাচ্ছি।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কম্পিত কণ্ঠে বললেন, ভাই আমার মনের অবস্থা তোমারই অনুরূপ। বোধহয় আমাদের ঈমানে দুর্বলতা এসেছে, আমরা মুনাফিক হয়ে গিয়েছি।

এ কথা বলে তাঁরা উভয়েই দ্রুত পায়ে আল্লাহর রাসূলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন।

আল্লাহর নবী দেখছেন, আবু বকর ও হানযালা দ্রুত পদবিক্ষেপে তাঁর দিকেই ছুটে আসছেন। তাঁদের চেহারায় যেন সব হারানোর চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে রয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাবলেন, আবু বকরের মত নিরীহ লোকের এমন কি হয়েছে? কেন তিনি হানযালাকে সাথে নিয়ে এভাবে ছুটে আসছেন! তিনি অধির আগ্রহে তাঁদের অপেক্ষায় রইলেন। তাঁরা উভয়ে রাসূলের কাছে ভীত কম্পিত কণ্ঠে আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা মুনাফিক হয়ে গিয়েছি।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে চাইলেন– কি ব্যাপার, এমনকি ঘটেছে?

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, আমরা যখন আপনার

সান্নিধ্যে অবস্থান করি এবং আপনার মুখ থেকে মৃত্যু, কবর, কিয়ামত, হাশরের ময়দান ও জান্নাত-জাহান্নামের বর্ণনা শুনি তখন আমাদের মনে হয় আমরা এসব কিছু নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করছি। কিন্তু যখনই আপনার সান্নিধ্য ত্যাগ করে জাগতিক প্রয়োজনে সংসারে, ক্ষেত-খামারে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ফিরে যাই, তখন আমাদের মনের অবস্থা আর তেমন থাকে না। আমাদের মনে হয় আমরা মুনাফিক হয়ে গিয়েছি।

আল্লাহর নবী তাঁদের কথা শুনে বললেন, সেই সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার জীবন রয়েছে। তোমাদের মনের অবস্থা যদি সব সময় আমার কাছে থাকাকালীন অবস্থার মত হতো, তাহলে ফেরেশতারা তোমাদের সাথে পথে-প্রান্তরে সাক্ষাৎ করতো। মনে রেখো, মানুষের মনের অবস্থা সব সময় এক থাকে না। তোমরা আল্লাহর হক আদায় করবে, আবার নিজের ও অন্য মানুষের হকও আদায় করবে।

বৈরাগ্যবাদের স্থান ইসলামে নেই। ইসলাম একটি ভারসাম্যমূলক পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। পৃথিবীর, রাষ্ট্রের, সমাজের ও পরিবারের সমস্যা থেকে নিজেকে গুটিয়ে মসজিদের কোণে ধ্যানে বসে থাকার কোন সুযোগ ইসলাম দেয়নি। পৃথিবীতে সমস্যায় নিজেকে সম্পৃক্ত করে, সমস্যার ইসলামী সমাধান দেয়াই মুসলমানের দায়িত্ব-কর্তব্য। মুসলমান আখিরাতের চিন্তায় থাকবে ভীতিগ্রস্ত আর দুনিয়ার বাতিল শক্তির সামনে তাঁর ভূমিকা থাকবে সিংহ দিল মুজাহিদের মত।

প্রভুর বিধানে নেই কোন ব্যবধান

একজন সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা চুরির অপরাধে ধরা পড়লো। তার গোত্রের লোকেরা চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠলো। এখন তো হাত কাটা যাবে। কাটা যাবে সেই সাথে বংশের সম্মান-মর্যাদা। চিরকাল চোরের বংশ হিসেবে পরিচয় দিতে হবে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের আশায় তারা আল্লাহর রাসূলের ঘনিষ্টজন হযরত উসামা ইবনে জায়িদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর কাছে কাতর কণ্ঠে আবেদন করলো, আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের কাছে সুপারিশ করুন, তিনি যেন আমাদের শাস্তি মওকুফ করেন।

তাদের অনুরোধে হযরত উসামা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে লোকগুলোর অভিপ্রায়ের কথা জানালেন। তাঁর কথা শুনে আল্লাহর নবীর পবিত্র চেহারায় অসন্তুষ্টির চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠলো। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, উসামা!

লোকগুলো কি আমাকে আল্লাহর আইন পরিবর্তন করার জন্য বলছে? আল্লাহর শপথ! আমার মেয়ে ফাতেমাও যদি চুরি করে তাহলে আমি তাঁর হাত কেটে দেব। তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে এই পক্ষপাতিত্ব করার কারণে। তারা সমাজের সম্ভ্রান্ত-অভিজাত ও ধনী লোকদের জন্য এক ধরনের আইন প্রয়োগ করতো আর গরীবদের জন্য ভিন্ন ধরনের আইন প্রয়োগ করতো।

হযরত উসামা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু অনুতাপের স্বরে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন, আল্লাহ যেন আমাকে ক্ষমা করে দেন।

বিচারে সেই অভিজাত গোত্রের মহিলার হাত কাটার রায় হলো। দন্ড প্রয়োগ করা হলো তাঁর প্রতি। মহিলা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলো। পরবর্তীতে মহিলা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

আঁখি পাতায় ঘুম নেই প্রভু তোমারই ভয়ে

এই আলোছায়া ঘেরা মাটির পৃথিবীতে অবস্থান করছেন, অথচ মৃত্যুর পূর্বেই তিনি জান্নাতী হিসেবে সুসংবাদ পেয়েছেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখ থেকে। আল্লাহর রাসূল যাকে জীবিতকালেই জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন, তাঁর হৃদেয় জাহান্নাম ভীতি থাকার কথা নয়। তিনি জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো ভোগ-বিলাসে কাটিয়ে জীবনকে কানায় কানায় পরিপূর্ণ করবেন। সম্মুখে সুস্বাদু খাদ্য উপস্থিত হলে প্রশ্নাতীতভাবে তা উদরস্থ করবেন।

কিন্তু না, চিত্র এর বিপরীত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় সাথী সিদ্দিকে আকবর হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর জীবনধারা সম্পূর্ণ ব্যতীক্রম ধর্মী। যদিও জীবিত কালেই তিনি আল্লাহর রাসূলের জবান মোবারক থেকে জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদে ধন্য হয়েছেন। পৃথিবীতে আল্লাহর ও তার রাসূলের সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্য এমন কোন কাজ নেই, যা করার চেষ্টা তিনি করেননি। তবুও তিনি জাহান্নামের ভয়ে দিবারাত্রি কম্পমান। আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার ভয়ে তাঁর চোখ দুটোয় অশ্রু ঝরে। একজন সর্বোত্তম মুমীনের মধ্যে যতগুলো গুণ-বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন, তার সবগুলোই হযরত আবু বকরের মধ্যে অতিমাত্রায় বিদ্যমান।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় বান্দাদের গুণ-বৈশিষ্ট্য সূরা তওবায় এভাবে বর্ণনা করেছেন–আল্লাহর দিকে বার বার প্রত্যাবর্তনকারী, তাঁর বন্দেগী পালনকারী, তাঁর প্রশংসার বাণী উচ্চারণকারী, তাঁর যমীনে পরিভ্রমণকারী, তাঁর সম্মুখে রুকু ও সিজদায় অবনত, ভালো কাজের আদেশ দানকারী, খারাপ কাজে বাধা দানকারী এবং আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমা রক্ষাকারী। (সূরা তওবা-১১২)

কোরআনের ঘোষণা অনুযায়ী মুমিন যখন নিজের মনের অজান্তে কোন ভুল করে, তখন দ্রুত সে আল্লাহর দরবারে তওবা করে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। এমনি এক ঘটনা ঘটেছিল সিদ্দিকে আকবরের পবিত্র জীবনে। একদিন ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাড়ির কাজের লোকটিকে বললেন কিছু খাদ্য দেয়ার জন্য। লোকটি কিছু খাদ্য তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করলো। তিনি চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী কাজের লোকটিকে খাদ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা না করেই সামনে উপস্থিত খাদ্য থেকে এক লোকমা মুখে দিলেন। কাজের লোকটি বিনয়ের সাথে বললেন, হে খলীফাতুর রাসূল! আপনি তো আজ জানতে চাইলেন না আমি এই খাদ্য কোথা থেকে এনেছি?

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু লজ্জিত কণ্ঠে বললেন, বড় ভুল হয়েছে। ক্ষুধার প্রচন্ডতায় তোমাকে খাদ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবো তা মনে নেই। এখন বলো এ খাদ্য তুমি কোথা থেকে এনেছো?

কাজের লোকটি জানালো, হে খলীফাতুর রাসূল! আমি ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে জাহেলিয়াতের যুগে মন্ত্র দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করে এবং মানুষের ভবিষ্যৎ গণনা করে উপার্জন করতাম। এই উপার্জন দিয়েই আমার পরিবারের জীবিকা নির্বাহ হতো। এমনিভাবে এক বাড়িতে আমি গণনা করেছিলাম। তারা অঙ্গিকার করেছিল, আমার গণনার বিনিময়ে আমাকে কিছু উপহার দেবে। আজ তাদের বাড়ির পাশের পথ অতিক্রম করার সময় তারা আমাকে ডেকে উপহার দিয়েছে। সে উপহার বিক্রী করে এই খাদ্য ক্রয় করেছি।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এমনভাবে আর্তচিৎকার দিয়ে উঠলেন। তিনি হতাশ কণ্ঠে বললেন, তুমি আমাকে বরবাদ করে দিয়েছো।

একথা বলেই তিনি কণ্ঠনালীতে হাতের আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে উদরস্থ খাদ্য উদগীরণ করার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু শূন্য পেটে সামান্য এক লোকমা খাদ্য উদগীরণ করা সম্ভব হলো না। কিন্তু হারাম উপর্জানে ক্রয় করা খাদ্য উদরে রাখা আর জাহান্নামের আগুন দিয়ে উদর পূর্ণ করা একই ব্যাপার। তিনি পেট পূর্ণ করে পানি পান করলেন। তারপর কণ্ঠনালীতে আঙ্গুল প্রবিষ্ট করে বমি করলেন।

কিন্তু বমির সাথে ভক্ষিত খাদ্য বের হলো না। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এ সংবাদ অবগত হয়ে হযরত আবু বকরের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'রাব্বুল আলামিন আপনার প্রতি রহম করুন, সামান্য এক লোকমা খাদ্যের জন্য আপনি এত কষ্ট করছেন?

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন– আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, হারাম খাদ্যের দ্বারা দেহের যে পরিমান গোস্ত বৃদ্ধি পাবে তা জাহান্নামে জ্বলবে।

একথা বলে তিনি পুনরায় বমি করার চেষ্টা করলেন। অবশেষে ভক্ষণকৃত খাদ্য লোকমা বমির সাথে বেরিয়ে এলো। গণনা বা ভবিষ্যৎ বাণীর মাধ্যমে অর্থ উপার্জন ইসলামে হারাম। এ জন্য আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সেই অর্থে ক্রয় করা খাদ্য বমি করে ফেলেছিলেন। ইসলামী আন্দোলনের নেতা কর্মীদের উপার্জনের ব্যাপারে চরম সতর্ক হতে হবে। যাতে করে উপার্জিত অর্থের মধ্যে হারামের বিন্দুমাত্র মিশ্রণ না থাকে। বর্তমানে বাতিল আদর্শের ওপরে ভিত্তি করে পরিচালিত সমাজ ব্যবস্থায় যে কোন মানুষের বাড়িতে আহার গ্রহণ করা থেকে সতর্ক থাকতে হবে। ইবাদাত কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত হালাল খাদ্য গ্রহণ। ময়দানে যারা আল্লাহর দ্বীন কায়েমের আন্দোলনে নিয়োজিত আছেন, তাঁদেরকে অবশ্য অবশ্যই হারাম-হালালের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। হারাম খাদ্য গ্রহণ করে জিহাদের ময়দানে আল্লাহর কাছ থেকে কোন সাহায্য আশা করা বৃথা। পৃথিবীতে জীবিত থাকতেই যিনি জান্নাতি হওয়ার সুসংবাদ পেয়েছিলেন তিনিই যখন এতটা সতর্কতা অবলম্বন করেছেন, তখন যাদের ব্যাপারে জান্নাতের কোন নিশ্চয়তা নেই, তাদের জন্য কতটুকু সতর্ক হওয়া প্রয়োজন?

আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন

অর্ধ পৃথিবীর পৃথিবীর, যাঁর নাম উচ্চারিত হলে বাতিল শক্তির হৃদকম্পন শুরু হয়। দোর্দন্ড প্রতাপে যিনি বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন, তাঁর জীবনযাত্রা একজন দীন ভিখারীর অনুরূপ। তিনিই মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। রোম ও পারস্যের সম্রাট কিসরা ও কায়সারের রাষ্ট্রদুত যখন মহামূল্যবান ঝলমলে পাষাকে সজ্জিত হয়ে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে সাক্ষাত করতে আসতো, আর অর্ধ পৃথিবীর শাসক

তখন দীন ভিখারীর মতো খেজুর পাতার জীর্ণকুটিরে সাক্ষাৎ দান করতেন। বিদেশী দুত অবাক বিস্ময়ে দোর্দন্ড প্রতাপশালী অর্ধ পৃথিবীর শাসকের দিকে তাকিয়ে থাকতো, আর তাদের মানসপটে মত ভেসে উঠতো রোম পারস্য সম্রাট কায়সার ও কিসরার দরবারের ভৃত্যদের ঝলমলে পোষাক। সম্রাটের জৌলুশপূর্ণ মহামূল্যবান পাথরে নির্মিত রাজ প্রাসাদ।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যখন অতি সাধারণ বেশে বিদেশী মেহমানদের সাথে সাক্ষাত দিতেন অখন অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম বিব্রতবোধ করতেন। কিন্তু খলীফার মনে এ সবের কোন প্রভাব পড়তো না। তাঁকে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর জন্য অনেক সাহাবায়ে কেরাম চেষ্টা করেছেন কিন্তু খলীফার জীবন যাত্রায় কোন পরিবর্তন আনতে পারেননি। অবশেষে তারা উম্মুল মুমেনিন হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ও হাফসা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার নিকট আবেদন করলেন, তাঁরা যেন খলীফার জীবন যাত্রার মান উন্নত করার ব্যাপারে অনুরোধ করেন। হযরত আয়িশা ও হযরত হাফসা খলীফাকে বললেন, আল্লাহ আপনাকে বিশাল সম্মান-মর্যাদা দান করেছেন। বিভিন্ন দেশ থেকে আগত রাষ্ট্রীয় অতিথির সাথে আপনাকে সাক্ষাৎ করতে হয়। সুতরাং আপনার জীবন যাত্রার মান একটু উন্নত হওয়া প্রয়োজন।

খলীফা উম্মুল মুমেনীনদের অনুরোধ শুনলেন। তারপর অসন্তুষ্ট চিত্রে বললেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন সাথী হয়ে তোমরা আমাকে পৃথিবীর ভোগ বিলাসে জড়িয়ে পড়তে উপদেশ দিচ্ছো? হে আয়েশা! তুমি কি সে সময়ের কথা ভুলে গিয়েছো? যে সময় আল্লাহর রাসূল রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন, তখন তিনি দিনে যে বস্ত্র পরিধান করতেন, রাত্রে বিছানার অভাবে সে কাপড়টিই শয্যা হিসেবে ব্যবহার করতেন। আর হাফসা! তোমার তো সে কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়, রাতে তুমি আল্লাহর রাসূলকে দু'টুকরো কাপড় ভাজ করে বিছানা করে দিয়েছিলে, আর তিনি প্রভাতে তোমাকে বলেছিলেন, হাফসা তুমি আমার গোটা রাত-ই বরবাদ করে দিয়েছো। কেন তুমি আমার বিছানা নরম করে দিয়েছিলে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সামান্য পরিমাণ বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দেননি, তখন আমি কিভাবে বিলাসিতায় মগ্ন হতে পারি!

এ দুনিয়ার জীবনে ভোগ-বিলাসিতায় মগ্ন থেকে আখিরাতের জীবনকে যারা বরবাদ করে দেয়, তাদের মত ভাগ্যহীন আর কেউ নেই। পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী সুখের তুলনায় আখিরাত অনন্ত জীবনের সুখ-শান্তির সন্ধান করাই মুমিন জীবনের লক্ষ্য। হযরত

ফারুকে আযমের কাছে বাহরাইন থেকে প্রচুর গনিমতের মালামাল এলো। তার মধ্যে বেশ কিছু সুগন্ধিযুক্ত কস্তুরী ছিল। খলীফা এসব মালামাল জনসাধারণের মধ্যে বন্টন করার জন্য একজন সতর্ক ও হিসেবী লোক অনুসন্ধান করছিলেন। যিনি অত্যন্ত ইনসাফের সাথে মালামাল জনসাধারণের মধ্যে বন্টন করবেন। গনিমাতের মাল বন্টন করার সময় যদি কোন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, আর এ জন্য খলীফাকে কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর আদালতে জবাবদিহি করতে হয়, এই ভয়ে অর্ধ জাহানের শাসক আমীরুল মুমেনীন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু অস্থির। খলীফার স্ত্রী স্বামীর অস্থিরতা দেখে জানতে চাইলেন, আপনি এত অস্থির কেন?

খলীফা তার অস্থিরতার কারণ স্ত্রীকে জানালেন। স্ত্রী আবেদন করলেন– ঠিক আছে, অন্য কারো প্রতি আপনি নির্ভর করতে না পারেন আমাকে দায়িত্ব দিন, আমি বন্টন করছি।

খলীফা স্ত্রীকে বললেন– সেটা কি করে সম্ভব? মালামালের মধ্যে যে কস্তুরী আছে, বন্টন করার সময় তার স্পর্শ তোমার হাতে লাগবে, তখন তুমি তোমার হাত কাপড়ে মুছবে। তোমার কাপড় থেকে মৃগ কস্তুরীর গন্ধ আসবে। আর এ জন্য মহান আল্লাহর কাছে আমাকে জবাবদিহী করতে হবে। সুতরাং অন্য কেউ বন্টন করুক।

যাদের মন-মস্তিস্ক আল্লাহভীতিতে পরিপূর্ণ, তাঁদের দৃষ্টি থেকে অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ও এড়িয়ে যায় না। আল কোরআন এমনই ধরনের সৎলোক গড়ে করেছিল, যারা বিশাল সাম্রাজ্যের দোর্দন্ড প্রতাপশালী শাসক হয়েও আখিরাতে জবাবদিহির ভয়ে সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে কম্পমান থাকতেন। খাদ্যের এক কণা দানা মুখে উঠানোর সময়ও তাঁরা চিন্তা করতেন, এ দানাটি উদরস্থ করা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ না হয়। সুগন্ধি বন্টন করতে গেলে তার স্পর্শ হাতে লাগা স্বাভাবিক। আল্লাহর আইনে এমন সৎ লোক তৈরী হলো যে, রাষ্ট্রীয় সম্পদ সুগন্ধী বন্টন করার সময় তার গন্ধ নিজ শরীর স্পর্শ করবে আর এ জন্য যদি মহান আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন, এই ভয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতাপশালী শাসক অস্থির।

বিশাল সাম্রাজ্যের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী শাসক হয়েও রাষ্ট্রীয় দ্রব্যাদী নিজ হাতে সংরক্ষণ করেছেন। জনগণের সম্পদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন যেন কোন সম্পদের বিন্দু পরিমান অপচয় না হয়। ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের রাষ্ট্র নায়কগণ নিজেদেরকে রাষ্ট্রের সম্পদের পাহারাদার মনে করতেন। একবার রাষ্ট্রীয় পশু-সম্পদ উটের আস্তাবল থেকে একটি উট হারিয়ে গেল। বিষয়টি খলীফা ওমর জানার সাথে সাথে তাঁর পায়ের নীচের মাটি যেন সরে গেল। সব হারানোর চিহ্ন খলীফার

চেহারায় প্রকাশ পেল। তিনি এতই বিচলিত হয়ে পড়লেন, মনে হলো তিনি যেন ধ্বংসের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়েছেন। আদালতে আখিরাতে আল্লাহর কাছে জবাবদিহির ভয়ে তাঁর সুন্দর চেহারা মুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে গেল। মনে হলো, তিনি যেন আমানতের খেয়ানতকারীকে কিভাবে জাহান্নামে শাস্তি দেয়া হচ্ছে, তা নিজ চোখে দেখতে পাচ্ছেন।

সূর্য তখন মধ্য গগনে। অগ্নিঝরা সূর্যতাপে মরুপ্রান্তরে যেন অনল প্রবাহিত হচ্ছে। মরুর বালুকা রাশি যেন অগ্নিস্নানে উত্তপ্ত লাভ উদগীরণ করছে। প্রচন্ড তাপ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য দেশের সাধারণ মানুষ নিজদের ঘর অথবা ছায়ায় অবস্থান করছে, আর সেই মানুষদেরই নেতা– মুসলিম জাহানের খলীফার কি অবস্থা!

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নগ্ন পায়ে অস্থির চিত্তে শশব্যস্তে মরুভূমির তপ্ত বালুকা রাশির ওপরে ছুটাছুটি করছেন। রুদ্র-প্রয়াগের অনল প্রবাহ খলীফাকে জনগণের সম্পদ- উট অনুসন্ধান থেকে বিরত রাখতে পারেনি। জাতির সম্পদের তিনি প্রহরাদার মাত্র। এ সম্পদ তাঁর কাছে আমানত রয়েছে। আজ সে আমানতের যদি খেয়ানত হয়, তাহলে তাঁকেই তো আখিরাতের ময়দানে আসামীর কাঠ গড়ায় দাঁড়াতে হবে। নানা চিন্তা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে উৎকণ্ঠিত করে তুলেছে।

দূর থেকে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দেখলেন খলীফার অস্থিরতা। দ্রুত পায়ে তিনি খলীফার কাছে ছুটে এসে জানতে চাইলেন, আপনি এই প্রখর রোদের মধ্যে গরম বালুর ওপরে ছুটাছুটি করছেন কেন?

হযরত ওমর ভীত-সন্ত্রস্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন হযরত আলীর প্রতি। তারপর ভয়-কম্পিত কণ্ঠে রাষ্ট্রের উট হারানোর বিষয়টি তাঁকে জানালেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু খলীফাকে পরামর্শ দিয়ে বললেন, উটের সন্ধানে এই ঝলসানো রোদে উত্তপ্ত মরুভূমিতে আপনি নিজে না এসে অন্য কাউকে তো পাঠাতে পারতেন!

হযরত ওমর রোষকষায়িত দৃষ্টিতে হযরত আলীর দিকে তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, আলী! আখিরাতের কঠিন ময়দানে আল্লাহ যখন বিচারকের আসনে আসীন হয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন, ওমর! রাষ্ট্রের গুরুত্ব তোমার প্রতি অর্পণ করা হয়েছিল। অগনিত মানুষের সম্পদের প্রহরাদার ছিলে তুমি। জনগণের পশুসম্পদ থেকে একটি উট হারিয়ে গেল কিভাবে? তুমি আমানতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করনি, তুমি আমানতের খিয়ানত করেছো।'

হে আলী! আমি কি পারবো সেদিন জবাবদিহি করতে? সুতরাং আমি না এসে কে আসবে রাষ্ট্রীয় সম্পদের খোঁজে? পৃথিবীর সূর্যের তাপ থেকে আল্লাহর জাহান্নামের তাপ অনেক বেশী। আমি যখন খলীফা অতএব উট খোঁজার দায়িত্ব আমাকেই পালন করতে হবে।

দেশের রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে সাধারণ একজন চাপরাশী পর্যন্ত সবাই গোটা জাতির খাদেম। তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে আদালতে আখিরাতে আল্লাহর দরবারের জবাবদিহি করতে হবে। ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র কায়েম করার জন্য যে সমস্ত সংগঠন বা সংস্থা কাজ করছে। সে সংগঠনের সর্বস্তরের দায়িত্বশীলদেরকে তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্বের যাবতীয় দিক সম্পর্কেও মহান মাবুদের সামনে হিসেব দিতে হবে। প্রতিটি পরিবারের প্রধানকেও তাঁর পরিবারের প্রত্যেক সদস্য সম্পর্কে রাব্বুল আলামীনের কাছে সন্তোষজনক জবাব দিতে হবে।

ক্ষমতার মসনদে আসীন হয়ে কেউ যদি স্বজন প্রীতি করে, নিজ আত্মীয় বা দলের লোকদের জন্য এক আইন আর সাধারণ লোকদের জন্য আরেক আইন, এ ধরনের দ্বৈতনীতি অনুসরণকারী মুনাফিক। একই অপরাধে অপরাধী বাড়ির পুত্র কন্যাদের জন্য এক ধরনের বিচার-ফয়সালা আর কাজের লোকদের জন্য ভিন্ন বিচার-ফয়সালা, এ ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ ইসলাম অনুমোদন করেনা। ইসলামের সুমহান ইনসাফপূর্ণ নীতি পরিস্ফুটিত হয়েছিল ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রে।

অর্ধ পৃথিবীর শাসক খলীফা ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। তাঁর সাম্রাজ্যের আইন নিজস্ব গতিতে চলে। আইন প্রয়োগের ব্যাপারে কোন বৈষম্য নেই। আইনের কাছে সকলে সমান। এতবড় সাম্রাজ্যের শাসকের কাছে তাঁর-ই সন্তানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে কে? কার এমন হিম্মত আছে যে, খলীফা ওমরের কাছে গিয়ে তার কলিজার টুকরা আদরের দুলাল আবু শামার নামে নালিশ করবে? তাহলে কি অপরাধ করলে খলীফা-সন্তান বলে তাঁর কি বিচার হবে না?

অবশ্যই বিচার হবে। দেশে প্রচলিত আল্লাহর আইন দিয়েই খলীফার সন্তানের বিচার হবে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ– তিনি নিষিদ্ধ পানীয় পান করেছেন। ইসলামী আইনে মদ্য পানের শাস্তি ৮০টি বেত্রাঘাত।

জনসাধারণের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব। খলীফা কি তাঁর নিজের সন্তানকে শাস্তি দেবেন? ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সকল দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে নিজেই বিচারকের আসনে বসলেন । সামনে আসামীর কাঠগড়ায় তাঁরই আত্মজ অপরাধীর মত মাথা নিচ করে দাঁড়িয়ে আছে বিচারের রায় শোনার জন্য। দেশে অনেক

বিচারক থাকার পরও খলীফা অন্য কোন বিচারককের হাতে বিচারের ভার ছেড়ে দেননি। কেন তিনি তার ছেলের বিচার অন্য বিচারকের হাতে অর্পন করলেন না?

তা কি এ জন্য যে, অন্য বিচারক তার ছেলের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রয়োগ করবে? না এ জন্যে নয়। খলীফার চিন্তাধারা ভিন্ন রকম। তিনি চিন্তা করলেন, অন্য বিচারক যদি খলীফা-সন্তান বলে বিচারের প্রকৃত রায় দিতে দ্বিধাবোধ করেন! আইন প্রয়োগে যদি শিথিলতা প্রদর্শন করেন! তাহলে আদালতে আখিরাতে খলীফাকেই তো দায়ী হতে হবে। এ জন্য খলীফা আল্লাহর আইন প্রয়োগ করার জন্য নিজেই আজ বিচারকের আসনে সমাসীন।

সাক্ষ্য-প্রমাণে খলীফার স্নেহের দুলাল আবু শামার বিরুদ্ধে আদালতে প্রমাণ হলো, তিনি মদ্যপান করেছেন। জনাকীর্ণ আদালত। সবার চোখে-মুখে কৌতুহলের চিহ্ন। ভাব গম্ভীর পরিবেশ পিন-পতন নিস্তব্ধতার মধ্য দিয়ে ইসলামী আন্দোলনের বীর সিপাহসালার, অর্ধ পৃথিবীর শাসক, ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের খলীফা আমীরুল মুমেনিন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল–বিবাদী নিঃসন্দেহে অপরাধী। তাকে দন্ড ভোগ করতে হবে। আইন অনুযায়ী অপরাধীকে ৮০ টি বেত্রাঘাত সহ্য করতে হবে।

শুধু রায় ঘোষণা করেই খলীফা নিরব হলেন না। সেই সাথে তিনি ঘোষণা করলেন– আপন পুত্রের প্রতি আদালত কর্তৃক নির্দেশিত দন্ডাজ্ঞা তিনি নিজ হাতেই কার্যকর করবেন। কারণ, অন্য লোকের প্রতি এই দন্ডাজ্ঞা কার্যকর করার দায়িত্ব দিলে তা উপযুক্তভাবে কার্যকর না-ও হতে পারে। খলীফা-সন্তান বলে বেত্রাঘাত শিথিলও করতে পারে।

খলীফা ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নিজ হাতে চাবুক উঠিয়ে নিলেন। স্বীয় পুত্রের দেহে চাবুকের আঘাত করে চলেছেন তিনি। চাবুকের প্রত্যেক আঘাতে সন্তান আবু শামার দেহ থেকে রক্ত ছিটকে বেরিয়ে আসছে। সন্তান চাবুকের আঘাতে নির্মম যন্ত্রণায় 'আব্বা আব্বা' বলে আর্তনাদ করেছ। খলীফার কঠিন হৃদয়ে পুত্রের আর্তনাদ বিন্দু পরিমান স্নেহ মমতার উদ্রেক সৃষ্টি করতে পারলো না। পিতার চাবুকের নির্মম আঘাতে জর্জরিত পুত্র আবু শামা এক সময় মৃত্যুর হীম শীতল কোলে আশ্রয় নিল। মদ্যপানের শাস্তি তিনি দুনিয়াতেই পেয়ে গেলেন। এ কারণে তাঁকে আর আদালতে আখিরাতে মহান আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে না।

ইসলামী আদর্শের প্রতি কতটা শ্রদ্ধা থাকলে কলিজার টুকরা স্নেহের নিধি, আদরের দুলালকে নিজ হাতে চাবুকের আঘাতে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেয়া যায়!

আল্লাহর ভয় মানুষকে যখন সৎ মানুষে রূপান্তরিত করে, তখন সে মানুষ পৃথিবীর যাবতীয় দুর্বলতা থেকে মুক্ত হয়ে একমাত্র আল্লাহর আইনের সম্মুখে দুর্বল হয়ে যায়। অপরাধী সন্তানের প্রতি দুর্বলতা প্রদর্শন করলে একদিকে যেমন আদালতে আখিরাতে খলীফাকে শাস্তিভোগ করতে হতো, অপরদিকে দেশে স্বজন-প্রীতির এক নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন হতো। সৎমানুষ ক্ষমতায় আরোহন করে আল্লাহর আইনকে সবার প্রতি সমভাবে প্রয়োগ করেছেন। তাঁরা পৃথিবীর সমস্ত কিছুর থেকে আল্লাহর আইনের প্রতি সর্বাধিক মর্যাদা দিয়েছেন। স্ত্রীর মলিন মুখ, সন্তানদের বুক ফাটা আহাজারীর সামনে তাঁরা আল্লাহর আইনকে শিথিল করেননি।

পবিত্র ঈদের দিন। বিশাল সাম্রাজ্যের শাসক-খলীফা ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর স্ত্রী মলিন মুখে খলীফার সামনে এসে দাঁড়ালেন । চোখ দুটো অশ্রু সজল। খলীফা মুখ তুলে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। স্ত্রীর চোখে পানি দেখে ব্যগ্র কণ্ঠে জানতে চাইলেন, তোমার চোখে পানি! কাঁদছো কেন?

স্ত্রী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, ছেলেরা আমার কাছে কাঁদছে। প্রতিবেশীর ছেলেরা আজ নতুন পোষাক পরিধান করে আনন্দ করছে। আপনার সন্তানদের পুরনো পোষাক দেখে ওদের সাথীরা উপহাস করছে।

খলীফা বললেন– কি করবো, আমার কাছে এমন অর্থ নেই-যা দিয়ে সন্তানদের নতুন পোষাক কিনে দেব।

স্ত্রী পরামর্শ দিলেন– আপনি আপনার আগামী মাসের বেতন থেকে কিছু অর্থ অগ্রিম নিয়ে ওদের জন্য নতুন পোষাক কিনুন।

খলীফা স্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের সচিবের কাছে তাঁর আগামী মাসের ভাতা থেকে ৭ দিনের ভাতা অগ্রিম দেয়ার জন্য একটি পত্র লোক মারফত পাঠালেন। কোষাগারের সচিব খলীফার পত্রের ওপর চুমা দিয়ে পত্রের অপর পৃষ্ঠায় লিখলেন– আমীরুল মুমেনীন! আপনাকে দুটি শর্তে অগ্রিম অর্থ দিতে পারি। প্রথম শর্তঃ আগামী মাসের ৭ তারিখ পর্যন্ত আল্লাহ আপনাকে জীবিত রাখবেন এমন নিশ্চয়তা আপনি আমাকে দেবেন। দ্বিতীয় শর্তঃ আগামী মাসের ৭ তারিখ পর্যন্ত জনগণ আপনাকে ক্ষমতায় রাখবে এমন নিশ্চয়তা আপনি আমাকে দিলে আমি কোষাগার থেকে আাপনার সন্তানদের জন্য ঈদের জামা কাপড় ক্রয় করার অগ্রিম অর্থ মঞ্জুর করবো।

কোষাগার সচিবের এ ধরনের সত্য কথা সম্বলিত পত্র পেয়ে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সিজদায় গিয়ে কাঁদতে লাগলেন আর আল্লাহর কাছে আবেদন

করলেন– হে আল্লাহ! তোমার কোরআন এমন মানুষ তৈরী করেছে, যাঁরা খলীফা ওমরকে ভয় না করে তোমাকে ভয় করে। এ ধরনের সত্য কথা বলার লোকের সংখ্যা তুমি বাড়িয়ে দাও। এসব মানুষর যতদিন পৃথিবীতে থাকবে ততদিন তোমার যমীনে ইসলাম কায়েম থাকবে।

খলীফা ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নামাজে গেলেন। শরীরে ছিন্ন পোষাক। একজন অভিযোগ করলো, আল্লাহ্ আপনাকে বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকারী করেছেন। একটু ভালো জামা কাপড় তো আপনি ব্যাবহার করতে পারেন।

খলীফা কিছুক্ষণ নিরব থেকে উত্তর দিলেন– সব চেয়ে উত্তম কাজ হলো বিশাল প্রাচুর্যতার মধ্যে চরম সংযম অবলম্বন আর দুর্জয় ক্ষমতার অধিকারী হয়েও ক্ষমা প্রদর্শন করা।

তাঁর কথা ও কাজে অপূর্ব সামঞ্জস্য ছিলো। তিনি মুসলিম জাহানের খলীফা হিসেবে মসজিদে ইমামতি করতেন। সেদিন শুক্রবার। অসংখ্য মানুষ মসজিদে সমবেত হয়েছে। নিরব পরিবেশ। কোথাও কোন সাড়া নেই। খলীফা ওমর জুম্মা নামাজের খুতবা দেয়ার জন্য মসজিদের মিম্বরে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর শরীরে আজ জীর্ণ পোষাকের পরিবর্তে নতুন লম্বা পোষাক শোভা পাচ্ছে। শত শত জনতার চোখ আজকে খলীফার নতুন কাপড়ের দিকে নিবদ্ধ। সবার চোখে জিজ্ঞাসার চিহ্ন। খলীফা খুতবা আরম্ভ করবেন, এমন সময় সুন্দর সুঠাম বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী এক যুবক অগণিত জনতার মধ্য থেকে দাঁড়িয়ে গেল। অর্ধেক পৃথিবীর যিনি শাসক সেই দোর্দন্ড প্রতাপশালী ওমরকে বজ্র কণ্ঠে বলতে লাগলো– ওমর! সাহায্যের কাপড় থেকে দেশের জনগণ যতটুকু পেয়েছে, আপনিও ততটুকুই পেয়েছেন। কিন্তু ঐ কাপড় দিয়ে এতবড় লম্বা জামা হওয়ার কথা নয়। আপনি এতবড় জামা কোথায় পেলেন? এর সন্তোষজনক জবাব না দিলে আজ আপনার খুতবাও শুনবো না, আপনার পিছনে নামাজও আদায় করবো না।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নির্বাক। পিতাকে প্রশ্নের সম্মুখিন হতে দেখে পুত্র আব্দুল্লাহ্ দাঁড়িয়ে বললো– আমি দিচ্ছি এ প্রশ্নের জবাব। গতকাল তোমরা দেখেছো আব্বা এবং আমি তোমরাদের অনুরূপ এক টুকরো করে কাপড় পেয়েছি। আব্বা যে কাপড় পেয়েছে তা দিয়ে লম্বা জামা হয়না। এজন্য আমি আমার অংশের কাপড়টি আব্বাকে দিয়েছি।

খলীফা-পুত্র থামতেই খলীফার গোলাম উঠে দাঁড়িয়ে বললো– আমি আমার অংশের কাপড়টিও খলীফাকে দিয়েছি। তিনি গ্রহণ করতে চাননি। আমার পীড়াপীড়িতে

তিনি নিয়েছেন। তাঁর লম্বা জামা প্রয়োজন, এ জন্য তাঁর, আমার ও খলীফার পুত্রের– তিনজনের কাপড় একত্রিত করে লম্বা জামা বানানো হয়েছে। সেই জামাই খলীফা পরিধান করেছেন।

এবার হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু প্রশ্নকারীকে জিজ্ঞাসা করলেন– যুবক! এবার কি তুমি সন্তুষ্ট হয়েছো?

যুবকটি বললো– জ্বী-হাঁ, আমি সন্তোষজনক জবাব পেয়েছি।

খলীফা যুবকটির সাহসিকতা পরীক্ষা করার জন্য বললেন– যদি তোমার প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব না পেতে তাহলে কি করতে?

যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে তরবারী কোষমুক্ত করে বললো– আমার প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দিতে আপনি ব্যার্থ হলে আমার তরবারীই এর ফয়সালা জন্য প্রস্তুত ছিল।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কৃত্রিম রোষের সাথে বললেন– যুবক! তুমি কি জানো, তুমি কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছো?

ইসলামী আন্দোলনের নির্ভীক সৈনিক যুবকটি তড়িৎ জবাব দিল– জানি, আমি মুসলিম জাহানের খলীফা আমীরুল মুমেনীন খাত্তাবের পুত্র ওমরের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছি।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যুবকটির বীরত্বপূর্ণ কথা শুনে কান্না বিগলিত কণ্ঠে বললেন– রাব্বুল আলামীন! তোমার শত কোটি প্রশংসা যে তুমি ওমরকে সত্য পথে রাখার জন্য এমন অতন্দ্র প্রহরী তোমার বান্দাদের মধ্যে রেখেছো।

ইসলামী আন্দোলন সর্বপ্রথমে মানুষের মনো-জগতে বিপ্লব ঘটিয়ে মন-মস্তিষ্কে আল্লাহভীতি প্রতিষ্ঠিত করে। মানুষের ব্যক্তি জীবনকে পরিচ্ছন্ন করে তারপরে পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে ইসলামী বিপ্লব ঘটায়। কারণ, আইন যত ভালই হোক না কেন, তা অসৎ লোকদের হাতে পড়লে সে আইনের অপপ্রয়োগ হতে বাধ্য। আল্লাহর আইনও অসৎ মানুষদের হাতে পড়লে সে আইন মানুষের কল্যাণ বয়ে আনতে পারবে না। কারণ, আইন প্রয়োগকারী অসৎ হলে সে আইনের প্রতি তার শ্রদ্ধা থাকবে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথমে আল-কোরআন দিয়ে সৎমানুষ গড়েছিলেন। তারপর ঐ সৎমানুষের মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করেছেন।

এ ধরনের সৎলোক লোকচক্ষুর অন্তড়ালেও আল্লাহর আইনের প্রতি কতটা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তা তাদের পরিবারের ক্ষুদ্র গন্ডীর জীবন যাত্রার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা

যায়। খলীফা ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর স্ত্রী স্বামীর কাছে বলছেন– সন্তানদের জন্য সামান্য মিষ্টির ব্যবস্থা করা যায় না?

খলীফা বললেন– মিষ্টির ব্যবস্থা করার মত অর্থ আমার কাছে নেই।

স্বামীর কথা শুনে স্ত্রী নীরব রইলেন। বেশ কিছুদিন পর আহারের সময় খলীফার সামনে কিছু মিষ্টি জাতীয় খাদ্য উপস্থিত করা হলে তিনি স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন– এ মিষ্টি বানানোর অর্থ তুমি কোথায় পেলে?

স্ত্রী স্বলজ্জ কণ্ঠে জবাব দিলেন– প্রতিদিনের খরচ থেকে কিছু কিছু জমিয়ে এই মিষ্টির ব্যবস্থা সন্তানদের জন্য করেছি।

খলীফা বললেন– সংসার খরচ থেকে কিছু কিছু জমিয়ে মিষ্টি বানিয়েছো। এটা করতে গিয়ে গতমাসে সংসার চালাতে কোন অসুবিধা হয়নি?

স্ত্রী বললেন– না, তেমন কোন অসুবিধা হয়নি।

খলীফা বললেন– তাহলে আগামী মাস থেকে ঐ পরিমাণ অর্থ আমার ভাতা থেকে কমিয়ে দিতে হবে।

তিনি মুখে যা বললেন, কাজেও তাই করলেন। রাষ্ট্রীয় কোষাগারের সচিবকে ডেকে তাঁর ভাতা কমানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাগিদ দিলেন। দেশের প্রধান ব্যক্তি যদি সৎলোক হয় তাহলে তার অধীনস্থ লোকগুলো সৎ হতে বাধ্য । ইসলাম মানুষের জীবনকে কতটা পরিচ্ছন্ন করে, কতটা দায়িত্বশীল বানিয়ে দেয় তা ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রধান ও সাধারণ নাগরিকদের জীবনধারার প্রতি লক্ষ্য করলে ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায়। এ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিগণ কতটা সাধারণ অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেছেন তা একটি ঘটনাতে দেখা যায়।

পারস্য সম্রাট ইয়াযযর্গিদ– হরমুজানকে সেনাপতি নিযুক্ত করলো যেন নতুন সেনাপতি মুসলমানদেরকে সমুচিত শিক্ষা দিতে পারে। মুসলিম বাহিনীর সাথে মোকাবেলায় হরমুজান পরাজয় আসন্ন দেখে সন্ধি করলো এবং সেই সাথে আবেদন করলো, তাকে যেন মদীনায় খলীফা ওমরের কাছে নেয়া হয়। খলীফা তার ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তা-ই তিনি মেনে নেবেন। মুসলিম বাহিনী পারস্য সেনাপতিকে সাথে নিয়ে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করলো। পারস্য সেনাপতি চিন্তা করলো, সে বিশাল মুসলিম জাহানের খলীফা ওমরের সামনে উপস্থিত হচ্ছে। খলীফার রাজকীয় দরবারের জৌলুসের সাথে সামঞ্জস্য রেখেও তাকেও মূল্যবান পোষাকে সজ্জিত হবে। হরমুজান স্বর্ণ রৌপ্য দ্বারা খচিত সুদৃশ্য মুকুট মাথায় পরলো। জরি মিশ্রিত মখমলের মহামূল্যবান পোষাক পরিধান করলো। স্বর্ণের

বাটযুক্ত মূল্যবান তরবারী কোমরে ঝুলিয়ে পারস্যের বিখ্যাত নাগরিকদের সাথে নিয়ে মহাসমারোহে মদীনায় প্রবেশ করে মদীনার জনৈক নাগরিককে জিজ্ঞাসা করলো– তোমাদের সম্রাটের রাজপ্রাসাদ কোন দিকে?

কোনদিন না শোনা প্রশ্ন শুনে আরবের বেদুইন মদীনার নাগরিক বিস্মিত দৃষ্টিতে লোকটির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে– বললো আমাদের তো কোন সম্রাট নেই, একজন খলীফা আছে। তাঁর কোন প্রাসাদ নেই, তিনি খেজুর পাতার জীর্ণকুটিরে বাস করেন।

পারস্য সেনাপতি হরমুজান বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল। দ্বিধান্বিত স্বরে প্রশ্ন করলো– খলীফার কোন প্রাসাদ নেই? তাহলে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হবে কোথায়?

ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের নাগরিক জানালো– ঐ মসজিদের সামনে গিয়ে দেখ, খলীফা ওমর ঘুমিয়ে আছে।

পারস্য সেনাপতি হরমুজানের বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে গেল। সে অবাক দৃষ্টিতে দেখলো, বিশাল মুসলিম জাহানের খলীফা, যাঁর নাম শুনলে রোম আর পারস্য সম্রাটের হৃদ-কম্পন শুরু হয়, সেই আমীরুল মুমেনীন মসজিদের সামনে ধূলি-শয্যায় ডান হাত মাথার নীচে দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছেন।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দূর-দূরান্তে প্রেরিত মুসলিম সৈনিকদের প্রেরিত পত্রগুলো মহল্লায় ঘুরে ঘুরে নির্দিষ্ট ঠিকানায় নিজ হাতে পৌঁছে দিতেন। রাত্রে ছদ্মবেশে জনগণের অবস্থা নিজ চোখে দেখার জন্য অলিতে-গলিতে ঘুরাফিরা করতেন। একদিন এক তাঁবুতে তিনি দেখলেন, একটি বাচ্চা কাঁদছে। তিনি বাচ্চাটির কান্নার কারণ জানতে চাইলেন। বাচ্চার মা বললো– তাঁকে বুকের দুধ খেতে দিচ্ছিনা না বলে কাঁদছে। দুধ পান বন্ধ না করা পর্যন্ত খলীফা ওমর তাঁর জন্য ভাতা বরাদ্দ করবো না। তাই চেষ্টা করছি দুধ পান বন্ধ করার জন্য।

মহিলার কথা শুনে খলীফার চোখ অশ্রু সজল হয়ে উঠলো। আহা! কত শিশুই না এভাবে কষ্ট পেয়েছে। তিনি সেদিন থেকেই গোটা সাম্রাজ্যে আইন জারি করলেন, শিশু মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হওয়ার সাথে সাথেই ভাতা পাবে।

আল্লাহকে যাঁরা ভয় করেন, এমন সৎলোক যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন, তখন দায়িত্বের গুরুভার তথা দেশ ও জাতির কল্যাণ চিন্তায় তাঁদের রাতের ঘুম চোখ থেকে বিদায় নেয়। ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু জনগণের সার্বিক অবস্থা নিজ চোখে দেখার জন্য মদীনা থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে যেরার নামক গ্রামে উপস্থিত হলেন। দীর্ঘ পথ তিনি পায়ে হেঁটে এলেন। সেখানে তিনি দেখলেন, একজন মহিলা

উনুনের ওপরে পাত্রে কি যেন রান্না করছে। আর উনুনের চারধারে কয়েকজন শিশু বসে কাঁদছে। খলীফা মহিলার কাছে শিশুদের কান্নার কারণ জানতে চাইলেন। মহিলা বিরক্তিভরে বললো– তুমি তোমার রাস্তা দেখ। আমার কষ্টের কারণ তোমাকে জানিয়ে কি হবে?

ছদ্মবেশী খলীফার পীড়াপীড়িতে মহিলা বললো– কয়েকদিন যাবৎ ওদের মুখে আমি কোন খাবার দিতে পারিনি। ওরা বার বার আমাকে বিরক্ত করছে খাবারের জন্য। ক্ষুধার যন্ত্রণায় ওরা কাঁদছে। ওদেরকে প্রলোভন দিয়ে শান্ত রাখার জন্য পাত্র ভর্তি শুধু পানি উনুনে দিয়েছি। এভাবে করে সময় পার করছি, যেন ওরা ঘুমিয়ে পড়ে। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের দেশের খলীফা আমাদের কোন খবর নেননা।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠলো। তিনি দ্রুত সেখান থেকে মদীনায় ফিরে এসে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের সচিব হযরত আসলাম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে বললেন– কিছু আটা, ঘী খেজুর ও গোস্ত নিয়ে তা আমার পিঠে উঠিয়ে দাও।

হযরত আসলাম বললেন– হে আমীরুল মুমেনীন! আমার পিঠে উঠিয়ে দিন। আমি বহন করে নিয়ে যাচ্ছি।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন– আসলাম! আখিরাতের ময়দানে তুমি কি আমার বোঝা বহন করবে?

একথা বলে তিনি খাদ্যের বোঝা নিজেই বহন করে ঐ মহিলার কাছে নিয়ে গেলেন। মহিলা রুটি বানানোর জন্য আটা মাখাচ্ছেন, আর বিশাল সাম্রাজ্যের দোর্দন্ড প্রতাপশালী শাসক ওমর উনুনে খড়ি দিচ্ছেন। রুটি প্রস্তুত হওয়ার পরে বাচ্চারা পেট ভরে খেয়ে খেলতে লাগলো। হযরত ওমর প্রাণভরে বাচ্চাদের খেলা দেখছেন। মহিলাটি ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে বললেন– আল্লাহ্ তোমার ওপরে রহমত করুন। ওমরের স্থলে তুমি যদি খলীফা হতে তাহলে কতই না ভালো হতো। আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েম হলে শাসন কর্তারা দেশের জনগণের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়ে। নিজেদের দায়িত্ব অপরের ওপর চাপিয়ে সৎলোক নিশ্চিত থাকতে পারেনা। আল্লাহর আদালতে জবাবদিহির চিন্তায় ইসলামী রাষ্ট্রের সৎ কর্মকর্তারা নিজেদের দায়িত্ব-কর্তব্যের প্রতি স্বাভাবিক কারণেই নিষ্ঠাবান হতে বাধ্য। ইসলামী আন্দোলন যে সৎলোক তৈরী করে সেই সৎলোকেদের সামনে অর্থের স্তুপ এলে তাঁরা শঙ্কিত হয়ে পড়ে। সৎলোক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে গ্রহণ করে না। ওমর রাদিয়াল্লাহু

তা'য়ালা আনহুর প্রতি যখন খেলাফতের দায়িত্ব অর্পন করা হলো তখন বাধ্য হয়েই তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দিলেন। ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হিসেবে রাষ্ট্র থেকে যে সামান্য ভাতা পান তা দিয়ে তাঁর সংসার পরিচালনা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সবার চোখেই খলীফা পরিবারের দারিদ্রতা স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তারা এক গোপন বৈঠকে মিলিত হলেন রাষ্ট্রপতির ভাতা বৃদ্ধি করার জন্য। কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন হযরত আলী, হযরত ওসমান, হযরত জোবায়ের ও হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম আজমাইন। কিন্তু কারো সাহস হলো না খলীফা ওমরকে তাঁর ভাতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত জানাবেন।

অবশেষে সকলে খলীফা-কন্যা উম্মুল মুমেনীন হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন- ভাতা বৃদ্ধির ব্যাপারটি আপনি আপনার পিতাকে জানাবেন।

হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা পিতা ওমরকে যখন তাঁরই ভাতা বৃদ্ধির ব্যাপারটি জানালেন, তখন খলীফা রোষকষায়িত লোচনে নীজ কন্যার দিকে তাকিয়ে বললেন- যাঁরা তোমাকে এ প্রস্তাব দিয়ে আমার কাছে পাঠিয়েছেন আমি তাদের নাম জানলে উপযুক্ত শিক্ষা দিতাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর যেভাবে জীবন-যাপন করেছেন আমি সেভাবেই জীবন অতিবাহিত করতে চাই। আমি রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে যে ভাতা পেয়ে থাকি, তাই আমার জন্য যথেষ্ট। আমার ভাতা বৃদ্ধির কোন প্রয়োজন নেই।

আখিরাত প্রেমিকের দুনিয়া ভীতি

খলীফা হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর কাছে এসে সাইদ ইবনে আমের বললেন- ওমর! আমি আপনাকে মানুষের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করার জন্য বলছি। তবে আল্লাহর ব্যাপারে আপনি মানুষকে ভয় করবেননা। আপনার কথা আপনার কর্মের বিপরীত যেন না হয়। কারণ, কর্মদ্বারা সত্যায়িত কথাই সর্বোকৃষ্ট কথা। ওমর! দূর ও নিকটের যে মুসলমানদের শাসক আল্লাহ আপনাকে বানিয়েছেন, আপনি তাদের সমস্যার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। আপনি নিজের ও পরিবারবর্গের জন্য যা পছন্দ ও অপছন্দ করবেন- জনগণের জন্যও তা-ই করবেন। সত্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত থাকতে গিয়ে যত বাধা-ই আসুক না কেন, তা দৃপ্ত কদমে অতিক্রম করবেন। আল্লাহর আইন বাস্তবায়িত করতে গিয়ে কোন নিন্দুকের নিন্দায় ভয় পাবেন না।

হযরত ওমর জানতে চাইলেন– সাইদ! এসব দায়িত্ব পালনে সক্ষম কোন ব্যক্তি?

হযরত আমের জবাবে বললেন– আপনার ন্যায় ব্যক্তি। আল্লাহ তা'য়ালা যাকে মুসলমানদের নেতা বানিয়েছেন। আপনার ও আল্লাহর মধ্যে অন্য কোন প্রতিবন্ধক নেই।

খলীফা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত সাইদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে বললেন– ভাই সাইদ! আপনি আমাকে সহযোগিতা করুন। আজ থেকে আপনাকে আমি হিমস নগরীর গভর্নর নিযুক্ত করলাম।

হযরত ওমরের এ প্রস্তাব শুনে দুনিয়া ত্যাগী এ মহামানব আর্তচিৎকার করে উঠলেন। বললেন– ওমর! আমি আপনাকে আল্লাহর কছম দিয়ে বলছি, আমার ওপরে এত বড় বিপদ চাপিয়ে দেবেন না। অনুগ্রহ করে পার্থিব কোন ঝামেলায় আমাকে জড়াবেন না।

হযরক সাইদের কথায় ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু রোষকষায়িত লোচনে তাঁর দিকে তাকিয়ে ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে বললেন– আপনারা পেয়েছেন কি? আমাকে খেলাফতের দায়িত্ব দিয়ে সীমাহীন ঝামেলায় জড়িয়ে নিজেরা দূরে থাকবেন! আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে ছাড়বোনা। হিমস নগরীর শাসন কর্তার পদ আপনাকে গ্রহণ করতেই হবে।

কথা শেষ করে খলীফা ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সরকারীভাবে হযরত সাইদ ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে হিমস নগরীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। তিনি সাইদকে জিজ্ঞাসা করলেন– আমি রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে আপনার ভাতা নির্ধারিত করছি।

সাইদ বিষন্ন কণ্ঠে বললেন– ওমর ! ভাতা দিয়ে কি হবে? এমনিতেই আমি যা পাই তা দিয়ে আমার প্রয়োজন পূরণ হয়, অতিরিক্তি অর্থ দিয়ে আমাকে বিপদে নিপতিত করবেন না।

হযরত সাইদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে হিমস নগরীর গভর্ণর হিসেবে সেখানে প্রেরণ করা হলো। কিছু দিন পর হিমস শহরের কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক খলীফার সাথে সাক্ষাত করতে এলে তিনি তাঁদেরকে বললেন– তোমাদের শহরের অভাবী লোকের তালিকা আমাকে দাও, আমি সাহায্য তহবিল থেকে তাদেরকে কিছু সাহায্য দিতে চাই।

তাঁরা তাদের শহরের অভাবী লোকদের একটি তালিকা প্রস্তুত করে খলীফার হাতে দিলেন। তালিকায় হিমস নগরের শাসনকর্তা হযরত সাইদ ইবনে আমের

রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর নামও ছিল। খলীফা তালিকা পড়ে জিজ্ঞাসা করলেন– এই সাইদ ইবনে আমের লোকটি কে?

আগত লোকগুলো জানালো– তিনি আমাদের শাসনকর্তা।

খলীফা বিস্মিত কণ্ঠে জানতে চাইলেন– তোমাদের শাসনকর্তা অভাবী?

লোকেরা জানালো– আমীরুল মুমেনীন! আমাদের শাসনকর্তার সংসারের অবস্থা এতটাই করুণ যে, তাঁর উনুনে হাড়ি চড়ে না। তিনি ও তাঁর পরিবার অনাহারে থাকেন। আল্লাহর কসম! হিমস শহরে তাঁর মতো গরীব মানুষ আর একটিও নেই।

হযরতে সাইদ সম্পর্কে জানতে পেরে খলীফা ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর চোখ বেয়ে পানি ঝরতে থাকলো। তিনি হাজার দিনার ভর্তি একটি থলি হিমস নগরীর লোকদের হাতে দিয়ে বললেন– তোমাদের শাসকর্তা সাইদকে বলবে, ওমর আপনাকে সালাম জানিয়ে এ অর্থগুলো গ্রহণ করতে বলেছে।

সাইদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে যখন লোকেরা খলীফার দেয়া দিনারের থলি হাতে দিল তখন তিনি থলি খুলে দিনার দেখে তা এমন ভাবে দূরে ছুড়ে দিলেন, যেন তার হাতে কেউ আগুনের পিন্ড দিয়েছিল আর তিনি তাঁর হাত জ্বলে যাওয়ার আশঙ্কায় সজোরে দূরে নিক্ষেপ করলেন। তিনি যখন দিনারের থলি ছুড়ে ফেলছিলেন তখন তিনি চিৎকার দিয়ে বলছিলেন– ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।

চিৎকারে শুনে তাঁর স্ত্রী ভীত সন্ত্রস্তভাবে এসে বললেন– আপনার কি হয়েছে? আমীরুল মুমেনীন কি ইন্তেকাল করেছেন?

হযরত সাঈদ কম্পিত কণ্ঠে বললেন, না! তার থেকে মারাত্মক সর্বনাশ হয়ে গেছে!

তাঁর স্ত্রী পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন– মুসলিম উম্মাতের ওপরে কোন ধরনের বিপদ এসে পড়েছে কি?

তিনি বললেন– না! এর থেকেও বড় ক্ষতি হয়ে গেছে।

পুনরায় তার স্ত্রী জানতে চাইলেন– সেই বড় ক্ষতিটা কি?

তিনি ভীত কম্পিত কণ্ঠে বললেন– আমার পরকালের জীবন বরবাদ করে দেয়ার জন্য আমার কাছে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস এসে দাঁড়িয়েছে। আমার ঘরে মারাত্মক ধরনের বিপদ প্রবেশ করেছে।

তাঁর স্ত্রী তখনও খলীফা প্রেরিত দিনার সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। তিনি বললেন– এত অস্থির হয়েছেন কেন, বিপদ ঘর থেকে দূর করে দিন।

হযরত সাইদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন– এ ব্যাপারে তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে?

স্ত্রী বললেন– পরকালের জীবন বরবাদ হয়ে যেতে পারে যে বিপদের কারণে, সে বিপদকে অবশ্যই ঘর থেকে বের করে দিয়ে পরকালের শান্তি নিশ্চিত করতে হবে। আর এ ব্যাপারে আমি আপনাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবো।

হযরত সাইদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দিনারের থলির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে স্ত্রীকে বললেন– আমীরুল মুমেনীন এই বিপদ আমাদের ঘরে পাঠিয়েছেন।

স্ত্রী বললেন– ঠিক আছে, অভাবী লোকদের ডেকে এগুলো এখনই বিলিয়ে দিলে তো বিপদ বিদায় হয়।

তিনি থলির সমস্ত দিনার বিলিয়ে দিয়ে রিক্ত হস্তে নিশ্চিন্ত মনে ঘরে এলেন। কিছুদিন পর খলীফা হিমস নগরী স্বচক্ষে পরিদর্শনে গেলে সেখানের জনগণ তাঁদের শাসনকর্তার বিরুদ্ধে চারটি গুরুতর অভিযোগ খলীফার কাছে উত্থাপন করলো। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নিজেই বর্ণনা করেন, অভিযোগ অত্যন্ত গুরুত্ব ছিল। আমি সাঈদকে জনগণের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে অভিযোগের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম, সাঈদ সম্পর্কে আমার যে উচ্চ ধারণা রয়েছে তা যেন পরিবর্তন না হয়।

আমি হিমসের জনগণ ও তাঁদের শাসনকর্তা সাঈদকে একত্রিত করে জনগণকে প্রশ্ন করলাম– তোমাদের আমীরের বিরুদ্ধে তোমাদের অভিযোগ কি?

জনতার মধ্য থেকে জবাব এলো– তিনি সকালে আমাদেরকে সাক্ষাৎ দিতে বেশ দেরী করেন।

খলীফা সাঈদকে বললেন– সাঈদ! এ ব্যাপারে তোমার জবাব কি?

শাসনকর্তা সাঈদ বললেন– আল্লাহর শপথ! জনগণের সাথে সাক্ষাৎ করতে কেন দেরী হয়, এ কথা আমি কোন দিন প্রকাশ করতাম না। আজ আমাকে তা প্রকাশ করতে বাধ্য করা হলো। কেননা দেশের জনগণ তাঁদের নেতা সম্পর্কে সব কিছু জানার অধিকার রাখে। নেতাকে যে কোন প্রশ্ন করার অধিকার ইসলাম সাধারণ মানুষকে দিয়েছে। সকালে জনগণের সাথে সাক্ষাৎ করতে দেরী হওয়ার কারণ হলো, আমার কোনো কাজের লোক নেই। আমার সংসারের দৈনন্দিন কাজগুলো নিজ হাতে করে তারপর বাইরে আসি। এ জন্য জনগণের সাথে সাক্ষাৎ করতে আমার দেরী হয়ে যায়।

খলীফা পুনরায় উপস্থিত জনতাকে জিজ্ঞাসা করলেন– তোমাদের নেতার বিরুদ্ধে আর কি অভিযোগ আছে?

সমবেত জনতা বললো– তিনি রাতে কারো সাথে সাক্ষাৎ করেন না।

হযরত ওমর হযরত সাঈদকে প্রশ্ন করলেন– সাঈদ! তুমি জনগণকে রাতে সাক্ষাৎ দাও না কেন?

তিনি বললেন– আল্লাহর শপথ! আমি রাতে কেন সাক্ষাৎ করি না, একথা কোন দিন-ই এই অবস্থার সম্মুখীন না হলে প্রকাশ করতাম না। আমি দিন ও রাতকে দুই ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। দিনকে দেশের জনগণের খেদমতের জন্য নির্বাচন করেছি আর রাতকে নির্বাচন করেছি মহান আল্লাহর দরবারে সিজদায় নিজেকে নিয়োজিত রাখার জন্য।

আমীরুল মুমেনীন পুনরায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে প্রশ্ন করলেন– তোমাদের আর কি বলার আছে সাঈদের বিরুদ্ধে?

লোকেজন বললো– তিনি প্রত্যেক মাসে একদিন কারো সাথে সাক্ষাত করেন না।

খলীফা বললেন– ব্যাপার কি সাঈদ! মাসে একদিন কেন সাক্ষাৎ করো না?

তিনি জবাবে কান্না জড়িত কণ্ঠে বললেন– আমীরুল মুমেনিন! আল্লাহর শপথ! এ কথাও আমি কক্ষনো কারো কাছে প্রকাশ করতাম না। প্রকৃত বিষয় হলো, আমার ব্যবহার করার মতো একটি মাত্র পোষাক ব্যতীত দ্বিতীয় কোন পোষাক নেই। প্রতি মাসে তা আমি একবার পরিষ্কার করি। ওটা যখন পানি দিয়ে পরিষ্কার করি তখন তা-না শুকানো পর্যন্ত বাইরে আসতে পারি না। এজন্য আমি মাসে একদিন আমার পরিধানের পোষাক পরিষ্কার করার কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখি বলে সেদিন জনগণকে সাক্ষাৎ দিতে পারি না।

ফারুক আযম হযরত ওমর পুনরায় হিমসবাসীকে জিজ্ঞাসা করলেন– তোমাদের শাসনকর্তা সাঈদ সম্পর্কে তোমাদের আর কি বলার আছে?

হিমস নগরীর লোকেরা বললো– তাঁর ব্যাপারে আরেকটি অভিযোগ রয়েছে। তিনি আমাদের সাথে কথা বলার সময় প্রায়ই হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত সাঈদের দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকালেন। তিনি বললেন– সাঈদ! তুমি কি রোগে আক্রান্ত?

এই প্রশ্নের সম্মুখিন হয়ে দুনিয়া বিরাগী হযরত সাঈদ চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। তার চোখ দিয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে দাড়ি ভেজে গেল। তিনি বললেন– আমীরুল

মুমেনীন! আমি তখনো ইসলাম কবুল করিনি। ইসলাম কবুল করার অপরাধে হযরত খুবাইব ইবনে আদীকে ধরে আনা হলো। মক্কাব্যাপী ঘোষনা দেয়া হলো খুবাইবকে শূলে মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে। অগণিত মানুষ এই করুণ দৃশ্য দেখার জন্য বধ্যভুমিতে জমায়েত হলো। আমিও সেই দর্শকদের মধ্যে ছিলাম। আমি দেখলাম, ইসলামের শত্রুরা যখন খুবাইবের দেহের অঙ্গসমূহ একটি একটি করে কেটে বিচ্ছিন্ন করছে, তখন মৃত্যু যন্ত্রণার ঐ চরম মুহূর্তে খুবাইবকে কাফিররা জিজ্ঞাসা করলো– খুবাইব! তোমাকে ছেড়ে দিয়ে তোমার স্থলে যদি মুহাম্মাদকে এনে এ অবস্থা করা হয়, এতে কি তুমি রাজি হবে?

হযরত খুবাইবের তখন মুমুর্ষ অবস্থা। হাত-পা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। দেহের গোস্ত খুবলে খুবলে তোলা হয়েছে। কথা বলার শক্তি নেই, তবুও তিনি একথা শোনার পরে আহত সিংহের মতো গর্জন করে বললেন– আমি এ অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে আমার স্ত্রী-পুত্রদের মধ্যে ফিরে যাই, আমি সুখে থাকি। এর বিনিময়ে আল্লাহর রাসূলের পায়ে একটি কাঁটা বিদ্ধ হোক, এটাও আমি সহ্য করতে পারবোনা।

এ কথা বলার পর পরই খুবাইবকে হত্যা করা হলো। আমার স্মৃতিতে যখন ঐ মর্মান্তিক দৃশ্য ভেসে উঠে তখন আমি আর নিজেকে স্থির রাখতে পারি না। আমার মধ্যে তীব্র অনুশোচনা সৃষ্টি হয়, কেন আমি সেদিন খুবাইবকে সাহায্য করলাম না। এই চিন্তায় আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।

হযরত সাঈদের মুখ থেকে এ বর্ণনা শুনে খলীফাসহ সমবেত জনতা চিৎকার করে কেঁদে উঠলো। এরপর ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন– সমস্ত প্রশংসা ঐ মহান আল্লাহর, যিনি সাঈদ সম্পর্কে আমার ধারনা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেননি।

একথা বলে খলীফা সাঈদের পরিবারে এক লক্ষ দিনার পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর স্ত্রী দিনার দেখে বললেন– সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে অভাব দূর করার মত অর্থ দিয়েছেন। আপনি এ অর্থ দিয়ে আমাদের জন্য খাদ্য কিনে আনুন এবং একটি কাজের লোকের ব্যবস্থা করুন।

সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু স্ত্রীকে বললেন– এর থেকে ভালো কিছু যদি আমরা অর্জন করি তা কি তুমি চাও?

স্ত্রী বললেন– অবশ্যই চাই, বলুন সেই ভালো কিছু কি?

তিনি বললেন– এসো, এ অর্থ আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অভাবী লোকদের মাঝে বিলিয়ে দেই।

স্ত্রী আনন্দ চিত্তে স্বামীর প্রস্তাবে রাজি হলেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে সমুদয় অর্থ বিলিয়ে দিয়ে নিজেরা অনাহার আর অভাবের জীবন বেছে নিলেন। খলীফা রাষ্ট্রীয় কাজে একবার তাঁকে মদীনায় আহ্বান করলেন। তিনি যখন খলীফার সাথে মদীনায় সাক্ষাৎ করার জন্য গেলেন, তখন তাঁর হাতে একটি লাঠি এবং সেই লাঠির সাথে একটি পানি পান করার পাত্র বাঁধা দেখে খলীফা অবাক কণ্ঠে জানতে চাইলেন– আপনার প্রয়োজনীয় জিনিস কোথায়?

তিনি খলীফাকে জানালেন– এগুলোই আমার প্রয়োজনীয় জিনিস। যখন আহারের প্রয়োজন হয়, তখন এই পাত্রে আহার করে পানি পান করি। প্রয়োজন শেষ হলে তা এই লাঠির সাথে বেঁধে রাখি।

মানুষের মন-মস্তিষ্ক যখন পরকালের অনন্ত জীবনের প্রতি নিবিষ্ট হয়ে যায়, পরকালে জবাবদিহির অনুভূতি যখন মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়, তখন সে মানুষ হয় অত্যন্ত সতর্ক এবং দায়িত্বশীল। তাঁর ভেতরে কোনো পদের আকর্ষণ বা নেতৃত্বের কোন মোহ থাকে না। অযাচিতভাবে তাঁর প্রতি দায়িত্ব এসে গেলেও সে দায়িত্ব পালনে কোন ত্রুটি হলো কিনা, সে চিন্তায় তাঁদের চোখ থেকে ঘুম চলে যায়। অর্থ-বিত্ত সামনে এলে সেগুলোকে তাঁরা পরকালের শান্তির পথে অন্তরায় মনে করেন। পৃথিবীতে তাঁরা একজন মুসাফীরের মতই জীবন-যাপন করেন।

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই হলো তাঁরা নিজেদের অভাবের গলায় তরবারী চালিয়ে অপর ভায়ের অভাব মোচন করেন। এ আন্দোলনের কর্মীরা নেতৃত্ব লাভ করলে অধীনস্থদের সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে নিজেরা সীমাহীন দারিদ্র্যতার করাল গ্রাসে নিপতিত হন। তবুও তাঁরা তাঁদের অভাব কারো কাছে প্রকাশ করেন না। দেশের জনগণের প্রভূত অর্থ-সম্পদের রক্ষক হয়েও তাঁদের ঘর থাকে অর্থ শূন্য। যে হাত দিয়ে তাঁরা অভাবীদের সাহায্য করেন, সেই হাত দিয়ে অনাহার ক্লিষ্ট স্ত্রী-সন্তানদের মুখে এক মুষ্টি অন্ন তুলে দিতে পারেন না।

জাতির দেহকে তাঁরা মূল্যবান পোষাকে আবৃত করে, নিজেরা থাকেন শত ছিন্ন তালিযুক্ত জীর্ণ পোষাকে। তাঁরা নিজেদেরকে জনগণের শাসক মনে না করে জনগণের চাকর মনে করতেন। আল্লাহর কোরআন এমনই ধরনের সৎলোক গড়েছিল, যাঁরা আদালতে আখিরাতে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহির ভয়ে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত থাকতেন সন্ত্রস্ত। আর এ ধরনের সৎলোক গড়তে সক্ষম না হলে জাতির ভাগ্যাকাশ থেকে দুর্যোগের ঘনঘটা কোন দিনই বিদায় নেবে না।

আপন পরিচয়েই তুমি সুমহান

ফজরের নামাজ আদায় করে খলীফা ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু প্রতিদিন মদীনা নগরীর বাইরে মরুপ্রান্তরে এসে কোন খৈজুর গাছের নীচে বসে থাকেন। তাঁর দৃষ্টি ধূ-ধূ মরুভূমির ওপরে কি যেন খুঁজতে থাকে। পারস্য বাহিনীর সাথে মুসলমানদের কাদেসিয়ায় প্রচন্ড যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধের কোন সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না। এ জন্য খলীফা বড়ই অস্থির। মুসলিম সৈন্যদেরকে যুদ্ধের ময়দানে পাঠিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্টপতি চিন্তামুক্ত থাকতে পারেন না। তিনি বিচলিত হয়ে পড়েছেন যুদ্ধের সংবাদ জানার জন্য। সেদিনও ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মদীনা নগরীর বাইরে এসে মরুপথের দিকে তাকিয়ে আছেন। অনেক দূরে তিনি দেখলেন, একজন লোক উটের পিঠে আরোহন করে দ্রুত মদীনার দিকে আসছে। খলীফা নিজেকে সংবরণ করতে পারলেন না। তিনি ছুটে গেলেন উষ্ট্রারোহীর কাছে। উৎকণ্ঠার সাথে জিজ্ঞাসা করলেন– আপনি নিশ্চয়ই কাদেসিয়া থেকে আগমন করছেন?

লোকটি বললো– জ্বী, আমি কাদেসিয়া থেকেই আসছি। খলীফার কাছে যাচ্ছি যুদ্ধের সংবাদ দিতে।

উষ্ট্রারোহী লোকটি খলীফা ওমরের নামের সাথে পরিচিত– চেহারার সাথে নয়। এ কারণে সে জানতেও পারলো না, স্বয়ং খলীফা ওমর তার সাথে কথা বলছেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যখন সংবাদ বাহকের সাথে কথা বলছিলেন লোকটি তখন দ্রুত উট চালিয়ে মদীনা নগরীতে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর বাড়ির দিকেই যাচ্ছিলেন যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের সংবাদ দিতে। খলীফা উটের পাশ দিয়ে দ্রুত ছুটছেন আর ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছেন। এভাবে চলার অবস্থাতেই খলীফা সংবাদ বাহকের কাছ থেকে যুদ্ধের সংবাদ শুনছেন। সংবাদ বাহক ও খলীফা যখন মদীনা নগরীতে প্রবেশ করলেন তখন অনেকেই ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে দেখে সালাম জানালো– 'আচ্ছালামু আলাইকুম ইয়া আমীরুল মুমেনীন'

সংবাদ বাহক হতবিহ্বল হয়ে পড়লো। সে উটের লাগাম টেনে ধরলো। ভয়ে তার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠলো। সর্বনাশ! অনেক দূর থেকে যে লোকটি তার উটের পাশে পাশে ছুটে এসেছে, এই ব্যক্তি আর কেউ নয়– স্বয়ং খলীফা। আর সে কিনা খলীফাকে এভাবে কষ্ট দিয়েছে!

সংবাদ বাহক দ্রুত উটের পিঠ থেকে নেমে পড়লো। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে খলীফার দিকে

তাকিয়ে আনুতাপের স্বরে বললো– আমীরুল মুমেনীন! আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। অনুগ্রহ করে আমাকে ক্ষমা করে দিন।

সংবাদ বাহরে কথার প্রতি খলীফার মনোযোগ নেই। তিনি বিরক্তি ভরে বললেন– ওসব কথা বলে সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নেই। সৈন্যবাহিনীর কি অবস্থা বিস্তারিত বলে যাও।

আল্লাহ আইন আর সৎলোকের শাসন কায়েম হলে জনগণ রাষ্ট্রীয় প্রশাসনযন্ত্রকে শাসক হিসেবে না পেয়ে সেবক হিসেবেই পায়। আল্লাহর ভয় যাদের মধ্যে বিদ্যমান, তাঁরা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে আসীন হলেও পদের অহঙ্কার করেন না। বিনয় হয় তাঁদের চরিত্রের ভূষন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিনয়ী লোকদেরকে নিজের বান্দাহ্ হিসেবে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করে বলেছেন–

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا–

আল্লাহর প্রকৃত দাস যারা তাঁরা এই পৃথিবীতে হয় বিনয়ী।

শত্রুও তুমি বন্ধুও তুমি

প্রতিটি যুগেই ইসলামী আন্দোলনের বিরোধীতা করা হয়েছে– এখনো হচ্ছে, আগামীতেও হবে। এক শ্রেণীর লোক সবকিছু জেনে বুঝে এই আন্দোলনের বিরোধিতা করে, আর আরেক শ্রেণীর লোক না বুঝে অন্ধ আবেগে অথবা অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিরোধিতা করে। যারা জেনে বুঝে পার্থিব স্বার্থের কারণে ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা করে তাদের মধ্য খুব কম সংখ্যক লোকই নিজের ভুল উপলব্ধি করতে পেরে এই আন্দোলনে শামিল হয়।

আর যারা না বুঝে অন্ধ আবেগে এই আন্দোলনের বিরোধিতা করে, তাদের সামনে দ্বীনে হক্-এর কর্মীরা অসীম ধৈর্য সহকারে যখন সত্য উত্থাপন করে, তখন তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই সত্য গ্রহণ করে এই আন্দোলনে শামিল হয়ে মুজাহিদে পরিণত হয়। দ্বীনি আন্দোলনের অতীত ইতিহাস থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত এ অবস্থাই দেখা যাচ্ছে। বর্তমানে আন্দোলনের অধিকাংশ কর্মীকে প্রশ্ন করে জানা যাবে যে, তাঁরা না বুঝে ইসলামী আন্দোলনের বিপরীত আন্দোলন করেছেন।

এমনই ধরনের এক ব্যক্তিত্ব ইকরামা ইবনে আবু জেহেল। পিতার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে সত্যের প্রতি চোখ বন্ধ করেছিলেন। আজ তার দৃষ্টি উন্মিলিতি

হয়েছে– দৃষ্টির সামনে মহাসত্য মধ্য গগনের সূর্যের ন্যায় আপন প্রভায় দীপ্তিমান। ইকরামা তাঁর শিরা উপ-শিরায় ধাবমান প্রতিটি রক্ত বিন্দু দিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রেম অনুভব করছেন। ইসলাম কবুল করেই তিনি তাঁর অতীত ভূমিকার কারণে দিবারাত্রি অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হতে লাগলেন। অনুশোচনার অনলে পুড়ে হযরত ইকরামা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইসলামের মর্দে মুজাহিদে রূপান্তরিত হলেন। অথচ মাত্র কিছুদিন পূর্বেও ইসলামের নাম শুনলে তাঁর শরীরে জ্বালা অনুভব হতো। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন। এক সময় যে শক্তি দিয়ে তিনি ইসলামের বিরোধিতা করেছেন, আজ তার দ্বিগুণ শক্তি দিয়ে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম রাখার চেষ্টা করবেন। তাওহীদের বিপ্লবী স্পর্শে তাঁর হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রীতে যে শক্তির সৃষ্টি হয়েছে, সে শক্তিকে আর দমন করে রাখা সম্ভব নয়। ইতোমধ্যে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো আরবের ধূসর মরু প্রান্তরে। ইকরামার শক্তির স্ফুরণ ঘটানোর ক্ষেত্র প্রস্তুত হলো। যে হাত দিয়ে ইকরামা এক সময় পিতা আবু জেহেলের সাথে ইসলামের বিরুদ্ধে তরবারী ধারণ করে ইসলামপন্থীদের ওপরে আঘাত করেছেন, আজ সেই হাতে সুতীক্ষ্ম ধার তরবারী শোভা পাচ্ছে, সে তরবারী আঘাত করবে ইসলামের শত্রু শক্তিকে।

ইকরামা যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হয়ে হযরত খালিদ সাইফুল্লাহর নেতৃত্বে চললেন ইসলামের শত্রু নিধন করতে জিহাদের উত্তপ্ত ময়দানের দিকে। আজ পিতা আবু জেহেলও যদি বাতিল শক্তির পক্ষ নিয়ে ইকরামার সামনে দাঁড়াতো তাহলে ইকরামার তাওহীদের তরবারী পিতার রক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠত। ইকরামা গোটা অবয়বে শাহাদাতের উদগ্র নেশা নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহু আকবর বলে গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অপরূপ এ দৃশ্য। ইসলামের চীর দুশমন আবু জেহেলের আত্মজ, তারই রক্তে গঠিত ইকরামার হাত আজ মহা বীরবীক্রমে আবু জেহেলের অনুসারীদেরকে আঘাত করছে। যে হাত পিতার ইসলাম বিরোধী কর্মকান্ডে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছে, যে পা দুটি ইসলামপন্থীদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে উল্কার বেগে ছুটে গিয়েছে, আজ সেই হাত, সেই পা, ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত ক্ষীপ্রতার পরিচয় দিচ্ছে। যে চোখ শানিত তরবারীর মত ইসলাম পন্থীদের রক্ত পিপাসায় ছিল তৃষ্ণার্ত, আজ সেই চোখ যুদ্ধের ময়দানে ইসলামের শত্রুদের রক্ত পিপাসায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। যে হৃদয় ছিল পৌত্তলিকতার অন্ধকারে নিমজ্জিত, আজ সে হৃদয় তাওহীদের প্রেমরসে সিক্ত। আকাশ-বাতাস বৃক্ষ-তরুলতাও বোধহয় ইকরামার সর্বাঙ্গীন পরিবর্তন অবলোকন করে আল্লাহর প্রতি সিজদায় অবনত হয়েছে।

আবু জেহেল তনয় ইকরামা আজ ইসলামের মুজাহিদ। চোখে মুখে শাহাদাতের অদম্য কামনা। বীরবীক্রমে যুদ্ধের ময়দানে বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। তাঁর তরবারী থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আজকের যুদ্ধের সেনাপতি হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। তিনি প্রাণ ভরে ইকরামার লড়াই দেখছেন। অতীতের বেদনাদায়ক শতস্মৃতি বোধহয় হযরত খালিদের হৃদয় আকাশে অরুন্ধতী নক্ষত্রের মতই উজ্জ্বল হয়ে আছে। ক্ষণিকের জন্য বোধহয় তাঁর মন রণপ্রান্তর থেকে চলে গিয়েছিল সেই দূর অতীতের মক্কার এক নিভৃত মরুপ্রান্তরে। খালিদ ইসলামের দাওয়াত কবুল করেছেন, এ খবর মক্কায় ছড়িয়ে পড়লো। আবু জেহেল পুত্র ইকরামা তাঁর সামনে এসে তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করছে। তিনি যেন ইসলাম ত্যাগ করেন। যুদ্ধের রণ হুংকারে হযরত খালিদ বোধহয় চমকে উঠলেন। ফিরে এলেন বাস্তবে। তিনি দেখছেন, কাফিরদের আঘাতে যখনই কোন মুসলিম সৌন্য পিছনের দিকে সরে আসছে তখনই ইকরামা বীরত্বব্যঞ্জক কবিতা আবৃত্তি করে মুসলিম বাহিনীর মনে সাহস সঞ্চয় করার চেষ্টা করছেন। ইকরামা নিজেও তরবারী চালিয়ে বেশ কিছু শত্রু ধ্বংস করলেন। হৃদয় তাঁর চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সময় স্রোতের মত বয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এখনো তাঁর ভাগ্যে শাহাদাত নছিব হচ্ছে না। আল্লাহর রাস্তায় প্রাণ দেয়ার জন্য ইকরামা অস্থির হয়ে উঠেছেন।

হঠাৎ কাফিরদের অস্ত্রের মরণ আঘাতে ইকরামা রক্তাক্ত দেহে ধূলায় লুটিয়ে পড়লেন। হযরত খালিদ দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে ইকরামার কাছে গিয়ে তাঁর মাথা নিজের কোলের ওপর তুলে নিলেন। ইকরামার জীবনী শক্তি অত্যন্ত দ্রুত নিঃশেষ হয়ে আসছিল। তিনি বহু কষ্টে বললেন– ভাই খালিদ! আমিরুল মুমেনীন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে আমার সালাম জানিয়ে বলবে, আবু জেহেলের পুত্র ইকরামা যে তাওহীদের বিশ্বাস অন্তরে লালন করতো আজ সেই বিশ্বাসের ওপরেই আল্লাহর রাস্তায় জীবন দান করেছে।

পদ-মর্যাদা নয়- প্রভুর সন্তুষ্টিই জীবনের গৌরব

সিরিয়ার সেনা ছাউনি। সাধারণ সেনাবাহিনী সারিবদ্ধ ও সুশৃংখলভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সম্মুখের সারিতে সামরিক বাহিনীর অফিসারবৃন্দ। সেনাবাহিনীর সামনে দন্ডায়মান কমান্ডার ইন চীফ সিপাহ্সালার মহাবীর খালিদ সাইফুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। খলীফাতুল মুসলেমিন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মদিনা থেকে দুত পাঠিয়েছেন। দুত এসেছেন সামরিক বাহিনীর জন্য

গুরুত্বপূর্ণ একটি পত্র নিয়ে। খলীফার দূত সাদ্দাত ইবনে আওসা পত্রপাঠ করছেন। পত্র লিখেছেন খলীফা। বিশাল সেনাবাহিনীর সম্মুখে জেনারেল খালিদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দন্ডায়মান। পরিবেশ যেন কবরের নিস্তব্ধতা। খলীফার পত্রে জানা গেল এই মুহূর্ত থেকে জেনারেল খালিদ সাইফুল্লাহকে সেনাবাহিনীর প্রধান থেকে পদচ্যুত করে জেনারেল আবু ওবায়দাকে সেনাবাহিনী প্রধান নিযুক্ত করা হলো। শত সহস্র সেনাবাহিনীর সবারই চোখে মুখে বিস্ময়। হযরত খালিদের চেহারায় কোনো পরিবর্তন নেই, গোটা অবয়বে পূর্বের সেই প্রফুল্লতা। অবনত মস্তকে মুসলিম জাহানের কর্ণধার খলীফা ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর আদেশ মেনে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে সেনাবাহিনী প্রধানের স্থানে দাঁড় করিয়ে নিজে পিছনের সারিতে সাধারণ সেনাবাহিনীর মধ্যে এসে দাঁড়ালেন।

জিহাদের ময়দানের অমিত তেজীবীর জেনারেল খালিদ, যাঁকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপাধি দিয়েছেন 'সাইফুল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর তরবারী। এখন তিনি কমান্ডার ইন চীফ নন, সাধারণ এক সিপাহী মাত্র। ক্ষণপূর্বেও যিনি ছিলেন বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের অগণিত সেনাবাহিনীর প্রধান, তিনি পদচ্যুত হয়ে এখন একজন সাধারণ সৈনিক মাত্র। তাঁরই অধীনস্ত সামরিক অফিসার জেনারেল আবু ওবায়দার কমান্ড এখন তাঁকে মেনে চলতে হবে। নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় তিনি আর সেনাবাহিনী ও যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারবেন না। একটু পূর্বেও যে সেনাবাহিনী তাঁর অঙ্গুলী হেলনে মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তো এখন তিনিই জেনারেল আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর নির্দেশ অনুসরণ করবেন।

এই ডিমোশন বা পদচ্যুতির জন্যে কি জেনারেল খালিদের চোখ দুটো হিংস্র আক্রোসে অগ্নি পিন্ডের ন্যায় জ্বলে উঠেছিল ? আল্লাহর ব্যঘ্র খালিদ– তাঁর পদচ্যুতির আদেশ শ্রবণ করে রাগে-ক্ষোভে, দুঃখ-শোকে প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে উঠেছিলেন? এভাবে অপমানিত হয়ে জেনারেল খালিদ সামরিক বাহিনীর অনুগত অফিসারদের সাথে ষড়যন্ত্র করে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিলেন ? অথবা খলীফার এই অপমানজনক আদেশ মেনে নিতে তিনি অস্বীকৃত জানিয়েছিলেন ? খলীফা কেন তাকে সেনাবাহিনীর পদ থেকে অপসারণ করলেন, এ জন্য মহাবীর খালিদ কি কোন কৈফিয়ত দাবি করেছিলেন? অথবা তিনি কি তাঁরই অধীনস্ত অফিসার জেনারেল আবু ওবায়দার আনুগত্য করতে অবহেলা প্রদর্শন করেছিলেন ? এমনটি কি হয়েছিল যে, পদচ্যুতির অপমানের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সামরিক বাহিনীর মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে মুসলিম সামরিক সংগঠনকে দূর্বল করার চেষ্টা তিনি করেছিলেন? অথবা

তিনি কি সেনাবাহিনীর পদ হারানোর যন্ত্রণায় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে নিভৃতে কোথাও অশ্রু বিসর্জন দিয়েছিলেন?

না! এ সবের কিছুই হয়নি। জেনারেল খালিদ জানতেন, ইসলামের অন্যতম শিক্ষা হলো ইসলামী রাষ্ট্র বা সংগঠনের নেতার আদেশ অবনত চিত্তে গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। এ কারণেই পদাবনতি ঘটার পরে তাঁর মুখে পূর্বের সেই হাসিই দেখা গিয়েছিল। তাঁর প্রশান্ত চেহারাতে পদচ্যুতির কোন গ্লানিই স্পর্শ করতে পারেনি। ডিমোশন তাঁর হৃদয়ে কোন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পারেনি। তাঁর কাছে পদ বড় হয়ে দেখা দেয়নি। কর্তব্য কর্মই বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। সংগঠনের কোন পদ থেকে তাঁকে অপসারিত করা হলো বা সংগঠনের কোন স্তরের নেতা তাঁকে বানানো হলো এ চিন্তা জেনারেল খালিদ করেননি। তিনি সর্বদা এই চিন্তাই করেছেন, তিনি মুসলিম হিসেবে তথা আল্লাহর একজন গোলাম হিসেবে কতটুকু দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়েছেন।

পদচ্যুতির আদেশ শোনার পরে আল্লাহর তরবারী জেনারেল খালিদ সেনাবাহিনীর পিছনের সারিতে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছিলেন– খলীফাতুল মুসলেমিন ফারুকে আযম যদি কোন হাবশী গোলামকেও আমার নেতা নির্বাচিত করতেন, তবুও আমি খলীফার আদেশ অবনত চিত্তে গ্রহণ করতাম। আর এখন যাঁকে আমার নেতা নির্বাচিত করা হয়েছে সেই আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কতই না উত্তম ব্যক্তি।

পদাবনতির পরেই জেনারেল আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর আদেশে তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাফরকে নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধে বিজয়ী হন। হযরত খালেদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর গর্ভধারিণী মাতা মনে আকাংখা পোষণ করতেন এবং নামাযান্তে আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন, যেন তাঁর সন্তান খালিদ জিহাদের ময়দানে শহীদ হন। কিন্তু জেনারেল খালিদকে আল্লাহর রাসূল তাঁর পবিত্র জবানে বলেছেন, সাইফুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর তরবারী। তাঁকে শাহাদাত বরণ করতে হলে তো কাফিরদের অস্ত্রের আঘাতে শহীদ হতে হবে। কিন্তু আল্লাহর তরবারী তো কাফিরদের অস্ত্রের আঘাতে ভাঙ্গতে পারেনা। সুতরাং তিনি শহীদ হননি বটে– পক্ষান্তরে অসংখ্য শহীদের মর্যাদায় তিনি মহান আল্লাহর দরবারে অভিষিক্ত হয়েছেন।

খালিদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মৃত্যু শয্যায় শায়িত। মা পাশে বসে কাঁদছেন। তিনি আক্ষেপ করে বলছেন– হে আল্লাহ! আমার খালিদের দেহের সর্বত্র ইসলামের

শক্রুরা অস্ত্রের আঘাত হেনেছে। কিন্তু আমার খালিদ শহীদ হয়নি। আমার মনে বড় আশা ছিল, খালিদ শহীদ হবে আর আমি হবো শহীদের মা। কিয়ামতের কঠিন ময়দানে তোমার সামনে আমি নিজেকে শহীদের মা হিসেবে পরিচয় দেব। কিন্তু তুমি আমার মনের সে আশা পূর্ণ করলে না।

সন্তানের ইন্তেকালের পরে গর্ভধারিণী মাতা ঘুমের রাজ্যে স্বপ্নে দেখলেন খালিদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু জান্নাতের মধ্যে উড়ে বেড়াচ্ছেন। মা জানাতে চাইলেন– খালিদ! আল্লাহ তোমার সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন?

সন্তান খালিদ বললেন– মা, আল্লাহ আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, খালেদ তুমি কি চাও? আমি বলেছি আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিন। আমি আবার ইসলামের জন্য যুদ্ধে করে জান্নাতে ফিরে আসি।

খালিদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইসলামের সংস্পর্শে এসে বীরত্ব ও অনুগত্যের যে ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন পৃথিবীর কোন জাতি আজ পর্যন্তও এর নমুনা দেখাতে পারেনি। ইসলামী আন্দোলনের নেতা কর্মীদের এ ইতিহাস সামনে রেখে সংগঠনের কাজ আন্তরিকতার সাথে আঞ্জাম দিতে হবে। সংগঠনের কে কোন পদ পেল বা কাউকে তাঁর ওপরে অর্পিত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হলো– এ সমস্ত বিষয়ের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে, মুসলিম হিসাবে– মহান আল্লাহর একজন অনুগত গোলাম হিসেবে আল্লাহর পক্ষ থেকে দ্বীন কায়েমের যে দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে সেদিকে লক্ষ্য রেখে ময়দানে দৃপ্ত কদমে এগিয়ে গিয়ে ইনকিলাবি তুফান সৃষ্টি করতে হবে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল ছবি

ইসলাম ব্যতীত পৃথিবীতে বর্তমান সময় পর্যন্ত এমন কোন আদর্শের উদ্ভব হয়নি, যে আদর্শের প্রভাবে মানুষের মন-মানসিকতা সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প থেকে মুক্তি লাভ করেছে। একমাত্র ইসলামই পৃথিবীর মানুষকে ভিন্ন জাতি ও ধর্মের প্রতি সহনশীল হতে শিক্ষা দিয়েছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন– মুসলমানেরা যেন অন্য ধর্মের দেব-দেবী, উপাসনালয়, ধর্মীয় প্রতীক সম্পর্কে কটুক্তি না করে। অন্য ধর্ম বা তাদের অনুসারীদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ না করে। যদি কোন মুসলমান এ ধরনের কিছু করে তাহলে তাকে আখিরাতের ময়দানে শাস্তি পেতে হবে।

মুসলমানদের কাছে কোন অমুসলিম দেশ বিজিত হলে সে দেশের অমুসলিম

জনগণের সাথে তাঁরা এমন মনোমুগ্ধকর আচরণ করেছে যে, বিজিত দেশের জনগণ তাদের স্বজাতীয় শাসকের কাছে থেকেও এমন অনুপম আচরণ কল্পনাও করেনি। একমাত্র মুসলিম ব্যতীত অন্যান্য সকল জাতি যে সাম্প্রদায়িক দুষ্টক্ষতে আক্রান্ত, তার প্রমাণ অতীতেও যেমন তারা দিয়েছে বর্তমানেও তারা সাম্প্রদায়িক কাপালিকদের মত আচরণ করছে। আসমুদ্র হিমাচল রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্নাভিলাসী ভারতের বর্ণহিন্দুরা ভিন্ন জাতি ও তাদের ধর্মীয়স্থান সহ্য করতে পারছে না। পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী অশুভ খৃষ্টশক্তি ইউরোপের বুকে মুসলিম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কল্পনাও করতে নারাজ। হার্জেগোভিনা-বসনিয়া থেকে মুসলমানদের শেষচিহ্ন বিদায় করে দেয়ার লক্ষ্যে তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। মসজিদগুলো অস্ত্রের আঘাতে মাটির সাথে গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। প্রতিদিন আলজেরিয়া, চেসনিয়া, ফিলিস্তিন ও কাশ্মিরের মাটি মুসলিমদের রক্তে রঞ্জিত করা হচ্ছে। মুসলিম দেশসমূহ কুক্ষিগত করার লক্ষ্যে ইয়াহুদী ও খৃষ্টশক্তি নিজেরা আমেরিকার টুইনটাওয়ার ধ্বংস করে মুসলমানদের ওপরে দোষ চাপিয়ে হিংস্র হায়েনার মতো আফগানিস্থান ও ইরাকের ওপর হামলে পড়ে মুসলমানদের রক্ত আকণ্ঠ ভরে পান করছে। এতেও তাদের তৃপ্তি মেটেনি, অন্যান্য মুসলিম দেশেও আগ্রাসী হামলা পরিচালনা করার লক্ষ্যে তারা ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করছে।

মুসলমানরা যখন আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েম করার লক্ষ্যে কোন দেশে উপস্থিত হয়েছে, সে দেশের রাস্তা-পথে অমুসলিমদের ধর্মীয় প্রতীকগুলোও প্রহরা দিয়ে সংরক্ষণ করেছে। ইতিহাসে এ ধরনের দৃষ্টান্ত অগণিত। সিংহবীর মুসলিম সেনাপতি আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু খৃষ্টানদের সম্মিলিত শক্তিকে পর্যদুস্ত করে আলেকজান্দ্রিয়া অধিকার করলেন। প্রতিষ্ঠিত হলো আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর ওপরে সেখানের শাসনকর্তার দায়িত্ব অর্পিত হলো।

খৃষ্টানদের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়া হলো। খৃষ্টান প্রধান এলাকায় একদিন সকালে শোকের ছায়া নেমে এলো। তাদের যীশু খৃষ্টের মূর্তির নাক কে যেন রাতের আঁধারে ভেঙ্গে দিয়েছে। পাদ্রীদের নেতৃত্বে খৃষ্টানরা শাসক আমরের বাড়িতে সমবেত হলো অভিযোগ করার জন্য। তিনি অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে পাদ্রী ও খৃষ্টান নেতাদের বসার ব্যবস্থা করলেন। বিনয়ের সাথে প্রশ্ন করলেন পাদ্রীকে– সবেমাত্র সকাল হয়েছে। সকালের আরামের নিদ্রা ত্যাগ করে আপনি কষ্ট স্বীকার করে আমার

কাছে কেন এসেছে? আমাকে সংবাদ দিলে আমিই আপনাদের ওখানে যেতাম।

পাদ্রী দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলতে লাগলেন– এলাকার জনবহুল অঞ্চলে যীশু খৃষ্টের মূর্তি স্থাপন করা ছিল। গভীর রাতে সেই মূর্তির নাক ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। আমরা ধারণা করছি এ ধরনের দুষ্কর্ম কোন মুসলমান ব্যতীত অন্য কেউ করতে পারে না। আমরা আপনার নিকট এই ন্যাক্কারজনক ঘটনার নায্য বিচার চাই।

হযরত আমর ইবনুল আস মনোযোগ দিয়ে খৃষ্টান পাদ্রীর কথা শুনলেন। তারপর বললেন– এ ধরণের অমানবিক কর্মকান্ডের জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। ইসলাম তার অনুসারীদের অপর ধর্মের ক্ষতিসাধন, অপর ধর্মের উপাস্য দেব-দেবীদের সম্পর্কে কটুক্তি বা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। তবুও যখন আপনাদের মূর্তির ক্ষতি করা হয়েছে, আপনারা অনুগ্রহ করে তা মেরামত করে নিন খরচ যা প্রয়োজন আমি তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

পাদ্রী ক্ষোভের সাথে বললো– ওটা মেরামত করা সম্ভব নয়।

শাসনকর্তা আমর বললেন– ঠিক আছে, তাহলে নতুন একটি মূর্তি স্থাপন করুন। খরচ যা প্রয়োজন তার ব্যাবস্থা করা হবে।

পাদ্রী বললেন– আপনি জানেন নিশ্চয় যে, যীশুকে আমরা খোদার পুত্র বলে বিশ্বাস করি। সুতরাং তার মূর্তি নির্মাণ করার জন্য আমরা অপবিত্র মুসলমানদের সাহায্য গ্রহণ করতে পারি না। আমরা প্রতিশোধ চাই, নাকের বদলে নাক চাই।

আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু খৃষ্টান প্রতিনিধিদের দিকে অবাক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন– ঠিক আছে! আপনি কার নাক চান?

পাদ্রী ধৃষ্টতার সাথে বললো– আমরা আপনার তথা মুসলমানদের নবীর মূর্তি নির্মাণ করে তার নাক ভেঙ্গে দিতে চাই।

একথা শোনার সাথে সাথে তাওহীদের অতন্দ্র প্রহরী নরশার্দুল ইসলামের মর্দে মুজাহিদ হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর মুখমন্ডল রাগে ক্ষোভে লাল হয়ে গেল। চোখ দুটো যেন অগ্নি গোলকের ন্যায় জ্বলে উঠলো। নিজের অজান্তেই তাঁর হাত চলে গেল কোষাবদ্ধ তলোয়ারের বাঁটে। হৃদয়ের মধ্যে এক সাথে কয়েকটি আগ্নেয়গিরি যেন অগ্নি উদগিরণ করছে, আর তার উত্তপ্ত লাভা যেন তার চক্ষুর কোটর দিয়ে তীব্র বেগে বেরিয়ে এসে খৃষ্টান প্রতিনিধি দলকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেবে।

মুহূর্ত কালের মধ্যে তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করলেন। ক্রোধ প্রশমিত করার জন্য

তিনি বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে অজু করলেন। ফিরে এসে তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন– আল্লাহ তা'য়ালা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই পৃথিবীতে মূর্তির বিনাশ সাধন করার লক্ষ্যে সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন। যে নবীকে পৃথিবীতে প্রেরণ করাই হয়েছিল মূর্তি বিনাশের দায়িত্ব দিয়ে, আর তাঁর মূর্তি নির্মাণ করা হবে আমরা মুসলমানেরা জীবিত থাকতে? যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দেহের শীরা উপশীরায় রক্ত ধাবমান থাকবে, আমাদের চোখের পলক যে মুহূর্ত পর্যন্ত পড়তে থাকবে এবং আমাদের দেহে প্রাণের স্পন্দন থাকবে, সে মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবমাননা সহ্য করবো না। আপনি যখনপ্রতিশোধই গ্রহণ করবেন তাহলে আমার নাক কেটে নিন।

প্রতিশোধ পরায়ণ খৃষ্টান পাদ্রী হযরত শাসনকর্তা আমরের এ প্রস্তাব গ্রহণ করলো। উন্মুক্ত ময়দানে অসংখ্য কৌতুহলী জনতা সমবেত হয়েছে প্রতিশোধ গ্রহণের দৃশ্য দেখার জন্য। আলেকজান্দ্রিয়ার শাসনকর্তা হযরত আমর– তিনি সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন– আমাকে এই দেশের শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। এদেশের জনগণের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু রক্ষা করা আমার দায়িত্ব। দেশের ধর্মীয় পবিত্র স্থানসমূহ রক্ষা করা আমার দায়িত্ব। আমি যথাসাধ্য আমার ওপরে অর্পিত দায়িত্ব পালন করার চেষ্ট করছি। তারপরেও যীশুর মূর্তির নাক ভাঙ্গা হয়েছে। খৃষ্টান নেতৃবৃন্দ এর প্রতিশোধ হিসেবে নাকের পরিবর্তে নাক চান। প্রকৃত অপরাধীকে যখন পাওয়া যাচ্ছে না। তখন এর দায়ভার শাসনকর্তা হিসেবে আমাকেই বহন করতে হবে। এ শাস্তি আমাকেই গ্রহণ করতে হবে।

কথায় বিরতি দিলেন তিনি। তারপর হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর নিজের সুতীক্ষ্ম ধার তরবারী পাদ্রীর হাতে উঠিয়ে দিয়ে পুনরায় বললেন– নিন, আমার নাক কেটে আপনি প্রতিশোধ করুন।

পাদ্রী তরবারী হাতে নিয়ে তরবারীর ধার পরীক্ষা করতে লাগলো। চারদিকে কবরের নিস্তব্ধতা। শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশে অগণিত মানুষ এই দৃশ্য দেখছে। তাদের সকলের দৃষ্টি হযরত আমরের প্রতি নিবদ্ধ। পাদ্রী তরবারী উত্তোলন করলো হযরত আমরের নাক কাটার জন্য। এমন সময় জনতার ভীড় ঠেলে এক নওজোয়ান এগিয়ে এলো চিৎকার করতে করতে– নাক ভেঙ্গেছি আমি। আমার নাক কাটুন, আমাদের সেনাপতি এর জন্য দায়ি নয়, আমি দায়ি।

অনুতপ্ত মুসলিম সিপাহী কথা শেষ করে তাঁর নাক বাড়িয়ে দিল পাদ্রীর হাতের

শাণিত তরবারীর নিচে। বিস্ময়ে বিমূঢ় হতবাক পাদ্রীর মুখ থেকে সহসা কোনো শব্দ নির্গত হলো না। অপলক দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে তাকলো মুসলিম সিপাহীর অনুশোচনায় দগ্ধ চেহারার দিকে। সম্বিত ফিরে পেয়ে পাদ্রী সজোরে তরবারী মাটিতে নিক্ষেপ করলেন। তারপর মুসলিম সিপাহীর দিকে মমতাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবেগ রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন– কতই না উত্তম তুমি আর তোমার সেনাপতি! আর সব চাইতে উত্তম তোমাদের ঐ মহান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিনি তোমাদেরকে এমন আদর্শে দীক্ষিত করেছেন- যার ফলে গড়ে উঠেছে এমন মহান সৎলোক। আমার প্রতিশোধ নেয়া হয়েছে, মূর্তির নাকের বদলে জীবিত মানুষের নাক কাটা সম্ভব নয়, আমরা নতুন করে মূর্তি নির্মাণ করবো।

সুতরাং মুসলমান ও ইসলামকে সম্প্রদায়িক বলার কোন অবকাশ নেই। ইসলামী আদর্শই সকল ধর্মের প্রতি সবেচেয়ে বেশী সহনশীল। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন অমুসলিমদের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু প্রাণের বিনিময়েও হেফাজত করতে। তিনি ঘোষণা করেছেন– 'কোন মুসলমান যদি কোন অমুসলিমদের ওপরে অত্যাচার করে, তাহলে আখিরাতের ময়দানে আমি নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অমুসলিমদের পক্ষ গ্রহণ করে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে আল্লাহর আদালতে মামলা দায়ের করবো।' ইসলামের অনুসারী হবার কারণেই মুসলিম জনগোষ্ঠীই পৃথিবীতে সবচেয়ে পরধর্ম সহিষ্ণুজাত।

কণ্ঠ মোর সত্য উচ্চারণে নির্ভীক

আব্বাসীয় সুলতান মানসুর সিংহাসনে উপবিষ্ট। তাঁরই আদেশে রাজ দরবারে উপস্থিত করা হয়েছে বিশ্ব বিখ্যাত তিনজন ইসলামী চিন্তাবিদকে। বাদশাহ মনসুর তিনজনের কাছে জানতে চাইলেন– আল্লাহ আমাকে রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব দিয়েছেন, এ সম্পর্কে আপনাদের কার কি ধারণা এবং আমাকে আপনারা এই পদের উপযুক্ত বলে বিবেচনা করেন কি?

সম্মানিত আলিম ইমাম মালিক- সেযুগের একজন ইসলামী চিন্তাবিদ (মালিকী মাযহাবের ইমাম মালিক নন) ইমাম মালিক বিনয়ের সাথে বাদশার প্রশ্নের উত্তর দিলেন– অবশ্যই আপনি উপযুক্ত ব্যক্তি। আপনি উপযুক্ত না হলে আল্লাহ আপনাকে বাদশাহী দান করতেন না।

এরপর মর্দে মুজাহিদ ইমাম ইবনে আবিদিব নির্ভীক চিত্তে তাঁর মতামত জানালেন- আল্লাহ এ দুনিয়ার বাদশাহী যাকে ইচ্ছা তাকেই দান করেন। কিন্তু আখিরাতের ময়দানে মর্যাদা লাভের জন্য কঠিন সাধনা করতে হয়। আর যাঁরা আখিরাতে মর্যাদা লাভের চেষ্টা করেন আল্লাহ তাঁকে অবশ্যই সাহায্য করেন। আপনি যদি আল্লাহর বিধান অনুসারে নিজের জীবন ও রাষ্ট্রকে পরিচালিত করেন তাহলে আপনি আল্লাহর রহমতের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন। আর যদি আল্লাহর অমান্য করেন তাহলে আপনি আল্লাহর গযবের উপযুক্ত হবেন। রাষ্ট্র ক্ষমতায় আরোহণ সম্পর্কে ইসলামের বিধান হচ্ছে, দেশের জনগণের রায় অনুযায়ীই রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ করা যায়। আর যিনি শক্তিবলে রাষ্ট্র ক্ষমতা ছিনিয়ে নেন তিনি সরাসরি জুলুম করেন।

বাদশাহ মনসুর এবার জলদগম্ভীর কণ্ঠে হযরত ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ)-এর মতামত জানতে চাইলেন। ইসলামের বীর মুজাহিদ, বাতিল শক্তির আতঙ্ক হযরত ইমাম আবু হানিফা নির্ভীক চিত্তে দৃপ্তকণ্ঠে তাঁর মতামত ব্যক্ত করলেন- যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে সত্য গ্রহণ করতে চায় সে সত্য কথা শুনেও ক্রোধ প্রশমিত করে। আপনি আপনার বিবেককে জিজ্ঞাসা করে দেখুন, আপনি আমাদের কাছ থেকে সত্য কথা জানার জন্য আল্লাহর মহব্বতে ডেকে আনেননি। আপনার প্রকৃত ইচ্ছা এই যে, আমরা আপনার সম্মুখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ইসলামের বিপরীত, আপনার স্বার্থের অনুকূলে মতামত পেশ করি। আপনি আপনার ক্ষমতায় টিকে থাকার স্বার্থে আমাদের মতামত সাধারণ জনগণের মধ্যে প্রচার করবেন এই বলে যে, আমি ইসলামের বিধান অনুসারেই রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ করেছি। তার দলিল হচ্ছে তিনজন আলিমের রায়। পক্ষান্তরে বাস্তব সত্য হচ্ছে, রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণকালে আপনি দু'জন সম্মানিত আল্লাহভীরু লোকের মতামতও গ্রহণ করেননি। অথচ ইসলামের বিধান হচ্ছে, রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচিত হবে জনগণের রায়ের দ্বারা। আপনার এ ইতিহাস অবশ্যই জানা উচিত যে, খলিফা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দীর্ঘ ছয় মাস পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকেছেন, ইয়ামনীদের আনুগত্যের সংবাদ না জানা পর্যন্ত।

আব্বাসীয় বাদশাহ মানসুর ধৈর্য সহকারে তিনজন শ্রেষ্ঠ মনীষীর মতামত শুনে তাঁদেরকে রাজ দরবার ত্যাগ করার অনুমতি দিলেন। এরপর তিনি উক্ত তিনজন আলিমের আল্লাহভীরুতা যাচাই করার জন্য এই ঘটনার বর্ণনাকারী মন্ত্রী রাবি বিন ইউনুছকে কয়েক হাজার স্বর্ণ মুদ্রাসহ তিনজনের কাছে পাঠালেন এবং মন্ত্রীকে নির্দেশ দিলেন, যদি ইমাম মালিক এই স্বর্ণ মুদ্রা গ্রহণ করে তাহলে তাঁকে তা দিয়ে দেবে।

আর ইমাম ইবনে অবিদিব বা ইমাম আবু হানিফা যদি এই উপঢৌকন গ্রহণ করার আগ্রহ দেখায়, তাহলে তাঁদের দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে রাজ দরবারে উপস্থিত করবে। রাবি বিন ইউনুছ যখন ইমাম ইবনে আবিদিবকে স্বর্ণ মুদ্রার থলি গ্রহণ করতে বললেন, তখন তিনি স্বর্ণমুদ্রা ভর্তি থলি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে বললেন– যে অর্থ আমি মানসুরের জন্য বৈধ মনে করি না- সে অর্থ আমার জন্য কিভাবে বৈধ হতে পারে?

মন্ত্রী উপস্থিত হলেন ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর সম্মুখে। তিনি স্বর্ণমুদ্রার থলি গ্রহণ করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করলেন। ইমাম ঘৃণা মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন– আমি এই থলি স্পর্শ করতে পারি না। এর জন্য যদি আমার দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন হয় তবুও আমি সন্তুষ্ট।

মানসুরের মন্ত্রী ইউনুস হতাশ হয়ে উপস্থিত হলেন ইমাম মালিকের কাছে। ইমাম মালিক স্বর্ণ মুদ্রার থলি গ্রহণ করলেন। রাবি বিন ইউনুছ বাদশাহ মানসুরের কাছে ঘটনা বর্ণনা করলেন। বাদশাহ মানসুর মন্তব্য করলেন– অর্থের প্রতি নির্মোভই তাঁদের দু'জনের জীবন রক্ষা করেছে।

ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ) আজীবন বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম মুখর জীবন-যাপন করেছেন। উমাইয়া-আব্বাসীয় শাসনামলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গোটা সমাজ ও রাষ্ট্রকে প্রায় গ্রাস করে ফেলেছিল। তিনি যদিও পূজিবাদী ব্যবস্থা উৎখাত করে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে পারেননি। তবুও তিনি সত্যের পক্ষে অসহনীয় অত্যাচার সহ্য করে আল্লাহর বিধানের পক্ষে উচ্চকণ্ঠে কথা বলেছেন। অত্যাচারীর রক্তচক্ষু আর হুমকী– তাঁকে মুহূর্তের জন্যও সত্য বলা থেকে বিরত রাখতে পারেনি।

তিনি রাষ্ট্রীয় কোনো পদ গ্রহণ করেননি। উমাইয়া এবং আব্বাসীয় বাদশাহরা দেশের সর্বজন মান্য সম্মানিত ব্যক্তিদের ক্ষমতার স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য রাষ্ট্রের অধীনে চাকুরী করতে বাধ্য করতো। বর্তমান তৃতীয় বিশ্বের অগণতান্ত্রিক সরকারসমূহ যেমন মন্ত্রীত্বের লোভ দেখিয়ে রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে সরকারে অংশগ্রহণ করার প্রস্তাব দেয়। লোভের বশবর্তী হয়ে অনেকে শক্তিবলে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলকারী অগণতান্ত্রিক সরকারে যোগ দেয়। ফলে অগণতান্ত্রিক সরকার বিশ্বের সামনে নিজেদেরকে বৈধ সরকার হিসেবে পরিচয় দেয়। তদানীন্তন সমাজেও অবৈধভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে দেশের বিখ্যাত আইনবিদ ও সম্মানিত আলিমদেরকে বাধ্য করা হতো সরকারী পদ গ্রহণে।

হযরত ইমাম আবু হানিফাকে একাধিকবার অনুরোধ করার পরও তিনি সরকারী পদ গ্রহণ করেননি। কুফার শাসনকর্তা তাঁকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সরকারী যে কোন পদ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানান। ইমাম সে আহ্বান ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। পরিণতি দাঁড়ালো এই যে, কুফার শাসনকর্তা ক্রোধে উন্মাদ হয়ে ইমামকে কারাগারে আবদ্ধ করে সাবধান করে দেয়া হলো যে, তিনি শাসনকর্তার প্রস্তাব গ্রহণ না করলে কারাগারে তাঁকে দৈহিক নির্যাতন সহ্য করতে হবে। সরকারী সিদ্ধান্ত জানার পরও ইমাম আবু হানিফা নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থাকলেন। কারাগারের বাইরে এ সংবাদ জানাজানি হয়ে গেলে দেশের বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ কারাগারে ইমামের সাথে দেখা করে আবেদন জানালো– বর্তমান সরকারের অধীনে কোন পদ গ্রহণ আমাদের জন্য হারাম, তবুও আমরা গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছি। আপনি মুসলিম উম্মার স্বার্থে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য সরকারের প্রস্তাব গ্রহণ করুন।

কারাগারে আগত লোকদের এই প্রস্তাব শুনে আল্লাহর ব্যঘ্র গর্জন করে বললেন– আল ওয়াসিকের মসজিদের কয়টি দরজা, আমাকে তা গণনা করার আদেশও যদি গভর্ণর দেয়, তবুও আমি তা গণনা করবো না। কোনো জালিমের আদেশ আমি পালন করতে পারি না। শাসনকর্তা নির্দোষ মানুষের মৃত্যুর সমন জারি করবে আর আমি সেই সমনে দস্তখত দেব, এটা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। ঐ আল্লাহর নামের শপথ! যার মুষ্টিতে আমার প্রাণ, আমি শাসনকর্তার ইসলাম বিরোধী কাজে অংশগ্রহণ করবো না।

কুফার গভর্ণর পুনরায় তাঁকে দেশের প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণ করার আদেশ দিয়ে বললেন– এবার যদি তিনি আমার আদেশ পালনে অবহেলা প্রদর্শন করেন তাহলে আল্লাহর শপথ! আমি চাবুকের আঘাতে তাঁকে রক্তাক্ত করবো।

গভর্ণরের এই সিদ্ধান্ত জানার পর ইমাম নির্ভীক চিত্তে অকম্পিত কণ্ঠে বললেন– দুনিয়ার চাবুক আখিরাতের চাবুকের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। সুতরাং আমি কোনক্রমেই সেই রাষ্ট্রের কোনো পদ গ্রহণ করবো না, যে রাষ্ট্র আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পরিচালিত করা হয় না। আমি মুসলমান, এক আল্লাহ ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো শক্তিকে ভয় করি না।

কুফার গভর্ণর তাঁরই শাসনাধীন এলাকর একজন নাগরিকের দুর্জয় সাহস দেখে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে পড়লেন। তিনি ইমামকে গ্রেফতার করে কারাগারের লৌহ প্রাচীরের আড়ালে আবদ্ধ করে তাঁর প্রতি কঠোর নির্যাতন শুরু করলেন। দীর্ঘ ১১ দিন পর্যন্ত তাঁর মাথায় দশটি করে চাবুকের কঠিন আঘাত হানা হতো। নির্যাতনের

অসহনীয় যন্ত্রণায় ইমামের দেহ ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়লো। তাঁর জীবনাশঙ্কা দেখা দিল– তবুও তিনি বাতিল শক্তির সম্মুখে মাথানত করলেন না। সত্যের চীর উন্নত শির ক্ষণিকের জন্যও নত হলো না নিষ্ঠুর রাজদন্ডের কাছে। গভর্ণর ইয়াজিদ বিন উমর বিন হুবাইয়া যখন জানতে পারলো, ইমামের অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে তখন তিনি মন্তব্য করেছিলেন– এমন কোন ব্যক্তি কি নেই, যিনি তাঁকে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনার ও আমার আনুগত্য করার পরামর্শ দেয়!

উমাইয়া শাসকদের পতনের পরে আব্বসীয় বংশের লোকেরা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে। তাঁরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেই নির্বিচারে উমাইয়া বংশীয় লোকদের হত্যা করতে থাকে। ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ) এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রতিবাদ করেন। এমনকি তিনি বাদশাহের বিরুদ্ধে জাকিয়া ও ইবরাহীম নামক দু'ভায়ের বিদ্রোহে সরাসরি সমর্থন দিয়ে এ বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেন। তদানীন্তন সমাজের অধিকাংশ মানুষ ইমামের প্রতি ছিল অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। ইমামের ব্যাপক জনপ্রিয়তার কারণে বাদশাহ মানসুর তাঁকে প্রকাশ্যে হত্যা করতে পারলেন না। প্রকাশ্যে ইমামের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করলে জনগণের পক্ষ থেকে বিরাট বিদ্রোহের আশঙ্কা ছিল। সুতরাং বাদশাহ মনসুর ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি ইমামকে গোটা আব্বাসীয় বিশাল সাম্রাজ্যের প্রধান বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করার জন্য অনুরোধ জানালেন।

ইমাম সরাসরি সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে বাদশাহর সম্মুখে দ্বিধাহীন কণ্ঠে বললেন– যদি আমি প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণ করিও, তবুও আপনার হীন উদ্দেশ্য বাস্তবে রূপলাভ করবে না। কারণ আমি আপনার ইসলাম বিরোধী কাজের পক্ষে কখনোই রায় দেব না। এ জন্য যদি আপনি ক্ষমতাবলে আমাকে ফোরাত নদীতে ডুবিয়ে মারেন, আমি ডুবে মরতেও প্রস্তুত, কিন্তু আপনার প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজি নই।

ইমামের স্পষ্ট কথাগুলো যেন বাদশাহ মানসুরের দেহে শত সহস্র বিষাক্ত হুলের মতোই বিদ্ধ হলো। সত্য কথার চাবুকের কষাঘাতে মানসুরের দেহে জ্বালা সৃষ্টি করলো। বাদশাহ মানসুর প্রহরীকে আদেশ দিলেন ইমামকে কারারুদ্ধ করার জন্য। ইমাম আবু হানিফা কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে বন্দী, সত্যের বীর সেনানী ইমামকে অনাহারে রাখা হচ্ছে। পানির পিপাসায় ইমামের প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত, কিন্তু তাঁকে এক বিন্দু পানি দেয়া হচ্ছে না। এই কঠিন মুহূর্তেও তাঁর দেহে চলছে চাবুকের নির্মম আঘাত।

কি অপরাধ ইমামের? অপরাধ তো মাত্র একটিই– তিনি বাতিল শক্তির সম্মুখে তাঁর চীর উন্নত শির নত করেন নি। চাবুকের নির্মম আঘাতে ইমামের দেহ ক্ষত-বিক্ষত, ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর ইমাম ক্রমশ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন। এরপরেও বাতিল শক্তি ইমামের মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য কারাগারে খাদ্যে বিষ মিশিয়ে ইমামকে দেয়া হলো। গোটা মুসলিম জাহানকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ) শাহাদাত বরণ করলেন।

আল্লাহর পথে অবিচল থাকতে গিয়ে ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ) যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তা যুগ যুগ ধরে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের অনুপ্রেরণা যোগাবে। বাতিল শক্তির সাথে সিদ্ধান্তে ঐকমত্য পোষণ করলে তিনি এই পৃথিবীতে অনেক কিছু পেতেন। কিন্তু তিনি একমাত্র আল্লাহর ভয়ে পৃথিবীর ভোগ-বিলাসের জীবন ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেছেন। আখিরাতের কঠিন আযাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য দুনিয়ার আযাবকে হাসিমুখে বরণ করেছেন। আজ গোটা পৃথিবীতে হানাফী মযহাবের অনুসারীদের সংখ্যাই সর্বাধিক। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই ইমামের জীবনের সংগ্রামী দিক অনুসরণ করেন না।

অধিকাংশ আলিমগণ মসজিদের মিম্বরে উপবেশন করে এবং ওয়াজের মাহফিলে হানাফী ফিকাহ্ বর্ণনা করে থাকেন, কিন্তু তাঁরা ইমামের অনুরূপ বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে আপোষহীন ভূমিকা পালন করেন না। দেশে অসংখ্য মসজিদ রয়েছে, এসব মসজিদের সম্মানিত ইমামগণ যদি ইমাম আবু হানিফার অনুরূপ বজ্রকণ্ঠে হুঙ্কার দিয়ে বাতিল রাষ্ট্র শক্তির বিরুদ্ধে ইসলামের বিজয় কেতন উড্ডীন করেন, তাহলে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। মসজিদের সম্মানিত ইমাম ও খতীবগণ অমুসলিম রাষ্ট্র ভারতের দিল্লীর জামে মসজিদের ইমাম সৈয়দ আব্দুল্লাহ্ বোখারীর প্রতি দৃষ্টি দিন, দেখুন তিনি কিভাবে নির্ভীক চিত্তে সত্য কথা বলছেন।

ভারতে যখন মুসলমানদের হৃদপিন্ড আল্লাহর কোরআনকে বাতিল করে দেয়ার আবেদন করে কোর্টে মামলা দায়ের করলো অমুসলিমগণ। অমুসলিমরা মুসলমানদের কলিজা ধরে টান দিয়েছে। সারা পৃথিবীর মুসলমানরা এই মামলার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করছে। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশের সাধারণ মুসলমানরাও বিক্ষোভ করছে। বাংলাদেশের ছাত্রদের মধ্যে যারা ইসলামের কাজ করে সেই ছাত্র সংগঠন শহীদী কাফেলা ইসলামী ছাত্র শিবিরের আহ্বানে রাজশাহীর

চাঁপাইনবাবগঞ্জের মুসলমানরা তীব্র বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। মিছিলের পর মিছিল হচ্ছে। এমন একটি মিছিলের ওপরে কোনো ধরনের উস্কানী ব্যতীতই ইসলামের দুশমন ম্যাজিষ্ট্রেট মোল্লা ওয়াহিদুজ্জমামানের নির্দেশে পুলিশ গুলী বর্ষণ করে, সেদিন ১৭ জন মুসলমান শাহাদাতবরণ করে।

দিল্লীর জামে মসজিদের ইমাম বোখারী কোন শক্তির রক্তচক্ষু দেখে ভয় করেননি। তিনি হিন্দু ভারতের কলিজার ওপরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন– এ ভারত আমার। কুতুব মিনার আমরা বানিয়েছি। তাজমহল আমরা নির্মাণ করেছি। শীশমহল আমরা তৈরী করেছি। দেওয়ানে আম–দেওয়ানে খাস–আমাদের। আমরা মুসলমানরা এই ভারত দীর্ঘ আটশত বছর শাসন করেছি। শ্রীহীন এই ভারতকে পত্র-পল্লবে ফুলে ফলে আমরাই সজ্জিত করেছি। সুতরাং ভারতের কোন বিচারক যদি 'কোরআনকে বাতিল করা হলো' বলে রায় ঘোষণা করে, তাহলে আমি সেই বিচারকের বুকের ওপর দাঁড়িয়ে আমার বাম হাত দিয়ে তার মুখের জিহ্বা টেনে ছিড়ে ফেলবো।

মুমীনের প্রাণ, ধন-সম্পদ যা কিছু রয়েছে, এসব দান করেছেন আল্লাহ্ এবং ক্রয়ও করে নিয়েছেন আল্লাহ। বিনিময়ে তাকে সম্মান ও মর্যাদার সাথে জান্নাত দান করা হবে। একজন মানুষ যখন ঈমান আনে, তখন সে এই উপকারীতা লাভ করে যে, তার ভেতরে কোন ভীতি থাকে না। সংগ্রামের ময়দানে কোন ধরনের দুশ্চিন্তা তার ভেতরে বাসা বাঁধে না। তার আদর্শের ওপরে কেউ আঘাত করলে সে তা সহ্য করতে পারে না, সিংহ গর্জনে রুখে দাঁড়ায়।

ঈমানের বলে বলিয়ান না হলে বাতিল শক্তি একদিন মুসলমানদের পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ) 'অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলাই সর্ব উৎকৃষ্ট জিহাদ' আল্লাহর রাসূলের এই কথার ওপরে প্রতিষ্ঠিত থেকেছেন। তিনি মুসলমানদের জন্য ইসলামকে সহজভাবে অনুধাবন করার লক্ষ্যে ত্রিশ বছরের সাধনায় এমন এক অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেছেন যার নাম 'ফিকহুল আকবর' এই মহামূল্যবান গ্রন্থে ইসলামের এমন কোন দিক নেই যা সম্পর্কে ইমাম সাধারণ মুসলমানদেরকে দিক-নির্দেশনা দেননি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুলমানরা সে গ্রন্থ থেকে তাঁদের প্রাণের খোরাক আহরণ করছে।

তোমার মত মা আজ বড় প্রয়োজন

বাতিল শক্তির সাথে আপোষ না করার কারণে হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা (রাহঃ)-কে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করা হলো। আল্লাহদ্রোহী শক্তির সাথে সামান্য একটি কথায় ঐকমত্য পোষণ করলেই তিনি দেশের মন্ত্রীত্ব বা প্রধান বিচারপতির পদ লাভ করতে পারেন। অতুল বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হতে পারেন তিনি। কিন্তু পার্থিব কোন সম্পদ, মন্ত্রীত্ব বা বিচারপতির পদের কোন প্রয়োজন নেই ইসলামী আন্দোলনের নির্ভীক সিপাহসালারের। তাঁর কাছে আখিরাতের জীবন সর্বাধিক মূল্যবান। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী বিলাসী জীবনের কোন মূল্য তাঁর কাছে নেই। তিনি অন্যায়ের সাথে আপোষ করে পরকালের অনন্ত জীবন বিনষ্ট হতে দিতে পারে না। বাতিল শক্তির কাছে মাথা নত করে তিনি কিভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সম্মুখে আখিরাতের ময়দানে দাঁড়াবেন!

ইসলাম বিরোধী শক্তির সাথে তিনি আপোষ করলেন না, কারাগারের অন্ধকার কুঠুরীকেই আপন করে নিলেন। অনেকে তাঁর কাছে জানতে চাইতো– কারাগারে আপনার কোন কষ্ট হয় না?

জবাবে ইমাম বলতেন– না, কারাগারে আমার কোন কষ্ট হয় না। তবে মাঝে মাঝে আমার ভীষণ কষ্ট হয়। আমার বৃদ্ধ মা'কে কারাগারে আমার সামনে আনা হয় এবং মায়ের সম্মুখে আমাকে চাবুকের আঘাতে রক্তাক্ত করা হয়। মায়ের সম্মুখে এই অবস্থা এই জন্যই করা হয় যেন আমার মা আমাকে বাতিল শক্তির সিদ্ধান্তের সাথে ঐকমত্য পোষণ করার অনুরোধ করেন। আল হামদুলিল্লাহ, আমার মা নিরবে দাঁড়িয়ে দেখেন, কিভাবে চাবুকের আঘাতে তার প্রিয় সন্তানের দেহ থেকে রক্তের ধারা বইতে থাকে। তাঁর চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে থাকে। চাবুকের নির্মম আঘাতে যদি কখনো আমার মুখ থেকে যন্ত্রণা কাতর শব্দ নির্গত হয়, সাথে সাথে আমার মা চিৎকার করে বলেন– খবরদার! বাতিল শক্তির সাথে কোন আপোষ করবি না।

ইসলামী আদর্শের প্রতি কত গভীর ভালোবাসা থাকলে এই বৃদ্ধ বয়সে দৃষ্টির সম্মুখে আপন কলিজার টুকরো সন্তানের প্রতি কঠোর নির্যাতন দেখেও সন্তানকে ইসলামী নীতিমালার প্রতি অবিচল থাকার নির্দেশ মা দিতে পারেন! আজ এমন মায়ের অভাব প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে বলেই গোটা সমাজ, রাষ্ট্রে ইসলামী আদর্শ নেই। সর্বত্র ইসলামী আদর্শ অপমানিত হেয় প্রতিপন্ন করা হচ্ছে। ইসলামী আন্দোলনের

লোকদের ওপরে জুলুম চলছে, কিন্তু শত কোটি নামধারী মুসলিম যুবক তরুণ, পৃথিবী ব্যাপী বিচরণ করছে- প্রতিবাদের আগুন জ্বেলে সামনে এগিয়ে আসছে না। চোখের সামনে পত্র-পত্রিকায়, রেডিও, টেলিভিশনে ইসলামী আদর্শ ও ব্যক্তিত্বদের প্রতি কটাক্ষ করে প্রবন্ধ লিখা হচ্ছে, ছবি ছাপা হচ্ছে, অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে আর মুসলিম যুবক তরুণরা খেলাধূলা, গান-বাজনায় মগ্ন। তাদের মধ্যে কোনই প্রতিক্রিয়া নেই। কারণ অধিকাংশ মায়ের কোল থেকেই তারা ইসলামের বিপরীত আদর্শের শিক্ষাই লাভ করছে। মা যদি শিশুকাল থেকেই তাঁর সন্তানের কলিজার মধ্যে ঈমানের আগুন প্রজ্জ্বলিত করতেন, তাহলে ঐ সন্তান ইসলামের পক্ষে রক্ত দেয়ার জন্য বীরবিক্রমে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তো।

সত্য প্রচারে অকম্পিত মম কণ্ঠ

বাদশাহ মানসুরের দরবারে একজন অভিযোগ করলো, আপনার সাম্রাজ্যের অধিকাংশ আলিম আপনার প্রতি ক্ষুব্ধ। মানসুর একথা শোনার পরে দেশের বিখ্যাত আলিমদের দরবারে আহ্বান করলেন। ইমাম মালিককে যখন বাদশাহের দরবারে উপস্থিত হবার জন্য বলা হলো, তখন তিনি গোসল করে কাফনের কাপড় পরিধান করলেন। তারপর পোষাকে কর্পুর মেখে বাদশাহের দরবারে উপস্থিত হলেন। বাদশাহ উপস্থিত আলিমদেরকে লক্ষ্য করে বললেন– সম্মানিত আলিমগণ! আপনারা আমার দেশের নাগরিক, আপনাদের উচিত ছিল আমার আনুগত্য করা, আমার ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন করা। কিন্তু আপনারা তা না করে সাধারণ মানুষে সামনে আমার সমালোচনা করছেন।

এতটুকু বলে বাদশাহ মানসুর ইমাম মালিককে বললেন– আমার সম্পর্কে আপনার ধারণা কি তা আমি জানতে ইচ্ছুক।

ইমাম মালিক (রাহঃ) বিনয়ের সাথে বাদশাকে বললেন– অনুগ্রহ করে আপনার সম্পর্কে আমার ধারণা কি, তা জানতে চাইবেন না।

এরপর বাদশাহ দরবারে সমবেত সকল আলিমকে একই প্রশ্ন করলেন। তাঁরাও ইমাম মালিকের অনুরূপ জবাব দিলেন। বাদশাহ আলিমদের প্রতি ক্রোধান্বিত হয়ে হুমকি প্রদর্শন করলেন। আলিমগণ ভীত না হয়ে সাহসীকতার সাথে উত্তর দিলেন– শাহাদাতের মৃত্যু অনেক বেশি মর্যাদাবান।

বাদশাহ আগত আলিমদেরকে দরবার থেকে বিদায় দিয়ে ইমাম মালিক (রাহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন– আপনার কাপড় থেকে কর্পূরের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে কেন?

ইমাম মালিক নির্ভীক কণ্ঠে উত্তর দিলেন– আপনার দরবারের সত্য বলার উপহার মৃত্যুদন্ড। এজন্য আমি শেষ গোসল সেরে কাফনের কাপড় পরিধান করে মৃত্যুর প্রস্তুতি নিয়েই আপনার দরবারে এসেছিলাম।

অতীত যুগের মর্দে মুজাহিদগণ বাতিল শক্তির সামনে হক কথা বলতে দ্বিধা করতেন না। তারা মনে করতেন, মৃত্যু তাঁদের পায়ের ভৃত্য। শহীদী মৃত্যুর জন্য তাঁরা দিবারাত্রি আল্লাহর দরবারে আবেদন করতেন। তাঁরা জানতেন, দুনিয়ার নাট্যশালা থেকে একদিন বিদায় গ্রহণ করতেই হবে, অতএব শাহাদাতের মৃত্যুর মত মর্যাদাবান মৃত্যুই জীবনের কাম্য হওয়া উচিত। এ জন্য তাঁরা শাসকের অন্যায় দেখলে সিংহের ন্যায় গর্জে উঠতেন। এ কারণে তাঁদের জীবনে নেমে আসতো নিষ্ঠুর রাজদন্ড। অত্যাচারের স্টীম রোলার হাসি মুখে বরণ করে তারা ইসলামের বিজয় কেতন উচ্চে তুলে ধরেছেন।

আব্বাসীয় শাসনামলে উমাইয়াদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। তাঁদের দুঃশাসনে দেশে এক চরম অরাজকতা দেখা দেয়। সাধারণ মানুষ আহাজারি করতে থাকে। এ অবস্থায় 'নাফছে জাকিয়াহ ও তার ভাই ইব্রাহিম' মদীনায় বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়ে দেন। ন্যায়পন্থী সকল আলিম তাঁদের বিদ্রোহের প্রতি সমর্থন জানায়। তদানীন্তনকালে দেশের জনগণ আলিম সমাজের অনুগত ছিল, বর্তমান যুগে জনগণ যেমন রাজনৈতিক নেতাদের অনুগত, সে যুগে অবস্থা ছিল এর বিপরীত। ইমাম মালিকও নাফছে জাকিয়াহ ও ইবরাহীমের আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করলেন। সরকারের উচ্ছিষ্ট ভোগী কিছু সংখ্যক লোক ইমাম মালিককে বললো– খলীফার প্রতি যখন বাইয়াত গ্রহণ করা হয়েছে তখন খালীফার অনুগত থাকা উচিত।

ইমাম মালিক বললেন– শক্তি প্রয়োগ পূর্বক বা ভয়ভীতি দেখিয়ে সমর্থন আদায় করা ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। বর্তমান ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী অবৈধভাবে ক্ষমতায় এসে জনগণের কাছ থেকে জোরপূর্বক বাইয়াত গ্রহণ করেছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জোর পূর্বক তালাক নিলে তা বৈধ হবে না।

খলীফা মানসুরের চাচাত ভাই জাফর ছিলেন মদীনার শাসনকর্তা। তিনি ইমাম মালিককে দরবারে ডেকে হুমকি দিলেন, যেন তিনি এই ফতোয়া না দেন। ইমাম

মালিক মদীনার শাসনকর্তা জাফরকে জানিয়ে দিলেন– আমার পক্ষে আপনার আদেশ পালন সম্ভব নয়। আমি দুনিয়ার কোন শক্তিকে ভয় করি না। আমি অন্যায়ের সাথে আপোষ করতে পারবো না। আমি মুসলমান। সত্য কথা বলতেই থাকবো যতক্ষণ আমার চোখের পলক পড়তে থাকে। সুতরাং একথা আমি উচ্চ কণ্ঠে বলতে থাকবো যে, কারো কাছ থেকে জোরপূর্বক তালাক গ্রহণ করা হলে তা বৈধ হবে না। তেমনি প্রলোভন, ভয়ভীতি ও জোরপূর্বক বাইয়াত নিলে তা ইসলামের দৃষ্টিতে হবে অবৈধ।

মদীনার গভর্ণর জাফর ইমামের কথা শুনে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে প্রহরীকে আদেশ দিলেন, ইমাম মালিককে গ্রেফতার করে কারাগারে প্রেরণ করতে। শুধু কারাগারে প্রেরণ করেই জাফর ক্ষান্ত হলো না, তিনি ইমাম মালিকের পিঠে সত্তরটি চাবুকের আঘাত হানার নির্দেশ দিলেন। জল্লাদ ইমামের দেহ থেকে পোষাক খুলে চাবুকের আঘাত হানতে থাকে। প্রতিটি আঘাতে ইমামের দেহ থেকে রক্ত ছিটকে বেরিয়ে আসে। একটি করে চাবুকের আঘাত ইমামের দেহে পড়তে থাকে আর তিনি উচ্চকণ্ঠে বলতে থাকেন– জোরপূর্বক তালাক নিলে তা জায়েজ হবে না। অনুরূপভাবে জোরপূর্বক বাইয়াত গ্রহণ করলেও তা বৈধ হবে না।

ইমামের দেহ আঘাতের পর আঘাতে রক্তাক্ত হতে থাকে, তবুও ইমাম সত্য বলা থেকে বিরত থাকেননি। 'অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা সর্বোৎকৃষ্ট জিহাদ' এই হাদীসের ওপরে ইমাম মালিক (রাহঃ) আজীবন প্রতিষ্ঠিত থেকেছেন। গভর্ণর জাফর হিংস্র আক্রোসে ইমামকে প্রকাশ্যে লাঞ্ছিত করার জন্য উটের পিঠে বসিয়ে মদীনা নগরীর জনতাকে ইমামের রক্তাক্ত শরীর প্রদর্শন করে। উট মদীনা নগরীতে ঘুরতে থাকে আর ইমাম উটের পিঠের ওপরে বসে দৃপ্তকণ্ঠে বলতে থাকেন– জোরপূর্বক তালাক যদি কারো কাছ থেকে গ্রহণ করা হয়, তাহলে তা কার্যকর হয় না। অনুরূপভাবে জোরপূর্বক বাইয়াত গ্রহণ করলেও তা বৈধ হবে না।

স্বৈরাচারী শাসক গোষ্ঠীর নির্মম অত্যাচারেও ইসলামী আন্দোলনের বিপ্লবী কণ্ঠস্বর ইমাম মালিকের কণ্ঠ স্তব্ধ করতে পারেনি। নির্মম লোমহর্ষক অত্যাচার শেষে ইমাম মালিক (রাহঃ)-কে মুক্তি দেয়া হয়। তিনি মুক্তি লাভ করে দেহের রক্ত পরিস্কার করে মসজিদে নববীতে নামাজ আদায় করেন। একবার বাদশাহ মানসুর মদীনার মসজিদে নববীতে উচ্চ কণ্ঠে কথা বলতে থাকেন। ইমাম মালিক বাদশাহকে লক্ষ্য করে বলেন– খবরদার! এখানে কণ্ঠউচ্চ করবেন না। কোন বেয়াদবি এখানে করবেন না। নিম্ন কণ্ঠে কথা বলুন।

এরপর নবীর সামনে কিভাবে কথা বলতে হবে, এ সম্পর্কে আল্লাহর আদেশ তিনি শুনিয়ে দেন। সূরা হুজুরাতের নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَرْفَعُوٓا۟ أَصْوَٰتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِىِّ وَلَا تَجْهَرُوا۟ لَهُۥ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ–

হে ঈমানদারগণ! নিজেদের কণ্ঠস্বর নবীর কণ্ঠস্বর অপেক্ষা উচ্চ করো না। নবীর সাথেও উচ্চকণ্ঠে কথা বলো না, যেমন তোমরা নিজেরা পরস্পরে করে থাকো।

সত্য ভাষণে আমার কণ্ঠ নির্ভীক

মুতাজিলা সম্প্রদায়ের শাসক মামুনুর রশিদ শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই দেশের জনগণের প্রতি আদেশ জারি করে, মুতাজিলা আকিদার প্রতি ইমান আনতে হবে। তিনি দেশের বিখ্যাত আলিমদের তাঁর দরবারে সমবেত করে তাঁদের প্রতি হুমকি ভীতি প্রদর্শন করলেন যেন তাঁরা তাঁর আকিদার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। বাদশাহ মামুনুর রশিদের হুমকীতে ভীত হয়ে মাত্র চারজন আলিম ব্যতীত সকল আলিমই বাদশাহের আকিদার প্রতি ঈমান আনে। দ্বিমত পোষণকারী চারজনের ওপরে শুরু হয় নির্যাতন। নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে দু'জন বাদশাহের সিদ্ধান্তের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন। একজন কঠোর নির্যাতনে শাহাদাতের অমিয় সঞ্জীবনী সুধা পান করে মহান আরশে আযিমের মালিক আল্লাহর দরবারে পৌঁছে যান। চারজনের একজন হলেন ইমাম হাম্বল (রাহঃ)। তাঁকে মুতাজিলা সম্প্রদায়ের আকিদা 'খালকে কোরআন' এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। ইমাম হাম্বল দৃঢ়কণ্ঠে অস্বীকার করেন। তিনি মুতাজিলা সম্প্রদায়ের দাবির প্রতি কোরআন-হাদীসের সমর্থন দেখতে চান। কিন্তু তারা তা দেখাতে ব্যর্থ হয়ে নির্যাতনের পথে এগিয়ে যায়।

বাগদাদের শাসনকর্তা ইসহাক ইবনে ইব্রাহিম বাদশাহ মামুনুর রশিদের আদেশে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাহঃ)-কে হাতকড়া-পায়ে বেড়ী লাগিয়ে বাদশাহের দরবারে পাঠিয়ে দেয়। ইমামকে বাদশাহর দরবারে উপস্থিত করার পূর্বেই বাদশাহ ইন্তেকাল করেন। শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন মুতাসিম বিল্লাহ। মামুনের মৃত্যুতে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের প্রতি শাসক গোষ্ঠীর নিষ্ঠুর আচরণের কোনে পরিবর্তন হলো না। বরং মুতাসিম বিল্লাহর শাসনামলে তা বৃদ্ধি পেল। বাদশাহ ইমামকে

দরবারে তলব করে মুতাজিলাদের ভ্রান্ত আকিদার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য লোভ-লালসা প্রদর্শন করলো। তিনি পার্থিব কোনো স্বার্থের বিনিময়ে আপোষ করতে রাজি হলেন না। এরপর বাদশাহের আদেশে ইমামের পায়ে চারটি ভারী ওজনের বেড়ী পড়িয়ে দিয়ে তাঁর দেহের চাবুকের আঘাত হানার নির্দেশ দেয়া হলো।

তখন ছিল রমযান মাস। ইমাম আহমেদ ইবনে হাম্বল (রাহঃ) রোযা পালন করছেন। রোযা অবস্থায় তাঁকে হাতকড়া ও পায়ে ওজনদার বেড়ি পরিয়ে সূর্যের প্রখর তাপে দাঁড় করিয়ে রাখা হতো। এই হৃদয় বিদারক অবস্থায় ইমামকে পুনরায় শাসক গোষ্ঠীর সাথে আপোষের প্রস্তাব দেয়া হলো। তিনি অম্লান বদনে জানিয়ে দিলেন– যে ধ্যান-ধারণা ইসলাম সমর্থন করে না, আমি তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করবো না।

রাজদরবারের এক উচ্ছিষ্ট ভোগী বিদ্রুপ করে ইমামকে লক্ষ্য করে বললো– তরবারীর নিচে গর্দান পড়লেই রাজি না হয়ে যাবে কোথায়!

শাসকগোষ্ঠীর উচ্ছিষ্ট ভোগীর কথা শুনে ইমাম আহত সিংহের ন্যায় গর্জন করে বললেন– যতক্ষণ পর্যন্ত আমার দেহে প্রাণের স্পন্দন থাকবে, ততক্ষণ আমি সত্যের বিপরীতে স্থান গ্রহণ করবো না।

ইমাম রোযা আছেন, এ অবস্থায় তাঁকে অগ্নিঝরা সূর্যের প্রখর তাপে হাত-পায়ে লোহার বেড়ী পরিয়ে দেহে চাবুকের নির্মম কষাঘাত হানা হচ্ছে। অসহনীয় অত্যাচারে ইমাম আহ্মদ ইবনে হাম্বল জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর জ্ঞানহীন দেহে তরবারীর খোচা দিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে, প্রকৃতই তিনি জ্ঞান হারিয়েছেন অথবা শাস্তির ভয়ে জ্ঞান হারানোর অভিনয় করছেন। তরবারীর সুতীক্ষ্ম অগ্রভাগ ইমামের দেহে আঁচড় কেটে দিচ্ছে, তিনি রক্তাক্ত হয়ে পড়ছেন। জ্ঞান ফিরে আসার সাথে সাথে পুনরায় দেহে পড়ছে চাবুকের আঘাত। কিন্তু তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। তাঁকে কারাগারে বন্দী করা হলো। কারাগারেও তাঁর হাত দুটো পিঠের দিকে নিয়ে বেঁধে রাখা হতো। দীর্ঘদিন এভাবে হাত পিঠের পেছনের দিকে বেঁধে রাখার কারণে তাঁর দুটো হাতেরই হাড় গ্রন্থি থেকে খুলে গিয়েছিল। লোমহর্ষক নির্যাতন চালিয়েও তাঁকে স্বমতে আনতে ব্যর্থ হয়ে বাদশাহ মুতাসিম বিল্লাহ অবশেষে ইমামকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন।

সত্যপথের পথিকগণ হক পথে অবিচল থেকে অত্যাচার সহ্য করে সময়ের ব্যবধানে এক সময় আপন প্রভায় গোটা জাতির সামনে উজ্জ্বল হয়ে উঠেন। বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের নেতা অধ্যাপক গোলাম আযমের ক্ষেত্রেও সত্যপন্থীরা দেখতে পেলো ইমাম আহ্মদ ইবনে হাম্বলের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি

ঘটতে। অধ্যাপক গোলাম আযমকে দ্বীনি আন্দোলন করার অপরাধে দেশ বিভাগের পূর্বেও কয়েকবার কারারুদ্ধ করা হয়। ১৯৭২ সনে তাঁর জন্মগত অধিকার নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়। এ অবস্থায় দীর্ঘ বাইশ বছর অতিবাহিত হয়। আল কোরআনের দাওয়াত নিয়ে তাঁকে মজলুম মানুষের সামনে যেতে দেয়া হয়নি।

মাতৃভূমিতে মুক্ত আলো-বাতাসে তাঁর চলা-ফেরার স্বাধীনাত হরণ করা হয়েছে। এভাবে তাঁকে মানসিক অত্যাচারে জর্জরিত করা হলো। তিনি বাতিল শক্তির কাছে মাথানত করলেন না। পুনরায় তাঁকে কারারুদ্ধ করা হলো। ইসলাম বিরোধী শক্তি তাঁর ফাঁসি দাবি করতে থাকে। কোরআনের সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের কর্মীরা তাঁদের নেতাকে হেফাজত করার জন্য বাতিলের রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করে, জান-মাল কোরাবানী দিয়ে ময়দানে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে। সত্যের বিজয় হলো। দীর্ঘ ১৬ মাস কারাগারে আবদ্ধ থাকার পরে সুপ্রিম কোর্টের রায় ঘোষিত হলো। তিনি নাগরিকত্বসহ মুক্ত আলো-বাতাসে ফিরে এলেন। এভাবেই ইতিহাসের প্রতিটি বাঁকে মিথ্যা পরাজিত হয়েছে আর মহাসত্য আপন প্রভায় আলো বিকিরণ করেছে।

বীর মুজাহিদ গাজী সালাউদ্দিন আইয়ুবী

খৃষ্টান বিশ্ব পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাদের বিকৃত আদর্শ প্রচার ও নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে মানব কল্যাণমূলক সংস্থা স্থাপন করেছে। সাধারণ মানুষের সম্মুখে তারা নিজেদেরকে 'মানবদরদী' হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু তাদের প্রকৃত হিংস্র রূপ মানব কল্যাণমূলক কর্মের আড়ালে থাকে বিধায় অধিকাংশ মানুষ তাদের আচরণে বিভ্রান্ত হয়। শুধু মানুষের প্রতিই পশ্চিমা বিশ্বের এই দরদী আচরণ নয়- তারা পশু-প্রাণীর প্রতিও অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। খৃষ্টান জগতে কুকুর, বিড়াল, বানর ইত্যাদি পশুর সাথে বেয়াদবি (?) করলে কোর্টে মামলা গ্রহণ করা হয় এবং তার শাস্তি বিধানও করা হয়। একবার এক সাগরের পানি ঠান্ডায় বরফে পরিণত হলে দু'টি তিমি মাছ বরফের চাঁই-এ বন্দী হয়ে মৃত প্রায় হয়েছিল। আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স তড়িঘড়ি করে বরফ কাটা জাহাজ পাঠিয়ে সেই তিমি দুটিকে উদ্ধার করে সাগরে ছেড়ে দিয়ে দুনিয়ার কাছে বাহবা কুড়ালো, প্রাণীর প্রতি খৃষ্টান জগতের কত মায়া!

তাদের কাছে কুকুর-বিড়ালের যে মূল্য আছে, পৃথিবীর মুসলমানদের জীবনের মূল্য তাদের কাছে নেই। বসনিয়া হার্জেগোভিনা, ফিলিস্তিন, আফগানিস্থান, ইরাক,

কাশ্মির, আলজেরিয়াসহ পৃথিবীর অগণিত মুসলমানদের রক্তে স্নান করছে খৃষ্টান জগত। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গর্ভবতী মুসলিম নারীর গর্ভের সন্তান বের করে হত্যা করছে একশ্রেণীর খৃষ্টান নরপশুরা। অগণিত মুসলিম নারীর করুণ আর্তনাদ পদদলিত করে ধর্ষণ করা হচ্ছে। মাতা-পিতার সম্মুখে যুবতী মেয়ের স্তন কেটে পিতার মুখের ওপরে ধরছে ইয়াহুদী-খৃষ্টান-মুশরিকের দল। মুসলমানদের মাথার মগজ বের করে তা শিকারী কুকুরদেরকে খেতে দিচ্ছে। নিষ্পাপ মুসলিম শিশুকে বেয়নটের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করছে। তাদের কাছে ন্যায়-নীতির কোন সংজ্ঞা নেই। ওরা যা করবে তা-ই ন্যায়-নীতি আর মুসলমানরা আত্মরক্ষার্থে কিছু করলে তা হবে সন্ত্রাসবাদ। এই লজ্জাজনক ঘৃণিত নিষ্ঠুর আচরণ এরা বর্তমানেই শুধু প্রকাশ করছে না, এদের অতীত ইতিহাসও কালিমা লিপ্ত-নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা ও হৃদয়হীনতায় পরিপূর্ণ। দরিদ্র মানুষকে সাহায্য করার নামে খৃষ্টান এনজিও সমূহের তৎপরতার আড়ালে রয়েছে কুটিলতা।

ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মুশরিকদের কাছে একজন মানুষ- যদি তিনি শুধুমাত্র নামে মুসলিম পদবাচ্যে পরিচিত হন, তৎক্ষণাত তিনি ন্যূনতম মানবাধিকার থেকেও বঞ্চিত হন। নিরাপরাধ মুসলিমদেরকে সন্ত্রাসী আখ্যায় আখ্যায়িত করে বন্দীখানায় হাত-পা লৌহ শৃংখলে বেঁধে মাথা থেকে বুক পর্যন্ত কালো কাপড়ে আবৃত করে কষ্টকর ভঙ্গিতে বসিয়ে রাখা হচ্ছে। মুসলমানদের জন্য মানবাধিকারের কোনো ধারা প্রযোজ্য নয়। ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তিমুরে গুটি কয়েক খৃষ্টান স্বাধীন আবাস ভূমির দাবি করলো, খৃষ্ট জগৎ তৎক্ষণাত সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিশাল মুসলিম দেশকে বিভক্ত করে খৃষ্টানদের জন্য পৃথক আবাস ভূমির ব্যবস্থা করে দিল। পক্ষান্তরে নিজ মাতৃভূমি থেকে মুসলমানদেরকে উৎখাত করা হচ্ছে, আর মুসলমানরা যখন নিজেদের অধিকার দাবি করছে তখনই তাদেরকে সন্ত্রাসী আখ্যায় আখ্যায়িত করে নিষ্ঠুর নির্যাতন চালানো হচ্ছে।

এই পৃথিবীতে বর্তমান সময় পর্যন্ত যেসব অমানবিক নিষ্ঠুর ঘটনা ঘটেছে, তা ঘটিয়েছে ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মুশরিক শক্তি। কোন দেশ আণবিক শক্তির শক্তির অধিকারী হচ্ছে, কোন দেশ পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ করছে, তা নিয়ে খৃষ্টানদের মোড়ল বিশ্ব সন্ত্রাসী আমেরিকা হৈচৈ করে থাকে। অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, পৃথিবীতে বহু দেশই আণবিক শক্তির অধিকারী হলেও বিশ্বে একটি মাত্র দেশই এ পর্যন্ত আণবিক বোমা বর্ষণ করে লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষ নির্বিচারে হত্যা করেছে। সেই দেশটি হলো খৃষ্ট জগতের মোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তারাই জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে অগণিত বনী আদমকে

পৃথিবীতে নিষ্ঠুরভাবে বিদায় করে দিয়েছে। সারা বিশ্বে ইয়াহুদী-খৃষ্ট শক্তির মানবতা বিরোধী অপরাধের জঘন্য রেকর্ড রয়েছে। অথচ তারাই গণতন্ত্র, শান্তি আর মানবাধিকারের পক্ষে যখন উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা করে, তখন তা বেসুরো শোনায় বৈকি?

এই ইয়াহুদী-খৃষ্ট ও মুশরিক শক্তির অতীত ও বর্তমান ইতিহাস অত্যন্ত নৃসংশতার ইতিহাস। বর্তমানে বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, আলজেরিয়া, কাশ্মির, চেচনিয়া ও ইরাকে তারা যে নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করছে, জেরুজালেমে করা তাদের সেই একই আচরণের পুনরাবৃত্তি করছে মাত্র। স্পেনেও তারা একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছিল। মুসলিম রাষ্ট্র জেরুজালেম নগরীকে চারদিক থেকে বেষ্টন করে রয়েছে হিংস্র হায়েনা খৃষ্ট-বাহিনী। দিনটি ছিল ১০৯৯ সনের ৭ ই জুন। দিনের মধ্য ভাগে খৃষ্টান বাহিনী জেরুজালেম নগরীর প্রাচিরের সাথে একটি ঝুলন্ত সেতু বসিয়ে দিল। এই সেতু ব্যবহার করে নগরীতে প্রবেশ সহজ হয়ে উঠলো। মুসলমানরা যখন বুঝলো তাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছে তখন তাঁরা খৃষ্ট-বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করলো। কিন্তু খৃষ্টশক্তি পৃথিবীতে আত্মসমর্পণকারীদের জন্য প্রচলিত আইন-কানুনের প্রতি তোয়াক্কা না করে মজলুম মুসলমানদের সাথে শুরু করলো ইতিহাসের জঘন্যতম নিষ্ঠুর বর্বর আচরণ। সেদিন তাদের নির্মমতা থেকে তাদেরই দোসর ইয়াহুদী জনগোষ্ঠীও মুক্ত থাকেনি।

খৃষ্টানরা ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় ছুটে গেল মুসলমানদের বাড়ি-ঘরে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, মসজিদে, ক্ষেত-খামারে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে। সর্বত্রই মুসলমানদেরকে পশুর মতো হত্যা করা হলো। মুসলিম নারী-পুরুষ, শিশু তথা আবাল বৃদ্ধ বনিতা কেউ রেহায় পায়নি খৃষ্টান কাপালিক তথাকথিত ধর্ম যোদ্ধাদের নিষ্ঠুরতা থেকে। মুসলমানদের ক্ষেত-খামারের ফসল জ্বালিয়ে দেয়া হলো, অগণিত বাড়ি ঘর ধ্বংস করা হলো, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অগ্নি সংযোগ করা হলো, মসজিদুল আকসাসহ গোটা জেরুজালেমের মসজিদসমূহ নিশ্চিহ্ন করা হলো। দুপুর থেকে শুরু করে সারা রাত পর্যন্ত চললো এই ধ্বংস আর মুসলিম হত্যাযজ্ঞ। ভোরের দিকে একদল খৃষ্টান আক্রমণ করলো মসজিদুল আকসায়। সেখানে অবস্থানরত মুসলিম নারী শিশু যুবক বৃদ্ধদের হত্যা করলো অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে, এরপরে মসজিদটিকে ধ্বংস স্তুপে পরিণত করলো। ইতিহাস সাক্ষী, একজন মুসলমানের চিহ্নও তারা জেরুজালেমে অবশিষ্ট রাখেনি।

প্রভাতে যখন খৃষ্টান অধিনায়কগণ নগরীতে প্রবেশ করলো, তখন লাশের স্তুপ অতিক্রম করে পথ চলা কষ্টকর হচ্ছিল। লাশ সরিয়ে যখন তারা জেরুজালেম নগরী

পরিদর্শন করছিল, তখন তাদের পায়ের নিচের অংশ ছিল মুসলিম নারী পুরুষ তথা আবাল বৃদ্ধ বনিতাদের তপ্ত রক্তে রঞ্জিত।

জেরুজালেম নগরীতে অবস্থানরত ইয়াহুদীরা জনগোষ্ঠী খৃষ্টানদের পাশবিকতা থেকে রেহায় পায়নি। মুসলমানদের প্রতি সমর্থন করার অজুহাতে তাদেরকেও নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। তাদের উপাসানালয়ে অগ্নি সংযোগ করা হয়। গোটা জেরুজালেম নগরীতে হত্যা করার মত যখন একজন মুসলমানও অবশিষ্ট রইল না, তখন জেরুজালেম নগরীর রাজপথে খৃষ্টানপাদ্রীদের নেতৃত্বে তথাকথিত ধর্মীয় মিছিল মুসলমানদের রক্তসাগর পেরিয়ে এগিয়ে গেল হোলি সেপালকার গির্জায় গডকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য। এই দিনটিকে আজও কোন কোন খৃষ্টানরা পালন করে স্রুকদটভপ্র থধশধধভথ চটহম্ব থ্যাংস গিভিং ডে হিসেবে।

একদিকে ইতিহাসের পৃষ্ঠা খৃষ্টান জগত করলো কলিমা লিপ্ত। অপরদিকে ইতিহাসের আরেক পৃষ্ঠা পূর্ণিমার শশীর ন্যায় চির দেদিপ্যমান। যিনি এই দেদিপ্যমান উজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করলেন তাঁর নাম হযরত সালাউদ্দিন আইয়ুবী (রাহঃ)। বর্তমান ইরাকের কুর্দীস্তানের মুসলমানরা সালাউদ্দিন আইয়ুবীর বংশধর। মাত্র ৮৮ বছরের ব্যবধান। ১১৮৭ সনের ২০শে সেপ্টেম্বর। খৃষ্টান শাসিত জেরুজালেম নগরীর সম্মুখে সেনা ছাউনী স্থাপন করেছেন মুসলমানদের সিপাহসালার অকুতোভয় মুসলিম বীর হযরত সালাহ উদ্দিন আইয়ুবী (রাহঃ)। মুসলমানদের সেনা ছাউনীতে বিজয়ের আনন্দ হিল্লোলে চাঁদ-তারা খচিত ইসলামের বিজয় কেতন স্বগৌরবে উড়ছে। আর খৃষ্টানদের তথাকথিত ধর্মীয় প্রতীক ক্রস চিহ্নিত পতাকা পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে। হযরত সালাউদ্দিন আইয়ুবীর (রাহঃ) জেরুজালেম নগরীর উত্তর, উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে তীব্র আক্রমণ করছেন। আক্রমণের মুখে খৃষ্টানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো। তাদের প্রতিরক্ষা বুহ্য চূর্ণ বিচুর্ণ হয়ে গেল। আক্রমণের মুখে বাধ্য হয়ে খৃষ্টশক্তি সালাউদ্দিন আইয়ুবীর কাছে আত্মসমর্পনের প্রস্তাব পাঠালো। আত্মসমর্পণের শর্তাদি আলোচনার জন্য খৃষ্টদূত বানিয়ান স্বয়ং উপস্থিত হলো সিপাহসালার সালাউদ্দিন আইয়ুবীর তাঁবুতে। তিনি স্পষ্ট কণ্ঠে জানিয়ে দিলেন– আমি প্রতিজ্ঞা করে ছিলাম তরবারী দিয়েই জেরুজালেম মুক্ত করবো। সুতরাং কোন শর্ত নয়, নিঃশর্ত আত্মসর্মপন করতে হবে। বানিয়ান! আজ একটু চোখ বন্ধ করে ৮৮ বছর পূর্বের জেরুজালেমে ফিরে যাও। দেখতে পাও কি? সেদিন তোমরা কি নিষ্ঠুর-নির্মম আচরণ করেছিলে?

নিরুত্তর খৃষ্টদুত বানিয়ান। অবশেষে নিঃশর্ত আত্মসর্মপনে বাধ্য হলো খৃষ্ট অপশক্তি।

১১৮৭ ইসায়ী সনের ২০ শে অক্টোবর মুসলমানরা জেরুজালেম ফিরে পেল। সালাউদ্দিন যেদিন জেরুজালেমে সেনাবাহিনী সমভিব্যহারে প্রবেশ করলেন সেদিন ছিল পবিত্র শবে মিরাজ- শুক্রবার। জেরুজালেমের খৃষ্টানরা চরমভাবে আতঙ্কিত। তাদের ধারণা, ৮৮ বছর পূর্বে তারা যে ঘটনা ঘটিয়ে ছিল বিজয়ী মুসলমানরাও আজ সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটাবে। বিজয়ের আনন্দে প্রতিশোধ গ্রহণে মুসলমানরা উন্মাদ হয়ে খৃষ্টানদের রক্তে স্নান করবে। ধর্ষিতা হবে স্ত্রী-কন্যা। লুন্ঠন করবে যাবতীয় সম্পদ। মুসলিম বীর সালাহ্ উদ্দিন খৃষ্টানদের লাশের পাহাড় আর রক্তের নদী পেরিয়ে জেরুজালেম নগরী পরিদর্শন করবে। তারা যেমন করেছিল ৮৮ বছর পূর্বে। আত্মসমর্পনের সকল শর্ত নিষ্ঠুর পায়ে পদদলিত করে মুসলমানরা নির্মম হত্যাযজ্ঞে উন্মাদ হয়ে উঠবে- এ আশঙ্কায় জেরুজালেমের খৃষ্টান শক্তি মানসিকভাবে হতাশা গ্রস্থ।

কিন্তু না! ইসলাম কোন অমানবিক আচরণ মুসলমানদের শিক্ষা দেয়নি। গাজী সালাউদ্দিন আর তাঁর অধীনস্থ মুসলিম বাহিনী আর কোরআনের রণ তুর্য। ইসলামী আদর্শের মূর্ত প্রতীক। ইসলাম তাঁদেরকে বিজিতদের প্রতি অত্যন্ত সম্মানজনক আচরণ করতে শিক্ষা দিয়েছে। বিজিতদের সম্পদের হানি নয়- হেফাজতের শিক্ষা দিয়েছে ইসলাম। মুসলমানদেরকে বন্দী নারীর ইজ্জতের অতন্দ্র প্রহরী বানিয়েছে ইসলাম। জেনারেল সালাহউদ্দিন আইয়ুবী তাঁর সুশিক্ষিত সেনাবাহিনীসহ খৃষ্টান অধ্যুষিত জেরুজালেম নগরীর রাজপথ বেয়ে বীর দর্পে সম্মুখ পানে এগিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু চোখে মুখে নেই কোন প্রতিশোধের আগুন। দৃষ্টি তাঁদের আল কোরআনের নির্দেশে অবনত।

কি জানি, অকস্মাৎ যদি চোখ কোন খৃষ্টান নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়! হৃদয়ে যদি সম্পদের মোহ জাগে! তাহলে আখিরাতের ময়দানে আল্লাহর দরবারে কি জবাব দেবেন! আল্লাহর রাসূলকে সেদিন কোন লজ্জায় এ কলঙ্কিত চেহারা দেখাবেন!

ইসলামী আদর্শের বাস্তব নমুনা গাজী সালাহউদ্দিন ও তাঁর সুশিক্ষিত মুজাহিদ বাহিনী আল্লাহর ভয়ে ভীতাবস্থায় জেরুজালেম নগরী পরিদর্শন করলেন। তিনি যখন তার বীর সেনাবাহিনী নিয়ে জেরুজালেমের রাজপথ অতিক্রম করছিলেন, তখন তাঁদের স্মৃতির আকাশে পুর্নীমার পুর্ণ শশীর মতই জ্বলজ্বল করছিল মাত্র ৮৮ বছর পূর্বের মর্মান্তিক দৃশ্য। খৃষ্টানদের অস্ত্রের আঘাতে এই পথেই ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েছিল তাঁদের মা-বোন, পিতা আর ভাইয়ের অগণিত লাশ। এই শহরের অলিগলিতে তাদেরই পুর্বসূরীদের শহীদী তপ্ত রক্তের প্লাবন প্রবাহিত হয়েছিল।

আজও জেরুজালেম নগরীর দেয়ালে কান পাতলে মুসলমানদের নিষ্করুণ আর্তনাদ আর বাঁচার আকুতি শোনা যাবে। এসব করুণ স্মৃতি মুসলমানদের চোখ ক্ষণিকের জন্য অশ্রু সজল করে দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু কোন প্রতিশোধের সর্বগ্রাসী অনল তাঁদের হৃদয়ে প্রজ্জলিত হয়নি।

সালাউদ্দিন খৃষ্টানদের ধন-সম্পদ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বাড়ি-ঘর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, গির্জাসমূহে মুসলিম সৈন্য দ্বারা প্রহরার ব্যবস্থা করলেন। খৃষ্টান নারীদের নিরাপত্তা দিলেন এবং যুদ্ধবন্দীদের নামমাত্র অর্থের বিনিময়ে মুক্তি দিলেন। যেসব বন্দী অর্থের যোগাড় করতে পারলো না তাদেরকে এমনিতেই মুক্তি দিলেন। যুদ্ধে যেসব খৃষ্টান মহিলা ও শিশুদের স্বামী বা পিতা নিহত হয়েছিল, তারা যখন আশ্রয়হীন অবস্থায় মুসলিম বীর সালাহউদ্দিনের সম্মুখে আশ্রয় লাভের জন্য উপস্থিত হলো, তখন বিধবা মহিলা ও এতিম শিশুদের দেখে গাজী সালাহউদ্দিন অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি। তিনি এতিম শিশু ও বিধবা মহিলাদের প্রতিপালন করার ব্যবস্থা করলেন।

মুসলিম চরিত্রের এটাই বৈশিষ্ট্য। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই শিক্ষাই দিয়েছেন তাঁর অনুসারীদেরকে। বর্তমানে ইয়াহুদী-খৃষ্ট ও মুশরিক শক্তি ঐক্যবদ্ধভাবে গোটা বিশ্বব্যাপী নিষ্ঠুরভাবে মুসলমানদের রক্ত নিয়ে হোলি খেলছে, এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন গাজী সালাহ উদ্দিনের অনুরূপ মর্দে মুজাহিদের।

বর্তমানে ইয়াহুদী-খৃষ্টান আর মুশরিকদের মধ্যে নিবিড় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখে কেউ কেউ বিভ্রান্ত হতে পারে যে, তারা পরস্পরে বন্ধু। কিন্তু কোরআনের ভাষায় তাদের ঘনিষ্ঠতার প্রকৃত রূপ হলো–

بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ-تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَّقُلُوبُهُمْ شَتَّى-

পারস্পরিক বিরোধিতায় এরা বড়ই কঠিন ও অনমনীয়। তুমি এদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করো, কিন্তু তাদের পরস্পরের হৃদয়ে রয়েছে শত যোজন ব্যবধান। (সূরা হাশর-১৪)

ইয়াহুদী ও মুশরিকরা পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার লক্ষ্যে খৃষ্টান জাতিকে দাবার গুটির মত ব্যবহার করছে। ইয়াহুদী সেই ইতিহাস বিস্মৃত হয়নি– একদিন খৃষ্টানরা তাদেরকে জেরুজালেমে তাদের ধর্মস্থানে বন্দী করে জ্যান্ত পুড়িয়ে হত্যা করেছিল। হিটলারও ইয়াহুদীদের ওপরে ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল। এসব ঘটনার প্রতিশোধ গ্রহনে উদ্বুদ্ধ হয়েই প্রতিশোধ

পরায়ণ অভিশপ্ত ইয়াহুদী জাতি খৃষ্টানদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি করে বিপুল অস্ত্রের ভান্ডার গড়ে তুলেছে। সারা বিশ্বের বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নিজেরা কুক্ষিগত করে বিশ্ব অর্থনীতি তারা নিয়ন্ত্রিত করছে। সময় ও সুযোগ এলেই ইয়াহুদীরা যে খৃষ্টানদের ওপরে মরণ আঘাত হানবে– বর্তমানে তার আলামত অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মিথ্যার কাছে কভু নত নাহি শির

তাতারী শাসনকর্তা কাজান ইরান বিজয় করার পর তার মধ্যে দেশ জয়ের নেশা জেগে উঠলো। একের পর এক দেশ জয় করে তিনি দামেশকের দিকে ধাবিত হলেন। দামেশকের শাসনকর্তা পরাজিত হয়ে মিশরে পলায়ন করলো। সেখানের জনসাধারণ ইমাম ইবনে তাইমিয়ার কাছে উপস্থিত হলেন। ইমামকে তাঁরা অনুরোধ করলো তিনি যেন কাজানকে অনুরোধ করেন– তাঁর বাহিনী সাধারণ মানুষের প্রতি যেন অত্যাচার না করে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া একটি প্রতিনিধিদল গঠন করে কাজানের কাছে উপস্থিত হলেন।

ইমাম দোভাষীর সহযোগিতায় কাজানকে বললেন– আপনি নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করেন। আমি জানতে পেরেছি, আপনি ইমাম-মুয়াজ্জিন, কাজী সাথে নিয়ে এনেছেন। আপনি কেন অন্যায়ভাবে আমাদের শহর অবরোধ করেছেন? আপনার পিতা-পিতামহ অমুসলিম ছিলেন। তাঁরা আমাদের সাথে চুক্তি করে কখনো চুক্তির বিপরীত কাজ করেননি। অথচ আপনি নিজেকে মুসলিম হিসেবে দাবি করেও আমাদের ওপরে জুলুম করতে এসেছেন। আপনি কথা ও কাজে কোনো সামঞ্জস্য নেই।

ইমামের কথাগুলো যেন তাতারী শাসনকর্তা কাজানের দেহে আগুন জ্বালিয়ে দিল। তিনি ক্রোধে উন্মাদ হয়ে উঠলেন। ইমামে সাথে কাজান উচ্চকণ্ঠে বিতর্ক শুরু করলেন। বিতর্ক শেষে কাজানের নির্দেশে ইমামের প্রতিনিধিদের সম্মানে ভোজ সভার আয়োজন করা হলো। প্রতিনিধি দলের সদস্যগণ খাদ্য গ্রহণ করছেন। কিন্তু ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহঃ) আহার থেকে বিরত থাকলেন। তাতারী শাসনকর্তা কাজান অবাক কণ্ঠে জানতে চাইলেন– আপনি খাবার গ্রহণ করছেন না যে?

মর্দে মুজাহিদ নির্ভীক কণ্ঠে বললেন– কাজান! এই খাদ্য আমি কিভাবে গ্রহণ করতে পারি? জনগণের পশু সম্পদ লুট করে এ খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাধারণ

মানুষের বৃক্ষ শক্তি প্রয়োগ পূর্বক কর্তন করে তা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে এই খাদ্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

দুর্ধর্ষ তাতারী শাসনকর্তা কাজানের সম্মুখে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহঃ) হক কথা বলা থেকে বিরত থাকেননি। একজন মানুষের হৃদয়ে যখন একমাত্র আল্লাহর ভয় ব্যতীত অন্য কারো ভয় থাকে না, তখন সারা পৃথিবীর বাতিল শক্তি সময়ের ব্যবধানে সত্য পথের মর্দে মুজাহিদদের সম্মুখে মাথানত করতে বাধ্য হয়। কাজান তাঁর গর্বিত শির অবনত করে ইমামের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে মন্তব্য করলেন- এমন কারো অস্তিত্ব পৃথিবীতে ছিল বলে আমি জানতাম না, যিনি আমার সম্মুখে আমার কাজের সমালোচনা করবেন এবং তাঁর কথায় আমি প্রভাবান্বিত হবো।

কথা শেষ করে কাজান আগত প্রতিনিধি দলের কাছে জানতে চাইলেন- আপনাদের সাথে আগত এই ব্যক্তির পরিচয় কি, যিনি আমার সম্মুখে সত্য কথা নির্ভীক কণ্ঠে উচ্চারণ করছেন?

তাতারী শাসক কাজানকে ইমাম ইবনে তাইমিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হলে তিনি ইমামকে তাঁর জন্য দোয়া করার অনুরোধ জানান। ইমাম আল্লাহর দরবারে দোয়া করছেন- হে আল্লাহ! কাজান যদি আপনার যমীনে আপনার দ্বীন কায়েমের উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর তরবারী কোষমুক্ত করে থাকেন, তাহলে আপনি তাঁকে সাহায্য করুন, তাঁর প্রতি রহমত করুন। আর যদি সে শুধু মাত্র রাজ্যের পরিধি, সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে তরবারী কোষমুক্ত করে থাকেন তাহলে তাঁকে পরাজিত ও লজ্জিত করুন। তাঁর উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহঃ) হাত তুলে যখন আল্লাহর কাছে দোয়া করছিলেন তখন কাজানসহ দরবারে উপস্থিত সকলেই দোয়া কবুলের জন্য 'আমীন আমীন' বলছিলেন। ইমামকে অসংখ্য বার অন্যায়ভাবে কারারুদ্ধ করা হয়। তাঁর ওপরে কঠোর নির্যাতন চালানো হয়, তবুও তিনি বাতিল শক্তির সামনে ক্ষণিকের জন্যও মাথানত করেননি। আদালতে আখিরাতে আযাবের ভয়ে তিনি দুনিয়ার আযাবকে হাসিমুখে গ্রহণ করেন। ইসলামী বিধানের বিপরীত কিছু তাঁর চোখে পড়লে সাথে সাথে তিনি প্রতিবাদ করতেন। কোন জালিমের কঠোর জুলুমকে তিনি তোয়াক্কা করতেন না। শাহাদাত লাভই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। শাসক গোষ্ঠীর রক্ত চক্ষু তিনি বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য করতেন না। শত প্রলোভন ও হুমকির মুখেও তিনি ইসলামী আন্দোলনের আপোষহীন নেতার মত দ্বীনে হকের ওপরে প্রতিষ্ঠিত থেকেছেন।

কারাগারে আবদ্ধ থাকাকালে কারা কর্মকর্তা ইমামকে বললেন– প্রধানমন্ত্রী জানতে চেয়েছেন, আপনার কি কারাগার থেকে মুক্তি লাভের ইচ্ছে নেই? এভাবে আর কতদিন কারাগারে থাকবেন? দীর্ঘ কারাবাসের পরেও কি আপনি আপনার সিদ্ধান্তে কোন পরিবর্তন আনবেন না?

আল্লাহর ব্যঘ্র ইমাম ইবনে তাইমিয়া নির্ভীক কণ্ঠে জানালেন– আপনি প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়ে দেবেন, কোন অপরাধে আমি কারাবদ্ধ রয়েছি, তা আমার জানা নেই। আমি আমার ব্যক্তিগত বিষয়ে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখি। কিন্তু ইসলাম যে সিদ্ধান্ত দিয়েছে, তা পরিবর্তন করার ক্ষমতা কোনো মানুষের নেই। সুতরাং কোরআন-সুন্নাহ্র যে সিদ্ধান্তের কথা আমি জানিয়েছি, তা আমি পরিবর্তন করবো না।

পরদিন কয়েকজন সরকারী কর্মকর্তা লিখিত ফতোয়া ইমামের সম্মুখে পেশ করে তাঁকে দস্তখত দেয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়ে বললো– আপনি দস্তখত দিন, আপনার কারা জীবনের অবসান ঘটবে।

সরকারী কর্তকর্তাবৃন্দ নানাভাবে ইমামের প্রতি চাপ সৃষ্টি করলো। তিনি ঘৃণাভরে সরকারী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে জানিয়ে দিলেন–তোমরা মিসরের প্রধানমন্ত্রীকে জানিযে দাও! তার শাস্তির ভয়ে কোরআন-হাদীসের বিপরীত কোনো ফতোয়া দেবো না।

আগত কর্মকর্তাগণ তবুও দস্তখত দেয়ার জন্য ইমামকে পীড়াপীড়ি করতে থাকে। অবশেষে ইমাম মিশর সরকারের কর্মকর্তাকে ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে বলেন– কোন অর্থহীন প্রলাপ আর অন্যায় আবদার নিয়ে আমার সামনে আসবে না। এখান থেকে বিদায় নাও এবং নিজের কাজে মন দাও। আমি তোমাদের কাছে আমার মুক্তির জন্য আবেদন করিনি যে, আমাকে তোমরা জেল থেকে মুক্তি দাও। আমি কোনক্রমেই তোমাদের অন্যায় দাবির কাছে মাথানত করবো না। এ জন্য যদি তোমরা আমাকে হত্যা করো তাহলে আমি শাহাদাতের উচ্চ মর্যাদা পাবো। আখিরাতের ময়দানে আল্লাহ্র কাছে আমি প্রতিদান পাবো। আমার মৃত্যুর পরে সারা পৃথিবীর মানুষ জানতে পারবে, আমি কোরআন-হাদীসের বিধানের বিপরীত কথা বলিনি বিধায় আমাকে ফাঁসি দেয়া হয়েছে। যদি আমার সারা জীবন কারাগারে কেটে যায়– যাক, আমি এই অবস্থাকে আল্লাহ্র নেয়ামত বলে গণ্য করবো।

কারাগারের অন্ধকার জীবনকে স্বাগত জানিয়ে আর মৃত্যুকে দু'পায়ে দলে জিহাদের ময়দানে অগ্রসর হলেই মিথ্যার দুর্বল আবরণ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আর তখনই কেবল সত্যের প্রদীপ্ত উজ্জ্বল আলোক শিখা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকলকে ইমাম তাকীউদ্দীন ইবনে তাইমিয়া (রাহঃ)-এর অনুরূপ চরিত্র গঠনের তাওফিক দিন।

করিনা পরোয়া সংখ্যাধিক্যের

আহমাদ শাহ্ দুররানী ১৭৫৯ থেকে ১৭৭২ সনের ২৩শে অক্টোবর পর্যন্ত আফগানিস্তানের কান্দাহারের শাসক ছিলেন। তিনি ছিলেন আল্লাহভীরু শাসক। মুসলমানদের বিপদের সংবাদ তাঁর কর্ণকুহরে পৌঁছলে তিনি স্থির থাকতে পারতেন না। তদানীন্তন কালে ভারতীয় মুসলমানদের অবস্থা ছিল বড়ই করুণ। ইংরেজ বেনিয়ারা ব্যবসায়ীর ছদ্মাবরণে এদেশে আগমন করে, বর্ণহিন্দুদের সহযোগিতায় একশ্রেণীর মুসলিম নামধারী মুনাফিকদের প্রলোভন দিয়ে ভারতে মুসলিম শাসনের পতন ঘটায়। নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে নিষ্ঠুর পলাশীর আম্রকাননে হত্যা করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ভারত দখল করে। তারা বর্ণহিন্দুদের সহযোগিতায় মুসলমানদের ওপরে নিষ্ঠুর নির্যাতন চালায়। শাসক জাতি মুসলমানরা শাসিত জাতিতে পরিণত হলে তাঁদেরকে করুণার পাত্রে পরিণত করা হয়। তাদের ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে তা বর্ণহিন্দুদের দেয়া হয়। ইংরেজ ও বর্ণহিন্দুদের নিষ্পেষণে মুসলিম জনগোষ্ঠী নিজ দেশে আশ্রিত হিসেবে চিহ্নিত হয়। ইসলামকে উৎখাত করার যাবতীয় ব্যবস্থা অত্যন্ত সুচারুরূপে গ্রহণ করা হয়। রাষ্ট্র ও সমাজ থেকে ইসলামের নীতিমালা গুটিয়ে মসজিদের চার দেয়ালে আবদ্ধ করা হয়। এ ব্যাপারে ইংরেজ কাফেরদের উচ্ছিষ্ট ভোগী একশ্রেণীর উলামা তাদেরকে সহযোগিতা করে এবং তারা ইসলামের খণ্ডিত রূপ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। একশ্রেণীর উচ্ছিষ্ট ভোগী ও আলিম নামধারী নাদানদের লক্ষ্য করেই পরবর্তী কালে মুসলিম দরদী কবি ডক্টর আল্লামা ইকবাল দুঃখ করে বলেছিলেন–

মুল্লা কো দে গ্যায়ি মস্‌জিদ মেঁ ছেজ্‌দে কি ইযাযাত
নাদান সামাঝ্‌তা হ্যায় হিঁন্দুস্থান মেঁ ইসলাম আজাদ।

মুল্লাদেরকে মসজিদে নামাজ আদায় করার অনুমতি ইংরেজরা দিয়েছে, আর এটা দেখে আহাম্মকেরা ধারণা করে নিয়েছে যে, ভারতে ইসলামের স্বাধীনতা রয়েছে।

ইংরেজ ও বর্ণহিন্দুদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ মুসলমানরা এই করুণ অবস্থা থেকে যখন আত্মরক্ষায় ব্যস্ত, ঠিক তখনই মুসলমানদের ওপরে সন্ত্রাসী শীবাজীর অনুসারী মারাঠী দস্যুদের দস্যুপনা ও শিখদের উৎপাত মুসলমানদের জন্য 'মরার ওপর খাঁড়ার ঘা' হিসেবে দেখা দেয়। পাঞ্জাবের অমৃতশরের ছয় সাত ক্রোশ দূরে জুন্ডালা নামক দূর্গে মুসলমানরা শিখদের দ্বারা বন্দী হলো এবং মুসলিম নারী পুরুষ শিশু বৃদ্ধদের হত্যা করার সকল আয়োজন সম্পন্ন করা হলো।

কান্দাহারের মুসলিম শাসক আহ্‌মাদ শাহ্‌ দুররানী জানতে পারলেন, জুন্ডালা দূর্গে মুসলমানদের জীবন বিপন্ন। আশি হাজার শিখ সৈন্য দূর্গ অবরোধ করে রেখেছে। তিনি জয়-পরাজয়ের চিন্তা করলেন না, মুসলিম ভাইদের দূরাবস্থায় অস্থির হয়ে উপস্থিত মাত্র তিনশত সৈন্য ও সামান্য অস্ত্রসহ পাঞ্জাবের দিকে ছুটলেন। গভীর রাতে তিনি জুন্ডালা দূর্গের সংবাদ পান। সংবাদ পাওয়া মাত্রই তিনি বিপদ সঙ্কুল পর্বতময় পথে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। সরকারী কোন কর্মকর্তার সাথে কোনরূপ আলোচনা ব্যতীতই তিনি জুন্ডালা অভিযানে বের হন। আসার সময় প্রধানমন্ত্রী ওয়ালী খাঁনের নামে একটি পত্র লিখে আসেন। পত্রে লিখা ছিল– আপনি জুন্ডালা দূর্গে বন্দী মুসলমানদের উদ্ধারের লক্ষ্যে সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত সৈন্যবাহীনি নিয়ে চলে আসুন।

আহ্‌মাদ শাহ্‌ দুররানী, আল্লাহ প্রতি যাঁর অটল বিশ্বাস। মুসলমানদের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা। কাফির কর্তৃক মুসলমানরা আক্রান্ত। এ সংবাদ তিনি শোনার সাথে সাথে সৈন্য-সংখ্যা বিবেচনা করেননি। আধুনিক সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত আশি হাজারের এক বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে মাত্র তিন শত সৈন্য নিয়ে আল্লাহর সাহায্যের ওপরে নির্ভর করে তিনি মুসলমানদের উদ্ধারের লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। আল্লাহর প্রতি কত গভীর বিশ্বাস থাকলে এই সুঃসাহসীক অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়া যায়! যাঁরা দুনিয়ার কোন শক্তির ওপরে নির্ভর না করে একমাত্র আল্লাহর ওপরে নির্ভর করে কোন কাজে এগিয়ে যায়, তাঁদেরকে আল্লাহ অবশ্য অবশ্যই সাহায্য করেন। ঈমানের শক্তির সম্মুখে লক্ষ লক্ষ সৈন্য বাহিনী নাস্তানাবুদ হয়েছে, ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে এ ধরনের দৃষ্টান্ত অসংখ্য।

শিখ বাহিনী প্রধান গোয়েন্দা মারফত জানতে পারলো, স্বয়ং আহ্‌মদ শাহ্‌ দুররানী জুন্ডালা দূর্গের মুসলমানদের সাহায্যে এগিয়ে আসছেন, তখন আশি হাজার কাফির শিখ সৈন্য মাত্র তিনশত জিন্দাদীল মুসলিম বাহিনীর আগমন সংবাদেই পালিয়ে গেল। দুররানীকে যুদ্ধ করতে হয়নি। রক্তপাতহীন অভিযানে জুন্ডালা দূর্গে আবদ্ধ মুসলিম বন্দীরা মুক্ত হলো। পরপবর্তীতে ওয়ালী খাঁন বিশাল সৈন্যবাহিনী সমভিব্যহারে দুররানীর সাথে মিলিত হন। তিনি অবাক বিস্ময়ে দুররানীর কাছে জানতে চান– জুন্ডালা দূর্গে মুসলমানদের জীবন শিখদের হাতে বিপন্ন, এ সংবাদ আপনি জানলেন কিভাবে?

আহ্‌মদ শাহ্‌ দুররাণী বললেন– গভীর রাত, আমি নিদ্রামগ্ন। স্বপ্নে দেখলাম, আল্লাহর নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছেন। তিনি

জুন্ডালা দুর্গে মুসলমানদের করুণ অবস্থার সংবাদ জানিয়ে তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেন। আমি আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ অনুসারে সৈন্য বাহিনীর সংখ্যা বিবেচনা করিনি। একমাত্র আল্লাহর ওপরে নির্ভর করে মুসলিম ভাইবোনদের সাহায্যে বেরিয়ে পড়ি। ফলাফল যে কি, তা নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন।

আজ গোটা পৃথিবীর সর্বত্র মুসলিম নির্যাতিত হচ্ছে, কোন মুসলিম রাষ্ট্র নির্যাতিত মুসলিম ভাইদের সাহায্যে এগিয়ে আসছে না। ধর্ষিতা মুসলিম মা-বোনের করুণ আর্তচিৎকারে পৃথিবীর আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে, তবুও বিশ্বের অগণিত মুসলিম জনগোষ্ঠী তাঁদের পাশ্চাত্যমুখী দুর্বল নেতৃত্বের কারণে নিষ্পেষিত, নির্যাতিত। অপর মুসলিম ভাইদের সাহায্যে এগিয়ে যেতে পারছে না। আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েম করার লক্ষ্যে আজ প্রত্যেক মুসলমানকে শপথ গ্রহণ করতে হবে, নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে, আল্লাহ ভীতিহীন অসৎ নেতৃত্ব রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের প্রতিটি বিভাগ থেকে উৎখাত করার। সৎলোক কর্তৃক আল্লাহর বিধান দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রই নির্যাতিত মুসলিমের পাশে দাঁড়ানোর ঈমানী শক্তি সংরক্ষণ করে।

রক্ত সিক্ত বালাকোট

বলিষ্ঠ সুন্দর সুঠাম দেহের অধিকারী মাত্র ১৮ বছরের এক যুবক। ইসলামের দুশমনদের কবল থেকে উপমহাদেশের মুসলমানদের মুক্ত করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চিন্তায় তিনি অস্থির-চঞ্চল। বিশাল শক্তির অধিকারী ইংরেজ ও তাদের এ দেশীয় গোলামদের বিরুদ্ধে লড়াই করার কথা কল্পনা করাও কঠিন। ঈমানের অগ্নিশিখা যাঁর হৃদয়ে অনির্বাণ সেই ১৮ বছরের যুবক সৈয়দ আহ্মদ ব্রেলোভি সেই কল্পনাই বাস্তবে পরিণত করার লক্ষ্যে নিজেকে প্রস্তুত করলেন। তিনি জানতে পারলেন, দিল্লীতে আরেকজন মর্দে মুজাহিদ তাঁরই অনুরূপ চিন্তা-ভাবনা করছে। তিনি দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করলেন। উপস্থিত হলেন ইসলামী আন্দোলনের সিপাহসালার শাহ্ সাহেবের বীর মুজাহিদ পুত্র শাহ্ আব্দুল আজিজের কাছে। তিনি তাঁর মনের আকাংখা ব্যক্ত করলেন আল্লাহর পথের সৈনিকের কাছে।

শাহ্ আব্দুল আজিজের মন-মানসিকতা মুসলমানদের করুণ অবস্থা দেখে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছিল। ঈমানের আলোয় উদ্ভাসিত আগন্তুক যুবকের জিহাদের প্রতি অদম্য আগ্রহ দেখে আল্লাহর শোকর আদায় করলেন। হঠাৎ করে তিনি কোনো

সিদ্ধান্ত জানালেন না, কারণ আবেগ তাড়িত হয়ে হটকারি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা নিজেকে ধ্বংস করার শামিল। তিনি আগন্তুক যুবকের মধ্যে সম্ভাবনাময় নেতৃত্বের গুণাবলী দেখে তাঁকে আপন ভাই শাহ আহ্‌মদ কাদিরের হাতে অর্পণ করলেন জ্ঞানের অস্ত্রে সজ্জিত করার জন্য। সৈয়দ আহ্‌মদ ১৮০৭ সন নিজেকে লেখাপড়ায় নিয়োজিত রাখলেন। এরপর মর্দে মুজাহিদ শাহ আব্দুল আজিজ (রাহঃ) প্রিয় শিষ্য সৈয়দ আহ্‌মদকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কার্যকর পন্থা অনুসরণ করার নির্দেশ দিলেন।

সৈয়দ আহ্‌মদ তাঁরই বিপ্লবী চিন্তা ধারার অনুসারী হিসেবে লাভ করলেন দু'জন সঙ্গী, মর্দে মুজাহিদ মাওলানা আব্দুল হাই ও মাওলানা শাহ ইসমাঈলকে। আল্লাহর পথের নির্ভীক সৈনিক শাহ আব্দুল আজিজ অস্থিরতার মধ্যে সময় অতিবাহিত করছেন। কারণ, ক্রমশ ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের অবস্থার চরম অবনিত ঘটছে। অমুসলিমরা ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের পাত্রে পরিণত করেছে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন সশস্ত্র জিহাদের।

পক্ষান্তরে সশস্ত্র জিহাদের জন্য যে উপকরণ এবং ইসলামী আদর্শে সুশিক্ষিত একদল জানবাজ মুজাহিদের প্রয়োজন, তা বর্তমানে নেই। এই লক্ষ্য অর্জনে তিনি সৈয়দ আহ্‌মদকে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহনের জন্য পাঠালেন টংকের নবাব আমীর খানের সেনাবাহিনীতে। সেখানে তিনি সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলেন। এক যুদ্ধে টংকের সেনাবাহিনী যখন ইংরেজদের সাথে সন্ধি করলো, তখন সৈয়দ আহ্‌মদ ঘৃণাভরে সেনাবাহিনী ত্যাগ করে ফিরে এলেন শাহ আব্দুল আজিজের কাছে। ১৮১৮ সনে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁরা ভারতীয় উপমহাদেশ ব্যাপী তীব্র আন্দোলন শুরু করলেন । ইসলামী আন্দোলনের কর্ণধার শাহ আব্দুল আজিজ ইংরেজ ও শিখ শাসিত রাষ্ট্রসমূহকে দারুল হরব ঘোষণা দিয়ে সমস্ত মুসলমানদেরকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জিহাদে অংশ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানালেন। আন্দোলন পরিচালনার জন্য শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম ও সামরিক পরিষদ গঠন করে শাহ আব্দুল আজিজ এর দায়িত্বশীল নিয়োগ করলেন সৈয়দ আহ্‌মদ ব্রেলোভীকে। তিনি উপমহাদেশ ব্যাপী ব্যাপক সাংগঠনিক সফরের মাধ্যমে অগণিত মুসলমানদেরকে জিহাদী আন্দোলনে শামিল করলেন।

সশস্ত্র জিহাদে অংশ গ্রহণ করার লক্ষ্যে যাঁরা আগ্রহ প্রকাশ করলো, তিনি তাঁদের সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলেন। পূর্ণাংগ সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে সিপাহ্‌শালার শাহ আব্দুল আজিজের অনুমতিক্রমে তিনি আন্দোলনের নেতৃত্বস্থানীয়

ব্যক্তিদের সাথে নিয়ে হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করলেন। তিনি মক্কায় অবস্থানকালে প্রিয় নেতা বিপ্লবী মুজাহিদ উস্তাদ শাহ্ আব্দুল আজিজ এ নশ্বর দুনিয়া ত্যাগ করে প্রিয় বন্ধু আল্লাহর দরবারে চলে গেলেন। এবার আন্দোলন পরিচালনার যাবতীয় দায়িত্ব এসে পড়লো সৈয়দ আহমেদ ব্রেলোভী (রাহঃ) এর ওপর। তিনি সাধ্যানুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ করে সশস্ত্র জিহাদ শুরু করেন। দেশের বিভিন্ন স্থানের মুসলিম আমীরদেরকে এই জিহাদে শামিল হওয়ার জন্য উদাত্ত আহবান জানালেন। কিন্তু ক্ষমতার মোহ ও ইংরেজদের গোলামী করার কারণে সীমান্তের বিপ্লবী পাঠান সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কেউ জিহাদে অংশগ্রহন করলো না।

সৈয়দ আহ্মদ ব্রেলোভী (রাহঃ) একমাত্র আল্লাহর ওপরে নির্ভর করে মাত্র নয়শত মুজাহিদ নিয়ে নওশেরায় ১৯২৬ সনের ২৮ ডিসেম্বর শিখদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। আল কোরআনের বিপ্লবী বাহিনীর তীব্র আক্রমণের মুখে শিখ নেতা রণজিত সিংহ তার সাত হাজার সৈন্য নিয়ে পিছু হটতে বাধ্য হলো। আল্লাহর প্রত্যক্ষ সাহায্যে ইমাম সৈয়দ আহ্মদ বিজয়ী হলেন। এ যুদ্ধে মাত্র ৮২ জন মুসলিম মুজাহিদ শাহাদাতবরণ করলেন। আর কাফির সৈন্য শিখদের নিহত হলো প্রায় সাত শতের অধিক। নওশেরার যুদ্ধের ফলাফল ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয়ী হওয়ার ফলে গোটা ভারত বর্ষে সৈয়দ আহ্মদ ব্রেলোভী (রাহঃ) কর্তৃক পরিচালিত ইসলামী আন্দোলন সাধারণ মুসলমান- যারা ছিল ইংরেজসহ অমুসলমানদের অত্যাচারে হতাশা গ্রস্ত এবং অতিষ্ঠ তারা দলে দলে সৈয়দ আহ্মদের বাহিনীতে প্রবেশ করলো। মুজাহিদদের দল ক্রমশঃ ভারী হয়ে উঠলো। এই আন্দোলন পরিচালনার জন্য যে খরচের প্রয়োজন ছিল তা যোগান দিত সাধারণ মুসলিম জনসাধারণ।

সৈয়দ আহ্মদের মুজাহিদ বাহিনীতে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত হওয়ার কারণে, অমুসলিমদের দালাল, মুসলমান নামধারী মুনাফিকরা আন্দোলনের ক্ষতি করার জন্য মুজাহিদ বাহিনীতে প্রবেশ করে সুযোগের অপেক্ষায় ঘাপটি মেরে রইলো। বহু ত্যাগ-তিতীক্ষার ফলশ্রুতিতে ১৮২৭ সনের জানুয়ারী মাসের ১১ তারিখে নওশেরায় গোড়া পত্তন ঘটলো একটি ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের। এই রাষ্ট্র ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র শুরু করলো ইংরেজ, মুশরিক ও মুনাফিক গোষ্ঠী। তারা অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা শুরু করলো। তাদের চক্রান্ত এতই প্রবল ছিল যে, খলীফা সৈয়দ আহ্মদের নির্দেশে মুজাহিদ বাহিনী পুনরায় যে যুদ্ধ শুরু করে, সেই 'শহীদ সাইদুর' যুদ্ধে মুজাহিদরা পরাজয়বরণ করতে বাধ্য হলো। ইসলামের দুশমনরা সাধারণ আফগানীদের উস্কানী দিয়ে উত্তেজিত করে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। মুসলিম নামধারী

মুনাফিকদের চক্রান্তে আফগানীরা অতর্কিতে হামলা চালিয়ে মুজাহিদ কমান্ডার ও বিপ্লবী সরকারের প্রায় সকল কর্মকর্তাকে হত্যা করে। ফলে শিশু ইসলামী রাষ্ট্রের কুড়ি পৃথিবীতে সৌরভ ছড়ানোর পূর্বেই– সদ্য পরিস্ফুটিত ইসলামী রাষ্ট্রের সুরভিত গোলাপ পৃথিবীতে পাপড়ী মেলার পূর্বেই ইংরেজ হিন্দু শিখদের দালাল-নামধারী মুসলমান মুনাফিকদের চক্রান্তে ঝড়ে পড়লো।

এই ঘটনায় সৈয়দ আহ্মদ ব্রেলভী (রাহঃ) মানসিকভাবে প্রচন্ড আঘাত পেলেন। কিন্তু আল্লাহর পথের মুজাহিদ সৈয়দ আহ্মদ হতাশ হলেন না। তিনি আল্লাহর ওপরে নির্ভর করে শহীদী প্রেরণা নিয়ে জিহাদ চালিয়ে যেতে লাগলেন। তিনি মুজাহিদ বাহিনী সমভিব্যহারে কাশ্মির অভিমুখে যাত্রা করলেন। কাশ্মির পৌঁছে শাহ ইসমাঈল ও খায়রুদ্দীনের নেতৃত্বে চারশত মুজাহিদকে ডেরাভুকর মংকে শিখদের মুকাবিলা করার জন্য প্রেরণ করলেন। শিখ সর্দার শের সিংহ বিশ হাজার সৈন্যসহ মুসলমানদের মোকাবেলা করে ব্যর্থ হলো। চারশত জিন্দাদিল মুসলিম মুজাহিদের প্রবল আক্রমণের মুখে কাফির সৈন্যরা শৃগালের মত পালাতে বাধ্য হলো। মুসলিম বাহিনীর বীরত্ব সম্পর্কে আল্লামা ইকবাল বলেন–

টল না সেকতে থে আগার জঙ্গ মেঁ উড় জাতে থে
পাউঁ শেরূঁ কে ভী ময়দাঁ সে উখাড় জাতে থে।

মুসলিম বাহিনী যখন যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য ময়দানে কুচকাওয়াজ করতো তখন ইসলামের শত্রুরা মুসলমানদের কুচকাওয়াজের দৃশ্য দেখেই ভয়ে শৃগালের মত পালিয়ে যেত।

ঈমানী শক্তির সম্মুখে সংখ্যাধিক্য কোন বিষয় নয়- ইতিহাস এর জলন্ত সাক্ষী। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা কোনদিন অস্ত্র শক্তি ও জনশক্তির ওপরে নির্ভর করে জিহাদ করে না। তাঁরা কেবলমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাহায্যের ওপরে নির্ভর করে। ময়দানে যখন দ্বীনি আন্দোলনের কর্মীরা দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মরণপন লড়াই করে তখন তাঁদেরকে সাহায্য করা আল্লাহ জন্য ওয়াজিব হয়ে যায়।

মুজাফফরাবাদ শিখ শক্তির কেন্দ্রীয়স্থল। মুজাহিদদের প্রবল আক্রমণের মুখে শিখরা মুজাফফরাবাদ ত্যাগ করতে বাধ্য হলো। মুজাহিদরা ইতোপূর্বেই বালাকোর্ট দখল করে নিয়েছিল। এই যুদ্ধকালে শিখনেতা শের সিং পেশোয়ারে অবস্থান করছিল। এ পরাজয়ের সংবাদ জানার পর সে সে অমুসলিম বাহিনী এবং মুসলিম নামধারী মুনাফিকদের সাহায্যে মুজাফফরাবাদ ও বালাকোটের মধ্যস্থলে গিড়াই হাবিবুল্লাহ নামক স্থানে ঘাঁটি গাড়লো।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি কাশ্মিরের সন্নিকটে বালাকোট ছিল প্রাকৃতিকভাবেই পাহাড় দিয়ে দুর্গের মত বেষ্টিত। বিশাল উচ্চ পর্বত শ্রেণীর অতিক্রম করে মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করা কাফির শিখ ও ইংরেজদের পক্ষে ছিল প্রায় অসম্ভব। একদিকে মাত্র একটি পথ ছিল, সে পথ অতিক্রম করাও ছিল অত্যন্ত কঠিন। তদুপরি ৭০ জন মুসলিম সৈন্য সে পথে প্রহরায় নিযুক্ত ছিল। এবার মুনাফিকরা সক্রিয় হয়ে উঠলো। তাদের সহযোগিতায় প্রহরায় নিযুক্ত ৭০ জন মুজাহিদকে শিখরা হত্যা করে পাহাড়ের ওপরে সুরক্ষিত স্থানে ঘাঁটি গেড়ে পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থানরত মাত্র ১২ শত মুজাহিদদের ওপরে বৃষ্টির মত গুলী বর্ষণ শুরু করলো। নিশ্চিত পরাজয় দেখেও ইসলামী আন্দোলনের সিপাহসালার আত্মসমর্পণের অবমাননামূলক জীবন বাঁচিয়ে রাখার পথ অনুসরণ করলেন না। মাত্র ৪৬ বছর বয়সে সৈয়দ আহ্মদ ব্রেলভী, ৩৫ বছর বয়স্ক মাওলানা ইসমাঈল হোসেন ও বাহরাম খান প্রবল বীরবিক্রমে শিখদের সাথে হাতাহাতি লড়াই করে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করলেন। সেদিনটি ছিল ১৮৩১ সনের ৬ই মে পবিত্র শুক্রবার। জুম্মার নামাজের সময় এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে বা লাকোটের প্রান্তরে।

বালাকোটের প্রান্তরে কি ইসলামী আন্দোলন চীরতরে মুখ থুবড়ে পড়েছে? পর্বত ঘেরা বালাকোটের প্রান্তরে শাহাদাতের পেয়ালা পান করে মুজাহিদরা ঘুমিয়ে পড়লো, সে ঘুম কি তাঁদের উত্তরসূরীদের চোখও ক্লান্ত করেছে? ইসলামের জন্য বালাকোটের ময়দানে মুজাহিদরা তপ্ত রক্ত হাসি মুখে ঢেলে দিল- সে রক্ত কি বৃথা গেছে?

না! আল্লাহর পথের মুজাহিদের আত্মত্যাগ বৃথা যায় না। সৈয়দ আহ্মদের ইসলামী আন্দোলন বালকোটের ক্ষুদ্র গন্ডী থেকে বিস্তৃত হয়ে আজ দাবানলের মত সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। বালাকোটের প্রতিটি রক্ত বিন্দু থেকে শত কোটি মুজাহিদ জন্ম নিচ্ছে। দ্বীনি আন্দোলনের কর্মীরা বালাকোটের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে ময়দানে এগিয়ে যাচ্ছে। বালাকোটের শহীদদের প্রতিটি রক্ত বিন্দু দ্বীনের কর্মীদের প্রতিটি মুহূর্তে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে কায়েম করতেই হবে। বালাকোটের ঘটনা ইতিহাসে পড়ে ইসলামের মুজাহিদরা অশ্রুজলেই সিক্ত হবে না– অদম্য স্পৃহা নিয়ে বাতিল শক্তিকে পৃথিবী থেকে চিরতরে উৎখাত করার দৃঢ় সংকল্পও গ্রহণ করবে।

ইতিহাসের বড় শিক্ষা ইতিহাস থেকে খুব কম সংখ্যক মানুষই শিক্ষা গ্রহণ করে। ১৮৩১ সনে পবিত্র জুমুআর নামাযের সময় শিখরা যে বর্ণবাদী হিন্দুদের

সহযোগিতায় বালাকোটের ময়দানে নিষ্ঠুরভাবে মুসলমানদেরকে হত্যা করেছিল, সময়ের ব্যবধানে সেদিনের সহযোগিদের হাতে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে শিখদের পবিত্র স্বর্ণ মন্দিরে শিখ নেতৃবৃন্দ তাদেরই এক কালের বন্ধুদের হাতে নিহত হলো। ইতিহাস শিখদের ক্ষমা করেনি। শিখদের মুক্তি আন্দোলনের নেতা শান্ত জর্নাল সিংহ ভীন্দ্রানওয়ালে দলবলসহ হিন্দুবাহিনীর হাতে অত্যন্ত নির্মমভাবে প্রাণ দিল তাদেরই পবিত্র স্থান অমৃতশরে স্বর্ণ মন্দিরের মধ্যে। বালাকোটে কি অপরাধে মুসলমানদেরকে শহীদ করা হয়েছিল? আপরাধ তো তাঁদের একটিই ছিল যে, তাঁরা একটি স্বাধীন সার্বভৌম ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র কায়েম করতে চেয়েছিল। যেখানে মুসলমানরা নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রাণভরে স্বাধীনভাবে পালন করতে সক্ষম হবে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ও ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুদের সহযোগিতায় শিখরা মুসলমানদের সে আকাংখা পূর্ণ হতে দেয়নি। আজ শিখরা সম্প্রদায়ও তাদের পৃথক সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে স্বাধীন খালিস্তান গঠনের জন্য কয়েক বছর যাবৎ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে তাদেরই এক কালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিন্দুদের বিরুদ্ধে, কিন্তু হিন্দুরা শিখদের ন্যায় সংগত আন্দোলন বুলেটের মাধ্যমে স্তব্ধ করে দেয়ার চেষ্টা করছে।

বিধাতার কি নির্মম নিষ্ঠুর পরিহাস! এই বুলেট দিয়েই সেদিন বালাকোটের ময়দানে ইসলামের সৈনিকদের বুক শিখরা ঝাঁঝড়া করে দিয়েছিল। সেই বুলেট আজ তাদেরই জন্য বুমেরাং হয়ে দেখা দিয়েছে। মহাকালের ঘূর্ণয়মান চক্রের আবর্তনে হিন্দু বন্ধুদের হাতেই হাজার হাজার শিখকে প্রাণ দিতে হচ্ছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী ইন্দ্রিরা গান্ধীকে হত্যা করার পরে হিন্দুদের হাতে শিখ নিধনযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় গোটা ভারতব্যাপী। শিখদের প্রতি হিন্দুদের নিষ্ঠুরতা দেখে ক্ষণিকের জন্য হলেও ইতিহাস থমকে গিয়েছিল। কোন জাতির প্রতি অন্যায় করলে অন্যায়কারীদেরকেও একই ভাগ্য বরণ করতে হয়– এটাই ইতিহাসের শিক্ষা।

ফাঁসির রায় শুনে অট্টহাসি

১৮৫৭ সনের সিপাহী বিপ্লবের অন্যতম নায়ক মাওলানা ইয়াহইয়া আলী আজীমাবাদীর বিরূদ্ধে বিচার প্রহসনে ফাঁসির আদেশ জারি করা হয়। আমীরুল মুমেনিন বালাকোটের শহীদ হযরত সৈয়দ আহ্মদ (রাহঃ)-এর বিপ্লবী চিন্তাধারার অনুসারী ইসলামের মর্দে মুজাহিদ মাওলানা ইয়াহইয়া আলী বিচারের নামে

প্রহসনের রায় শুনে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। বিচার নামক এ প্রহসন সম্পন্ন করছিল তিনজন ইংরেজ বিচারক। ইসলামী আন্দোলনের দুশমন ইংরেজ বেনিয়া তিনজন অবাক কণ্ঠে প্রশ্ন করলো– তোমার মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করা হয়েছে। কিছু সময়ের মধ্যেই তোমাকে ফাঁসিতে ঝুলানো হবে। আর এ ঘোষণা শুনে তুমি পাগলের মত হাসছো! তুমি কি ইংরেজী ভাষায় পঠিত মামলার রায় বুঝতে পারনি?

রক্ত পিচ্ছিল পথের এই অসীম সাহসী মুজাহিদ জবাব দিলেন– বুঝতে পারবোনা কেন, তোমাদের ভাষা আমি ভালো ভাবেই বুঝি। আর বুঝতে পেরেছি বলেই তো আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছি। কারণ ইসলামী আন্দোলনের একজন মুজাহিদ হিসেবে আমার মনের মনি কোঠায় দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন 'শাহাদাত বরণ'। আজ সেই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হতে দেখে আমার মনে যে কি আনন্দ, তা তোমরা বুঝতে পারবে না। আজ আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন। একজন মুসলমানের জীবনের সবচাইতে বড় সাফল্য শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করা, আমি সেই মর্যাদার অভিষিক্ত হতে যাচ্ছি। এ যে আমার কত বড় সৌভাগ্য তা তোমাদের বুঝার কথা নয়।

ইসলামের চীর দুশমন খৃষ্টশক্তি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা লক্ষ্য করলো, মাওলানার এ আনন্দ প্রদর্শনীমূলক নয়, এ আনন্দ তাঁর হৃদয়ের চরম অভিব্যক্তি। এ সত্য কয়েক দিনের মধ্যেই মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলীর চেহারায় ফুটে উঠলো। কাফির ইংরেজদের প্রধান লক্ষ্যই ছিল শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের বিপ্লবী মুজাহিদ আলিমদেরকে ধ্বংস করা। সুতরাং ইসলামের মুজাহিদরা শাহাদাতের সংবাদে আনন্দিত হবে, এটাও ইসলামের দুশমনদের সহ্য হলো না। তারা সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে মাওলানাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করে আন্দামানে পাঠানোর ব্যবস্থা করলো।

পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক মাওলানাকে মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামীদের অন্ধকার কুঠুরী থেকে বের করে সাধারণ কয়েদীদের সাথে রাখা হলো। এখানের আইন হলো, নতুন কোন আসামী এলে তার চুল-দাড়ি গোঁফ কেটে দেয়া। জোরপূর্বকভাবে মাওলানারও দাড়ি কেটে দেয়া হলো। তিনি কাটা দাড়ি হাতে উঠিয়ে অশ্রুধারায় দাড়ি সিক্ত করে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন– এ দাড়ি আমি রেখেছিলাম রাসূলের সুন্নাত হিসেবে। আজ সে সুন্নাতকে কাফিরেরা সহ্য করতে পারলোনা। তবে আমার মনের সান্ত্বনা, এই দাড়ি যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্যে রেখেছিলাম, আজ সেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথে আন্দোলন করতে গিয়েই গ্রেফতার হয়েছি এবং দাড়ি হারিয়েছি।

মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলীর যাবতীয় সম্পদ ইংরেজরা বাজেয়াপ্ত করে তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে নির্যাতনের মাধ্যমে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে বাড়ি-ঘর ধ্বংস করা হয়। এমন কি তার বাড়িতে পারিবারিক কবরস্থান পর্যন্ত ধ্বংস করে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়।

এদেশে ক্ষতি যা হবার মুসলমানদেরই হয়েছে ব্রিটিশ বেনিয়াদের কারণে। জড়বাদী হিন্দু সম্প্রদায় মারাত্মক ধরণের ক্ষতির উর্ধ্বে থেকে গেল। কারণ তারা মনে করেছিল, এতকাল আমাদের শাসন করেছে মুসলমানেরা, আর এখন করবে ইংরেজরা। এতে আমাদের ক্ষতি নেই বরং প্রভূ বদল হয়েছেন মাত্র। আর মুসলমানদের রাজ্য গেল, চাকুরী গেল, মর্যাদা গেল, অর্থ-বিত্ত গেল, গেল প্রভাব প্রতিপত্তি। এক কথায় সবই গেল। এরা ছিল শাসক জাতি হয়ে গেল শাসিত। ইতিহাস এখানেই শেষ নয়, এদেশের মুসলমানরা ১৮৫৭ সনের জানুয়ারী থেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে। তখনও ঐ জড়বাদী সম্প্রদায়ের লোকেরাই বিশ্বাসঘাতকতা করে ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহকে নস্যাত করে দেয়। মানসিংহ নামে এক জড়বাদী প্রধান, তাণ্ডিয়া টোপীকে ইংরেজদের হাতে ধরে দেবার ব্যবস্থা করে। পরে ইংরেজরা ঝাঁঝীর রাণী তান্ডিয়া টোপীকে ফাঁসিতে ঝুলায়। সম্রাট বাহাদুর শাহের যিনি সেক্রেটারী সেই মুকুন্দ লালও ছিল ইংরেজদের দালাল।

ইসলামী আন্দোলনের বীরসেনানী আলিম সমাজই ইংরেজদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়ে দেন। এ সময় দেশের আলিম সমাজ স্বাধীনতা যুদ্ধে সার্বিকভাবে অংশগ্রহণ করেন। সংগ্রামের প্রচারণা, সংগঠন ও সেনাপতিত্ব প্রায়ই আলিমদের দ্বারা পরিচালিত হয়। এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হবার পর হিন্দুরা সাধু সেজে বিদ্রোহের সব দায়-দায়িত্ব মুসলমানদের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা ইংরেজদের কৃপা দৃষ্টি লাভ করে। সংগ্রামের পুরোভাগে ছিলেন আলিম সমাজ, সুতরাং তাঁদেরই ওপর নেমে এলো ইতিহাসের বর্বর নির্যাতন।

ইংরেজ ও বর্ণবাদী হিন্দুদের যোগ সাজশে হাজার হাজার আলিমদের বিচারের নামে প্রহসন চালিয়ে প্রকাশ্যে গাছের ডালে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেয়া হয়। ইংরেজদের সাথে হাত মিলিয়ে বিশ্বাস ঘাতকরা মুসলমানদের জ্যন্ত অবস্থায় আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে। অগণিত ইসলামী চিন্তাবিদকে আন্দামানে নির্বাসন দেয়া হলো। অসংখ্য মুসলিম বীর সেনানীদের গাছের ডালে ঝুলিয়ে ফাঁসির রশি গলায় পরিয়ে দিয়েছে। লাশগুলো দিনের পরদিন ঐ অবস্থাতেই থেকেছে, পচে গলে নষ্ট হয়েছে। শিয়াল-শকুনে খেয়েছে, তবুও দাফন-কাফনের কোন ব্যবস্থাই করতে দেয়নি বিশ্বাসঘাতকরা।

ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্কসহ উপমহাদেশের অনেক স্থানই ঐ বিষাদময় স্মৃতি নিয়ে কালের সাক্ষী হয়ে আছে।

বিধাতার কি নিমর্ম নিষ্ঠুর পরিহাস! দেশের যাঁরা স্বাধীনতা চাইলেন সেই মুসলিমরা অমুসলিম ঐতিহাসিকদের কাছে হয়ে গেলেন সন্ত্রাসবাদী-দুস্কৃতিকারী। শোষণের বিরুদ্ধে যাঁরা রুখে দাঁড়ালেন তাঁরা হলেন মৃত্যুদন্ডের আসামী। ইসলামী জীবন বিধান যাঁরা প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন তাঁদেরকে চিহ্নিত করা হলো সাম্প্রদায়িক হিসেবে। আর মুসলমানদের চরম শত্রু সন্ত্রাসী ক্ষুদিরাম ও ডাকাত সূর্যসেন অমুসলিমদের কলমের এক খোচায় হয়ে গেল বিপ্লবী বীর স্বাধীনতার মহান নায়ক।

অদৃষ্টের পরিহাস! বীরের জাতি হলো অধঃপতিত শাসক হলো ভুলণ্ঠিত। ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী ঐতিহাসিকদের কারসাজিতে ইতিহাসের নায়কগণ চলে গেল যবনিকার অন্তরালে আর কাপুরুষরা তাঁদের উজ্জল পৃষ্ঠা মশীবর্ণ করে দিতে শুরু করলো। তারা মুসলিম বীরদের স্থান দিল ইতিহাসের আস্তাকুড়ে। ইংরেজ প্রভুদের মনোরঞ্জন করার জন্য হিন্দুরা প্রতিযোগিতায় নেমে পড়লো। ইতিহাস বিকৃত করে মুসলিম বীরকে ভীরু সাজিয়ে আর দেশদ্রোহী কাপুরুষদের বীর বেশে সাজিয়ে কত রঙের খেলাই না খেললো বর্ণহিন্দুরা।

জড়বাদী হিন্দু ও বিশ্বাসঘাতক ইংরেজরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে এমন এক ঘৃণ্য তৎপরতা শুরু করলো যে, ইসলামী রীতি-নীতি, পোষাক-পরিচ্ছেদ, নাম-পরিচয়, পদবী কিছু সময়ের জন্য হেয় প্রতিপন্ন হলো। আলিম সমাজকে লোক সমাজে বানানো হলো উপহাসের পাত্র। কোরআন-হাদীসের অমর্যাদা করে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেয় প্রতিপন্ন করে সাহিত্য রচনা করলো হিন্দু লেখক-সাহিত্যিকবৃন্দ। মুঘলদের বড় বড় পদবীধারী ব্যক্তিবর্গ সমাজে অচল মুদ্রা হয়ে পড়লেন। নবাবী পোষাক উঠলো দারোয়ানদের গায়ে আর বাদশাহী আমলের খান-ই সামান 'খান সামায়' রূপান্তরিত হয়ে হিন্দু-ইংরেজ অফিসারদের হুকুম বরদার ভৃত্যে পরিণত হলো।

এই অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীকে মুক্ত করার জন্য ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা বার বার জিহাদ করে শহীদ হতে থাকে। সৈয়দ আহ্‌মদ ব্রেলোভী (রাহঃ) বালাকোটের ময়দানে সঙ্গী-সাথীসহ শাহাদতবরণ করেন। তিতুমীর সঙ্গী-সাথীসহ শাহাদাতবরণ করেন। তাঁরা বাতিল শক্তির উচ্ছিষ্ট ভোগী হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে সিংহের মত লড়াই করে শাহাদাতবরণই শ্রেয় মনে করেছেন। বর্তমানে মুসলমানরা গোলামীর জীবনকে শাহাদাতের মৃত্যুর তুলনায় অধিক মর্যাদা দিয়েছে বলে গোটা পৃথিবীব্যাপী নির্যাতিত-নিষ্পেষিত ও অবহেলিত।

আল্লাহর পথের নির্ভীক সৈনিক

বিংশ শতাব্দীর মর্দে মুজাহিদ হযরত আল্লামা বদিউজ্জামান নুরসী তুরস্কে আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'ইত্তেহাদে মুহাম্মাদী' নামে একটি দল গঠন করেন। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বদিউজ্জামান অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর সংগঠনকে একটি গণমুখী সংগঠনে পরিণত করেন। ইসলামী আন্দোলনের আপোষহীন মুখপাত্র 'নূর' এর মাধ্যমে প্রস্তুত হতে থাকে জনমত গঠন। একবার তিনি শুনতে পেলেন মিরাগোত্রের সরদার- গোত্রের লোকদের ওপরে অত্যাচার করে। তিনি একাকী পুরনো তরবারী হাতে মিরা গোত্রের সরদার মোস্তফা পাশার সম্মুখে উপস্থিত হন। পাশা উচ্চকণ্ঠে নুরসীকে জিজ্ঞেস করেন- এখানে কেন এসেছেন?

বদিউজ্জামান নির্ভীক কণ্ঠে জবাব দেন- এসেছি তোমাকে সৎ পথ প্রদর্শন করতে। যদি তুমি সঠিক পথে না চলো, জনগণের ওপরে অত্যাচার বন্ধ না করো তাহলে আমি তোমার দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে দেবো।

পাশা নুরসীকে ব্যঙ্গ করে বললো- এই পুরনো তরবারী দিয়ে তুমি আমার মাথা কাটতে চাও?

নুরসী তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে বললেন- তরবারীর পিছনে থাকবে একটি শক্তিশালী হাত। সেই হাত অত্যাচারীর কণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ করে দেবে।

এরপর বহু তর্কবিতর্কের পরে মোস্তফা পাশা নতি স্বীকার করে এবং বদিউজ্জামান নুরসীর কাছে তওবা করে ইসলামের পথে চলার শপথ করে। নুরসী কর্তৃক পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনে ভীত হয়ে তুরস্কের বাতিল সরকার ১৯০৯ সনে এই আন্দোলনের প্রথম সারির নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে বিচারের সম্মুখিন করে। বিচারের নামে প্রহসন চালিয়ে ইসলামের ১৯ জন মুজাহিদকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হয়। বিচারক রায় ঘোষণা করার সময় বদিউজ্জামান নুরসীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেন- আপনিও কি তুরস্কে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী?

ইসলামী আন্দোলনের সিংহপুরুষ বদিউজ্জামান নুরসী বজ্রকণ্ঠে উত্তর দেন- অবশ্য অবশ্যই চাই। আমার যদি ১০০০ টি মাথা থাকতো, তাহলে প্রত্যেকটি মাথার বিনিময়ে হলেও আমি পূর্ণ ইসলামের বাস্তবায়ন চাইতাম। আমি পূর্বেও বলেছি, আমি আল্লাহর দ্বীনের একজন নগণ্য কর্মী মাত্র। আমার মানদন্ড ইসলাম। ইসলামের বিপরীত কোন কিছু আমি মেনে নেব না। বর্তমানে আমি এখান থেকে

আখিরাতের ময়দানে যাওয়ার অপেক্ষায় আছি। আমি যা কিছু বলছি তা শুধু তোমাদের জন্যই নয়। আমি চাই আমাদের অবস্থা গোটা দুনিয়া জেনে যাক।

তিনি বলতে থাকলেন– আমি আখিরাতের ময়দানে যাবার জন্য প্রতীক্ষা করছি এবং যাঁরা মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হয়েছে তাঁদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছি। মরুভূমির যাযাবরেরা দেশের রাজধানী দেখার জন্য ব্যাকুল থাকে, আমিও তেমনি আখিরাতের ময়দানে যাবার জন্য ব্যকুল হয়ে পড়েছি। তোমরা আমাকে নির্বাসন দিতে পার। মৃত্যুদন্ড দিতে পার, যাকে আমি কোন শাস্তিই মনে করি না। কিন্তু তোমাদের যদি শক্তি থাকে তাহলে আমার চিন্তাধারা পরিবর্তন করে দাও। যদি ক্ষমতাশালী হও, তাহলে আমার আদর্শকে শাস্তি দাও। তোমাদের আগের সরকার ছিল বিবেকের শত্রু আর বর্তমান সরকার হলো প্রাণের শত্রু।

পরের দিন বদিউজ্জামান নুরসীর এই বক্তব্য পত্রিকায় প্রকাশ হলে গোটা তুরস্কে আন্দোলনের ঝড় ওঠে। হাজার হাজার জনতা নুরসীর মুক্তির জন্য আদালত ঘেরাও করে সরকারের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে থাকে। ফলে সরকার বাধ্য হয়ে ইসলামের এই অকুতোভয় নির্ভীক সৈনিককে মুক্তি দেয়। বদিউজ্জামান নুরসী জেল থেকে মুক্তি লাভ করে পুনরায় ইসলামী আন্দোলনকে তার মনযিলে মকসুদের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে থাকেন। ইতোমধ্যে গোটা পৃথিবীতে ভয়ংকর রণ দামামা বেজে উঠে। সূচনা হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের। বদিউজ্জামান নুরসী স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যুদ্ধে যোগদান করেন। যুদ্ধে তিনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করে সামরিক বাহিনীর মধ্যে একজন সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। দিনের আলোয় তিনি যুদ্ধ করতেন। আর রাতে তিনি সৈন্যদের মধ্যে কোরআনের তাফসীর শুনিয়ে সৈন্যদেরকে ইসলামী আদর্শের প্রশিক্ষণ দিতেন। ফলে সৈন্যদের অনেকেই দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শামিল হন।

যুদ্ধ চলাকালে তিনি রুশ বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হন। তাঁকে বন্দী শিবিরে রাখা হয়। একদিন রুশ জেনারেল নিকোলাস বন্দী শিবির পরিদর্শনে এলে সকল বন্দী দাঁড়িয়ে নিকোলাসকে সম্মান প্রদর্শন করে। কিন্তু বদিউজ্জামান দাঁড়ালেন না, তিনি বসে থাকলেন। রুশ জেনারেল তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন– বোধহয় তুমি আমাকে চিনতে পারনি?

নুরসী বসেই উত্তর দিলেন– তোমাকে চিনবো না কেন! আমি তোমাকে চিনি, তুমি নিকোলাস।

রুশ জেনারেল ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো– যদি তুমি জেনে বুঝে আমাকে সম্মান প্রদর্শন না করে থাকো, তাহলে তুমি রুশীয় ঐতিহ্যের প্রতি অসম্মান দেখিয়েছো।

আল্লাহর পথের মর্দে মুজাহিদ নির্ভীক কণ্ঠে উত্তর দিলেন– আসল ব্যাপার তা নয়। আমি যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী, সে আল্লাহর সিদ্ধান্ত হলো– ঈমানদার ব্যক্তি কাফিরদের তুলনায় অধিক সম্মানের পাত্র। আমি সে কারণেই উঠে দাঁড়িয়ে তোমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিনি।

ইসলামী আন্দোলনের বিপ্লবী বীর বদিউজ্জামান নুরসীর নির্ভীক কণ্ঠের সাহসী উচ্চারণ কথা শুনে বন্দী শিবির স্তম্ভিত হয়ে গেল। রাগে-ক্ষোভে অপমানে রুশ জেনারেল নিকোলাসের গৌরবর্ণ চেহারা লাল হয়ে উঠলো। প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠলো নিকোলাসের চোখে। অন্যান্য বন্দীরা ভাবলো এখনই বোধহয় নুরসীকে ফায়ারিং স্কোয়াডে নেয়া হবে গুলী করার জন্য। কিন্তু রক্ত পিচ্ছিল পথের সাহসী যাত্রী নুরসীর চোখে মুখে নেই কোন ভীতির চিহ্ন। তিনি চিন্তাহীন চিত্তে ঐ মহান মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ধ্যানে মগ্ন।

রুশ জেনারেল নিকোলাস ক্রোধে উন্মাদ হয়ে নুরসীকে ফাঁসির হুমকি দিয়ে চলে গেলেন। যে হৃদয় একমাত্র আল্লাহর কাছে নিজেকে পরিপূর্ণরূপে সমর্পণ করেছে সে হৃদয়ে মানুষের কোন হুমকি দাগ কাটতে পারে না। ফাঁসির হুমকিতেও নূরসীর মুখের স্নিগ্ধ হাসি সামান্যতম ম্লান হয়নি। তিনি অম্লান বদনে ফাঁসির মঞ্চের দিকে এগিয়ে চললেন। রুশ জেনারেল আশ্চার্য হয়ে মাওলানা বদিউজ্জামান নুরসীর সৌম্য-শান্ত সুন্দর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। ফাঁসির মঞ্চেও মাওলানার মুখে স্বর্গীয় হাসি। রুশ জেনারেল নিকোলাস নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলেন না। তিনি দ্রুতপদে ফাঁসির মঞ্চে শাহাদাতের অমিয় সুধা পানের অপেক্ষায় দন্ডায়মান নুরসীর কাছে গিয়ে বললেন– আমি তোমাকে ফাঁসির দন্ড মওকুফ করে দিলাম। যে ইসলাম তোমাকে এতটা নির্ভীক ও আত্মমর্যাদাশীল করেছে, আমি সেই ইসলামের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। এখন থেকে তুমি মুক্ত স্বাধীন।

নুরসী পুনরায় তাঁর নিজ দেশ তুরস্কে এসে ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে থাকেন। এ সময় তুরস্কের প্রেসিডেন্ট নাস্তিক কামাল পাশা। মুসলিম বিশ্বের মধ্যে কামাল পাশাই সর্বপ্রথম অত্যন্ত ন্যাক্কারজনকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের নামে রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মহীনতা চালু করেন। তার ইসলাম বিদ্বেষের মাত্রা এতই অধিক ছিল যে, তিনি তুরস্ক থেকে আরবী বর্ণমালা উৎখাত করার চেষ্টা করেন। ইসলামী পর্দাপ্রথা রহিত করেন। আন্তর্জাতিক ইসলাম বিরোধী মোড়লদের নির্দেশে কামাল

পাশা গোটা দেশে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী নগ্ন সভ্যতা আমদানী করে। তুরস্কের মুসলমানদের কোরআন-সুন্নাহ্ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার যাবতীয় ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করেন। একদিন ফজরের নামাযের আযানের শব্দে কামাল পাশার ঘুম ভেঙে গেল। বিরক্তি ভরে সে প্রহরীর কাছে জানতে চাইলো এভাবে আযান দিল কে। প্রহরী জানালো মসজিদের মুয়াজ্জিন আযান দিয়েছে। প্রহরীকে সে আদেশ করলো, উক্ত মুয়াজ্জিনকে গ্রেফতার করে তার সম্মুখে উপস্থিত করার জন্য। মুয়াজ্জিনকে গ্রেফতার করে তার সম্মুখে উপস্থিত করার পর কামাল পাশার আদেশে জল্লাদ তরবারীর আঘাতে মুয়াজ্জিনের দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে দিল।

কামাল পাশার এসব ঘৃণ্য কর্মকান্ডে বদিউজ্জামান নুরসী নিরবে দর্শকের ভূমিকা পালন করেননি। তিনি তাঁরই প্রকাশিত পত্রিকা 'নুর'-এর মাধ্যমে এবং ইসলামী আন্দোলনের বিপ্লবী সংগঠন ইত্তেহাদে মুহাম্মাদীর সহযোগিতায় কামাল পাশার ইসলাম বিরোধী ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ করতে থাকেন। ১৯২০ সনে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট কামাল পাশা মাওলানা বদিউজ্জামান নুরসীকে সম্মানের সাথে রাজধানী আঙ্কারায় স্বাধীনতা দিবসের উৎসবে যোগদানের আহ্বান জানান। নুরসী উৎসবে ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড দেখে দূর থেকেই উৎসব বর্জন করে আঙ্কারা ত্যাগ করেন। কয়েক দিন পর পরিষদ সদস্যেদের নামে এক দীর্ঘ বিবৃতি পরিষদে প্রেরণ করেন। বিবৃতিতে প্রথমেই তিনি বলেন– পরিষদ সদস্যবর্গ! মনে রেখ, একদিন তোমাদের সকলকে ঐ মহান আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হতে হবে। তোমাদের সকল কর্মকান্ডের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব তাঁর কাছে দিতে হবে।

এই বিবৃতির সাথে তিনি দশদফা স্মারকলিপি প্রেরণ করেন। স্মারকলিপিতে তিনি পরিষদের ইসলাম বিরোধী কর্মকান্ডের তীব্র সমালোচনা করে পরিষদের সদস্যবর্গকে আখিরাতের ভয়াবহ আযাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। এই পরিষদের প্রধান ছিলেন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট কামাল পাশা। পরিষদে নুরসীর বিবৃতি ও স্মারকলিপি পড়ে শোনান কাজেম কাররা বকর। এতে একটুকু সুফল হয় যে, পরিষদের ১৬০ জন সদস্য তওবা করে নামায আদায় শুরু করেন।

কামার পাশা সর্বদা চেষ্টা করতে থাকেন এই প্রতিভাধর বিজ্ঞ মনীষীকে নিজস্বার্থে ব্যবহারের জন্য। কিন্তু নুরসী বাতিল সরকারের কোন প্রলোভনেই অন্যায়ের কাছে মাথানত করেননি। ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির বিপরীত কিছু দেখলে নুরসী নির্ভীক কণ্ঠে প্রতিবাদ করতেন। শাসক গোষ্ঠীর রক্ত চক্ষু তিনি তোয়াক্কা করতেন না। তিনি আখিরাতের শাস্তির ভয়ে দুনিয়ার যে কোন শাস্তিকে তুচ্ছ মনে করতেন। তুরস্কের

বাতিল সরকার নুরসীর বিপ্লবী কণ্ঠের আগুনকে নিভিয়ে ফেলার জন্য তোষামদ থেকে শুরু করে সম্পদের প্রলোভন, মৃত্যুর ভয় কোন কিছুই বাকি রাখেনি। তবুও রক্ত পিচ্ছিল পথের এই সাহসী মুজাহিদকে সত্য পথ থেকে সামান্যতম বিচ্যুত করা সম্ভব হয়নি। প্রেসিডেন্ট কামাল পাশা নুরসীকে নিজ দলে টানার হীন উদ্দেশ্যে পুনরায় তাঁকে রাজধানী আঙ্কারায় আহ্বান জানান।

তিনি আঙ্কারায় আগমন করলে কামাল পাশা তাঁকে নিয়ে সরকারী কর্মকর্তাসহ এক আলোচনায় মিলিত হন। আলোচনার শুরুতেই মোস্তফা কামাল পাশা বদিউজ্জামান নুরসীকে লক্ষ্য করে বলেন– নিঃসন্দেহে আমরা আপনার মত এক সুযোগ্য শিক্ষাগুরুর মুখাপেক্ষী। আমরা আপনাকে এখানে ডেকে পাঠিয়েছি আপনার উত্তম ধ্যান-ধারণা থেকে শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে। কিন্তু আপনি প্রথমেই নামায আদায়ের পক্ষে বলা শুরু করেছেন। এতে করে আপনি আমার সরকারের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছেন।

কামার পাশার কথা শেষ হবার পূর্বেই আল্লাহর সিংহ গর্জন করে বলে উঠলেন– পাশা সাহেব, একজন মানুষ কালিমা পাঠ করে মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে তার উপরে প্রথমেই যে দায়িত্ব অর্পণ হয়, তাহলো নামাজ আদায়। যে ব্যক্তি নামাজ আদায় করে না সে বিদ্রোহী। আর বিদ্রোহীদের দ্বারা পরিচালিত সরকারকে কোন মুসলমান সমর্থন করতে পারে না।

ইমাম নুরসী যখন কামাল পাশাকে এসব কথা বলছিলেন, তখন মনে হচ্ছিল তাঁর কণ্ঠ গহ্বর থেকে যেন আগ্নেয়গিরি উত্তপ্ত লাভা উদগীরণ হচ্ছে। যে লাভা গোটা বাতিল শক্তির মিথ্যে দাপটকে চীরতরে কবর দেয়ার লক্ষ্যে প্রবাহিত হচ্ছে। ঈমানের বিপ্লবী আগুনে উত্তপ্ত ইমাম নুরসী প্রচন্ড ক্রোধে কাঁপতে থাকেন। পাশ্চাত্যের ক্রীড়নক কামাল পাশা নুরসীর তেজোদিপ্ত কণ্ঠের হুংকারে স্তম্ভিত হয়ে যান। তিনি পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে নুসরীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

বাতিল শক্তির অন্তর নিহিত দুর্বলতা যখন তার ভিত্তিকে কুরে খেয়ে নিঃশেষ করে দেয়, তখন তারা ইসলামী আন্দোলনের বিপ্লবী মুজাহিদদের কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য শক্তি প্রয়োগ করে। রক্ত পিপাসু নরঘাতক কাপালিকদের মতই বাতিল শক্তি হিংস্র হয়ে ওঠে। তাদের বিষাক্ত দন্ত-নখরের আঘাতে সত্যের সুষমা মন্ডিত নধর কান্তি কোমল পেলবকে মাধুরী মুক্ত করে, ঘনতমশাবৃত গভীর অরণ্যানীতে সত্যকে নির্বাসন দিতে উদ্যত হয়।

ধর্মহীন–ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী তুরস্কের বাতিল শক্তির প্রতিভূ কামাল পাশাও

ক্রমান্বয়ে এগিয়ে আসতে থাকে ইমাম নুরসীর ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারাবদ্ধ ইত্তেহাদে মুহাম্মাদীর কণ্ঠ রক্তাক্ত করে দেয়ার জন্য। মাওলানা বদিউজ্জামান নুরসীর তিন হাজার সঙ্গী-সাথীসহ তাঁকে কামাল পাশা অন্ধকার কারাগারে নিক্ষেপ করে তাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা দায়ের করে। কারাগারের তাঁদের সাথে পশুসুলভ ব্যবহার করা হয়।

দীর্ঘ ৮/ ৯ বছর কারাগারে অবর্ণনীয় নির্যাতন সহ্য করার পরেও মর্দে মুজাহিদদের মনোবল সামান্যতম শিথিল হয়নি। তাঁদেরকে যখন আদালতে বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত করা হয় তখন ইমাম নুরসী বজ্রকণ্ঠে বলতে থাকেন– মাননীয় বিচারক! আমাকে আজ এখানে এ অভিযোগের ভিত্তিতে উপস্থিত করা হয়েছে, আমি নাকি প্রগতি বিরোধী প্রাচীনপন্থী। সাম্প্রদায়ীক উত্তেজনা সৃষ্টি করে জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিই নাকি আমার লক্ষ্য। আমি স্পষ্ট কণ্ঠে বলতে চাই। আমি আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান ইসলাম, আল্লাহর যমীনে কায়েম করতে চাই। এ লক্ষ্য অর্জনে আমি ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে ইচ্ছুক। আমার যাবতীয় তৎপরতা আখিরাতের ময়দানের ভয়াবহ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে। বাতিল শক্তির সমস্ত মিথ্যা অপবাদ থেকে আমরা মুক্ত। আমার বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগের একটিই ভিত্তি আর তাহলো, আমি কেন ইসলামী আন্দোলন করি।

তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলতে থাকেন– আমার বিরুদ্ধে আপনাদের আরো অভিযোগ, আমার কর্মকান্ড সরকারের অনুকূল না হয়ে প্রতিকূলে যাচ্ছে। সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে অনুমতি গ্রহণ না করেই আমি দেশের জনগণের মধ্যে ইসলামের শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছি। আমি স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, যদি কবরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে পৃথিবী থেকে মৃত্যুর অস্তিত্ব বিলীন করে দেয়া সম্ভব হয়, তাহলে জাতিকে শিক্ষা-দীক্ষার ভার একমাত্র সরকারের শিক্ষা বিভাগের উপর ন্যস্ত করা যায়। আমি মানুষকে যে শিক্ষা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি, সে শিক্ষা দানের অনুমতি গ্রহণের কোন প্রয়োজন নেই। আল কোরআনের শিক্ষা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করবে কি করবেনা, সে অনুমতি পৃথিবীর কোন মানুষ দেয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে না। আল্লাহর কোরআন কারো মুখাপেক্ষী হওয়ার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়নি। যিনি কোরআন বুঝেন, তাঁর ঈমানী দায়িত্বই হলো পৃথিবীর মানুষকে কোরআনের দিকে আহ্বান করা। তিনি যদি এই দায়িত্ব পালন না করেন, তাহলে তাঁকে আল্লাহর শাস্তির কাছে নিজেকে সোপর্দ করতে হবে। সুতরাং আমি কোরআনের শিক্ষা প্রদানের জন্য পৃথিবীর কোন সরকারের কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করবো না। আর

এ ব্যাপারে সরকার যদি আমাদের ওপরে ক্ষুব্ধ হয়ে কোন অন্যায় আচরণ করে তাহলে আমরা মনে করবো, আমরা সত্য পথের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত আছি। কারণ আমরা যে পথ বেছে নিয়েছি, সে পথের প্রতিটি বাঁকে এ ধরনের কঠিন অবস্থা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

এ পর্যন্ত বলে ইমাম নুরসী তাঁর তিন হাজার সঙ্গীর দিকে শাহাদাত আঙ্গুলী দিয়ে ইশারা করে বললেন– আমরা সবাই কাপনের কাপড় পরিধান করেই এ পথে পা দিয়েছি। শাহাদাতের মৃত্যু যতই বিভীষিকাময় হোক না কেন আমরা তাকে প্রশান্ত বদনে স্বাগত জানাবো। আমরা প্রতিদিন মৃত্যুর দুয়ারে হাজিরা দিচ্ছি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে কখন সিদ্ধান্ত আসবে তার জন্যে প্রতীক্ষা করছি।

ইমাম নুরসীর বিরুদ্ধে গঠিত তদন্ত কমিশন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন প্রমাণ আদালতে উপস্থিত করতে পারেনি। কিন্তু তারপরেও সরকার তাঁকে আরো ১১ মাস কারাগারে বন্দী রাখে। দীর্ঘ ৮/৯ বছর কারাযন্ত্রণা ভোগ করার পরে সরকার তাঁকে মুক্তি দিয়ে কাস্তামুন প্রদেশে নজরবন্দী করে রাখে। সরকারের চরম দলন নীতি উপেক্ষা করে ইসলামী আন্দোলনের বিপ্লবী মুখপত্র 'নুর' তার ক্ষুরধার প্রকাশনার মাধ্যমে সরকারের ইসলাম বিরোধী কর্মকান্ডের তীব্র সমালোচনা করতে থাকে। এর হাজার হাজার কপি তুরস্কের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। নূর পত্রিকা জনগণকে ইসলামী বিপ্লবের জন্য ইত্তেহাদে মুহাম্মাদীতে সংগঠিত করতে থাকে।

তুরস্কের বাতিল শাসকগোষ্ঠী প্রমাদ গুণে। পুনরায় তারা ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কালো থাবা বিস্তার করে। মোস্তফা কামাল পাশা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, বদিউজ্জামান নুরসীর বিরুদ্ধে গুপ্ত সংস্থা গঠন, সরকারের বিরুদ্ধে জনগণকে উস্কানিদান, মোস্তফা কামালকে 'দাজ্জাল' বলার অপরাধে আদালতে মামরা দায়ের করা হবে।

দ্বীনি আন্দোলনের মুখপত্র 'নুর' পত্রিকার বিরুদ্ধে তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। তদন্ত কমিশনের সম্মুখে রক্তপিচ্ছিল পথের নির্ভীক যাত্রী ইমাম নুরসী আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলেন– আমরা মুসলমান, সমস্ত মুসলমান একই সংগঠনভুক্ত। এই সংগঠনের কর্মী সংখ্যা প্রতি শতাব্দীতে কোটি কোটি বৃদ্ধি পায়। প্রতিদিন তারা পাঁচবার তাঁদের সংবিধান আল-কোরআনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে 'নুর' পত্রিকা তো আল-কোরআনেরই বিধি-বিধান মানুষের সামনে তুলে ধরে। আর কোরআন হলো এমন এক অটল বাস্তবতা যার ভিত্তি মহান আরশে আযিমের সাথে সংযুক্ত। এমন

কোন শক্তির অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই, যে শক্তি আরশে আযিমের সাথে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করার সাহস রাখে।

তিনি মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করে নির্ভিক কণ্ঠে বাতির শক্তির সামনে স্পষ্ট ভাষায় বলেন– তোমরা পাশ্চাত্যের ধর্মহীন ভোগবাদী গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, নৈতিকতার বন্ধন ছিন্ন করে তোমরা ইসলামের সাথে শত্রুতায় লিপ্ত হয়েছো। যখনই ইসলামী আন্দোলন দেশের বুক থেকে অন্যায়-অসত্য, মিথ্যাচার, আল্লাহদ্রোহী নেতৃত্ব এবং মানুষের বানানো আইন-কানুন উৎখাত করে আল্লাহর আইন এবং সৎলোকের শাসন কায়েম করে জনগণকে একটি নিরাপত্তাপূর্ণ ভীতিহীন শোষনমুক্ত সুখী সমৃদ্ধশালী সমাজ উপহার দিতে চায়, তখনই তোমরা ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে নানা ধরনের কল্পিত কাহিনী প্রস্তুত কর। তোমারা মাথা দুলিয়ে বলতে থাকো, আমার আন্দোলন সাম্প্রদায়িক এবং সুবিধাবাদী নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

অনল বর্ষী বক্তা আল্লাহর পথের সৈনিক মাওলানা নুরসী বজ্রকণ্ঠে বলতে থাকলেন– আমি স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, তোমাদের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। তোমরাই সকল বিচারে সুবিধাবাদী নীতির ওপরে প্রতিষ্ঠিত এবং তোমাদের সকল কর্মকান্ড তুরস্ক থেকে ইসলামের শেষচিহ্ন মুছে দেয়ার লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে। তোমাদের হীন উদ্দেশ্য আর ইসলাম বিরোধী কলুষিত চেহারা রাজনীতির আড়ালের রেখে জনগণের জন্য কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করো। তোমরা মিথ্যে মুখোশ পরে জনদরদী সেজোছো এবং আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়াকে প্রাধান্য দিচ্ছ। তোমরা পার্থিব স্বার্থে নিজেদের বিবেককে ইসলামের আন্তর্জাতিক শত্রুদের কাছে বিক্রয় করে দিয়েছো। তোমাদের স্বাধীন বিবেকের মৃত্যু ঘটেছে। তোমাদের জিহ্বা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ভয়ে সর্বদা মিথ্যে বলায় ব্যস্ত। তোমরা ইসলামের দুশমন। একথা স্পষ্টভাবে জেনে রেখ, তোমরা আমাদের কিছুই করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করো না। সমস্ত ভালোমন্দের সিদ্ধান্ত আল্লাহর কাছে। তাঁর ওপরে ভরসা করে তোমাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছি, তোমরা নির্যাতনের যে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারো। আমরা আমাদের পথ থেকে বিন্দু পরিমাণ বিচ্যুত হবো না। ইসলামের অসংখ্য বিধানের মধ্যে মাত্র একটি বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য যদি নির্মম ফাঁসির মৃত্যুকে স্বাগত জানাতে হয়, তাহলে ফাঁসির রশিকে আলিঙ্গন করে আমরা শাহাদাতবরণ করতে প্রস্তুত রয়েছি।

সত্য ভাষণে ইসলামী আন্দোলনের নির্ভীক কণ্ঠ ইমাম নুরসীকে তুরস্কের আল্লাহদ্রোহী সরকার কারাগারে নিক্ষেপ করেও স্বস্তি পায়নি। অবশেষে সরকার তাঁকে বৃদ্ধ বয়সে স্পার্টাতে নির্বাসন দেয়। ইমাম নুরসী জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে

গনিমত মনে করে তা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যয় করে বাতিল শক্তির সাথে সংগ্রাম মুখর জীবন-যাপন করেছেন। অবর্ণনীয় নির্যাতন সহ্য করে আমৃত্যু ইসলামের বিজয় কেতন উচ্চে তুলে ধরেছেন। তাঁর অসীম ত্যাগ-তীতিক্ষার ফলেই তুরস্কে বর্তমানে ইসলামী আন্দোলন বাতিল শক্তির সকল রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দুর্বার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

ইমাম নুরসী তাঁর সারা জীবন ব্যয় করেছেন ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে সৎলোক তৈরী করে তাঁদের মাধ্যমে ইসলামী বিধান বাস্তবায়ন করার জন্য। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিনি পৃথিবীর সকল প্রলোভন ও অত্যাচার নির্মম পায়ে পদদলিত করে সাইক্লোনের গতিতে জিহাদের রক্তঝরা ময়দানে এগিয়ে গেছেন। আন্দোলনের ময়দানে জীবনের বয়স সন্ধিক্ষণে এই মহাপুরুষ স্পার্টাতে নির্বাসিত অবস্থায় ১৩৭৯ হিজরীর ২৭শে রমজান মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের ডাকে সাড়া দিয়ে নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করে আখিরাতের জীন্দেগীতে প্রবেশ করেন।

মৃত্যুর মুখোমুখি আল্লামা মওদুদী (রাহঃ)

রাসূলে আওলাদ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী ঐ মহান ব্যক্তির নাম– যিনি দুনিয়ার শত প্রলোভন, বাতিল শক্তির ভয়ঙ্কর রক্ত চক্ষু, কারাগারের অসহনীয় বন্দী জীবন আর ফাঁসির রশি উপেক্ষা করে ঘুমন্ত নরশার্দুল মুসলিম মিল্লাতকে জাগিয়ে তুলেছেন। এই ক্ষণজন্মা পুরুষ যে সময় ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদের সূচনা করেন সে সময় গোটা বিশ্বব্যাপী চলছে বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের দোর্দন্ড প্রতাপ। সারা ভারতবর্ষ আধিপত্যবাদী ইংরেজদের অধীন । মুসলমানদের ওপরে চলছে হিন্দু ও ইংরেজীদের দলন নীতি। ইসলামকে স্বমূলে উৎখাত করার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ইসরামী শব্দ, মুসলিম নাম-পদবী ইত্যাদিকে বিদ্রূপের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করা হয়েছে। হিন্দুদের পক্ষ থেকে আল্লাহর রাসূলকে গালি দিয়ে-কুৎসা গেয়ে সাহিত্য রচিত হচ্ছে। মিস্টার গান্ধীসহ অন্যান্য হিন্দু নেতাদের পক্ষ থেকে জিহাদের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হচ্ছে 'মুসলমানদের ইতিহাস থেকে রক্তের গন্ধ আসে'।

কৈশর পেরিয়ে মাওলানা মওদুদী তখন সবে মাত্র যৌবনে পা দিয়েছেন। সুঠাম সুন্দর দেহের এক যুবক তিনি। মুসলমানদের এই দূরাবস্থা এবং ইসলামের অবমামননা দেখে তিনি আহত সিংহের ন্যায় গর্জে উঠলেন। 'আল জিহাদ' নামক

এক বিশাল গ্রন্থ রচনা করে অমুসলিমদের অপপ্রচারের দাঁতভাঙা জবাব দিলেন। পাশ্চাত্যের নগ্ন সভ্যতা আমদানী করে গোটা দেশকে নোংড়ামীর মধ্যে ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে। যুবক মওদুদী ইচ্ছে করলে ভোগ বিলাসীতার গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু না! মওদুদীর জন্মই হয়েছে ইসলাম বিরোধী শক্তির সাথে সংগ্রাম করার জন্য। তিনি তো দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেন না। তিনি মানব রচিত মতবাদ, পূজিবাদ, সাম্যবাদ, তথাকথিত সমাজতন্ত্রসহ ইত্যাদি মতবাদের ক্ষতিকর দিকসমূহ বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা চুলচেরা বিশ্লেষণ করে লেখনীর মাধ্যমে মানব জাতির সামনে উত্থাপন করলেন। আল্লাহর বিধান ও আল্লাহভীরু নেতৃত্বের অভাবই যে মানব জাতির যাবতীয় দুঃখ কষ্টের মূল কারল, একথা মাওলানা মওদুদী পৃথিবীর সামনে তুলে ধরলেন।

সে সময় আরো একটি মরাত্মক ফেৎনা মুসলমানদের ঈমানের জন্য হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছিল। সে ফেৎনাটি ছিল মিথ্যা নবুয়্যাতের দাবিদার মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর খতমে নবুয়্যাতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার। ইসলামের শত্রুদের পক্ষ থেকে প্রচুর ধন-সম্পদ গ্রহণ করে এই মীর্জা গোলাম আহমদ মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল ধরানোর অপচেষ্টায় নিজেকে নবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কোরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা দিতে থাকে।

ইতোমধ্যে মুসলমানদের পৃথক আবাস ভূমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন সফলতার দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়েছে। বর্ণবাদী হিন্দুরা সুযোগ বুঝে মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল ধরানোর জন্য কিছু সংখ্যক ভাড়াটিয়া আলিমদেরকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। কয়েকজন বিখ্যাত আলিম ইসলামের সামগ্রীক রূপ দর্শনে অপারগ হয়ে এক হটকারী ফতোয়া দিয়ে বসেন। তাঁরা ফতোয়া দিলেন, 'হিন্দুস্তানের সকল মানুষই এক জাতীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ'।

এই ফতোয়া পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে হিন্দুরা মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করলো। তখন আল্লামা মওদুদী 'মাসায়েলে কাওমিয়াত'-নামক কোরআন-হাদীসের তথ্য ভিত্তিক একটি বই লিখে, এই মারাত্মক বিপদ থেকে উপমহাদেশের মুসলমানদের হেফাজত করার ব্যবস্থা করেন। এরই ফলশ্রুতিতে অনেক রক্তের বিনিময়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে পৃথিবীর মানচিত্রে পাকিস্তান স্থান করে নিল। মাওলানার রচিত উক্ত মাসায়েলে কাওমিয়াত উর্দু ভাষায় লেখা হয়েছিল। বর্তমানে বাংলায় অনুবাদ হয়েছে। বাংলা ভাষায় অনুবাদকৃত গ্রন্থটির নাম হলো ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ।

কিন্তু শাসক গোষ্ঠীর বিশ্বাস ঘাতকতার জন্য মুসলমানরা কোরআন-হাদীসের শাসন থেকে বঞ্চিত হলো। পৃথিবীর বাতিল শক্তি বহু পূর্ব থেকেই মাওলানা মওদুদীকে ভীতির চোখে দেখত। তিনি যখন স্বাধীন মুসলিম দেশে অবস্থান করে ইসলামী আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত করলেন তখন তারা প্রমাদ গুনলো। পাশ্চাত্যের খৃষ্ট শক্তি তাদেরই ক্রীড়নক পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর ওপরে চাপ সৃষ্টি করলো, মাওলানা মওদুদী ও ইসলামী আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য। কাদিয়ানীরাও ক্রমাগত ভাবে সহজ-সরল মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করে যাচ্ছে। মওলানা মওদুদী (রাহঃ) তখন কোরআন-হাদীসের আলোকে খতমে নবুয়্যাত সম্পর্কে একটি বই লিখলেন। বাংলা ভাষায় অনুবাদকৃত বইটির নাম 'কাদিয়ানী সমস্যা'। বইটি প্রকাশ হবার পরে ইসলামী বর্জিত সাধারণ মুসলমানরা কাদিয়ানীদের ঘৃণ্য তৎপরতা অনুধাবন করতে সক্ষম হলো । খতমে নবুয়্যাত সম্পর্কে মাওলানার রচিত বইটি মুসলমানদের ঈমানের রক্ষা কবজ হিসেবে ভূমিকা পালন করছে।

এই বইটিকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের বিশ্বাঘাতক শাসক গোষ্ঠী খোঁড়া অজুহাতে আল্লামা মওদুদী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করলো এবং ইসলামী আন্দোলনের আবাল বৃদ্ধ বনিতাদের অপ্রতিরোধ্য কাফেলা জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলো। মাওলানা মওদুদী ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের বিরুদ্ধে চললো বিচারের নামে প্রহসন। গোটা দুনিয়ার সামনে আল্লামা মওদুদী ও দ্বীনি আন্দোলনকে অভিযুক্ত করার জন্য চেষ্টার কোন ক্রটিই রাখলো না ইসলামের দুশমনেরা। তথাকথিত বিচারের রায় যখন আল কোরআনের সিপাহ্সালার আল্লামা মওদুদীকে শোনানো হলো তখন মাগরিবের নামাজের সময়। ১৯৫৩ সনের ৮ই মে মাওলানা মওদুদী তখন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কুদরতীর পদপ্রান্তে সিজদায় লুটিয়ে পড়েছেন। নিজের সমস্ত সত্তাকে বিশ্ব প্রভুর কাছে নিবেদন করেছেন। নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর এত কাছে তিনি পৌছেছেন যে, তাঁর মুখমন্ডলে নেই কোন উৎকণ্ঠা। একমাত্র প্রিয় বন্ধু আল্লাহর নামের তসবিহ তাঁর জপমালা।

ঠিক সেই মুহূর্তে সিংহদীল মর্দে মুজাহিদ শতাব্দীর মুজাদ্দিদকে শোনানো হলো ফাঁসির আদেশ। ইসলামের জন্য প্রাণ দানের এই অপূর্ব সুযোগকে তিনি অত্যন্ত সৌভাগ্য বলে মনে করলেন। দ্বিধাহীন চিত্তে মুখে মধুর হাসি ফুটিয়ে তিনি তাঁর মৃত্যুদন্ডাদেশ শ্রবণ করলেন। সেই মুহূর্তের প্রতিটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন জনাব সাইয়েদ নকী আলী। তিনি কাদিয়ানী সমস্যা নামক পুস্তকের প্রকাশক ও মুদ্রাকর। তিনি সেদিনের ঘটনার বর্ণনা এভাবে পেশ করেছেন–

১৯৫৩ সনের ৮ মে। দেওয়ানী ঘরের প্রাচীন টেনিস কোর্টে আমরা মাগরিবের নামায আদায় করছিলাম। নামাযের ইমাম ছিলেন মাওলানা মওদূদী। মুক্তাদিদের মধ্যে জেলের নম্বরদার এবং বাবুর্চি ছাড়াও আমরা পাঁচজন ছিলাম। মিয়া তোফাইল মুহাম্মাদ, মাওলানা আমিন আহসান ইসলাহী, মালিক নসরুল্লাহ খান আজিজ, চৌধুরী মুহাম্মাদ আকবর এবং আমি। আমরা যখন নামাযের দ্বিতীয় রাকাআতে তখন হঠাৎ করে দরজা খুলে গেল এবং কয়েক জনের পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। সামান্য কিছু কথার শব্দ, আবার চলে যাওয়ার আওয়াজ। সুন্নাতের সালাম ফিরাতে না ফিরাতেই আবার শোনা গেল পায়ের আওয়াজ। কয়েকজন সৈনিক এবং জেলখানার কর্মচারীকে ভিতরে প্রবেশ করতে দেখা গেল।

একজন জিজ্ঞাসা করলো– মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী কে?

ধির স্থীর কণ্ঠে মাওলানা বললেন– এই যে আমি বলুন।

সরকারী কর্মচারী জানালো– তাছনীম সংবাদপত্রে দুটি বিবৃতি প্রকাশের জন্য আপনার সাত বছর জেল এবং মালিক নসরুল্লাহ খাঁন আজিজের তিন বছরের জেল।

মাওলানা মওদূদী ও মালিক নসরুল্লাহ খাঁন আজিজ জবাব দিলেন- আচ্ছা ঠিক আছে।

সরকারী কর্মচারী পুনরায় বললো– কাদিয়ানী সমস্যা নামক পুস্তক প্রণয়নের জন্য মাওলানা মওদূদীর মৃত্যুদন্ড ও সাইয়েদ নকী আলীর নয় বছর সশ্রম কারাদন্ড।

আমরা উভয়ে আচ্ছা ধন্যবাদ বলে নীরব রইলাম। মাওলানার ফাঁসির আদেশ আমাদের কাছে ছিল একেবারে অপ্রত্যাশিত। উপস্থিত কারো চোখে মুখে কোন দুঃশ্চিন্তার চিহ্ন দেখা গেল না। কিন্তু আমরা সবাই মাওলানার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লাম। আমরা সবাই মাওলানার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, সেখানে নেই কোন চিন্তার লক্ষণ। প্রশান্ত সুন্দর সাম্যের উজ্জ্বল প্রতিমূর্তি আমাদের সামনে বসে প্রভা বিকিরণ করছে। গহীন সমুদ্রের অসীম গভীরতায় মাওলানার চেহারার সৌন্দর্য যেন বৃদ্ধি করেছে। সুন্দর শশ্রুমন্ডিত উজ্জ্বল চেহারার অধিকারী মাওলানার দৃষ্টিতে জান্নাতী চম্‌কাচ্ছে। তিনি যেন সেই দৃষ্টি দিয়ে ভবিষ্যতের গর্ভ চিরে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন– সত্যের বিজয় অনিবার্য।

জেল কর্মচারী এক টুকরো সাদা কাগজ মাওলানার হাতে দিয়ে বললো– মাওলানা ইচ্ছে করলে আপনি এক সপ্তাহের মধ্যে সরকারের কাছে প্রাণ ভিক্ষার আবেদন করতে পারেন।

মাওলানা ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটিয়ে কাগজের টুকরোটি হাতে নিলেন। জেল কর্মচারী চলে যাওয়ার সময় বলে গেল– মাওলনা! প্রস্তুত হোন। আপনাকে একটু পরেই যেতে হবে।

মাওলানার হাসি মুখে জানতে চাইলেন– কোথায়?

জেলের কর্মচারী জানালো– ফাঁসির সেলে।

মাওলানা নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন– আমি প্রস্তত রয়েছি।

এরপর আমরা নিরবে দেওয়ানী ঘরের কামরার দিকে চললাম। জেল কর্মচারী আবার বললো– মালিক নসরুল্লাহ খান আজিজ এবং সাইয়েদ নকী আলীকেও যেতে হবে।

কিছুক্ষণ পর কি মনে করে জেলের কর্মচারী বললো– থাক, আপনাদের কাল সকালেই নিয়ে যাবো।

আমাদের শ্রবণ ইন্দ্রিয় তখন কোন কথা শোনার উপযোগী ছিল না। কারণ মাওলানার ফাঁসির আদেশ শোনা মাত্র আমাদের মন-মানসিকতা এতই অস্থির হয়ে পড়েছিল যে, অন্য কোন দিকে আমাদের কোন লক্ষ্য ছিল না। পৃথিবীর নাট্যশালায় ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের কতই না লাঞ্ছনা, কত আঘাত বুক পেতে সইতে হয়। কত যন্ত্রণার সিঁড়ি অতিক্রম করে সম্মুখ পানে এগিয়ে যেতে হয়, কন্টকাকীর্ণ পথের মাঝেও বিষাদ সিন্ধু পাড়ি দিতে হয়। এ আন্দোলনের পথের দাবি তো এটাই। তাই মনকে শক্ত করার চেষ্টা করছিলাম। আমরা সবাই ইসলামের নগন্য সেবক মাত্র। সত্য পথের যাত্রীদের পথে চলার সৌভাগ্য লাভের চেষ্টায় আছি। আমাদের অপরাধ কি! কাদিয়ানী সমস্যা বই লিখা ও প্রকাশ! এতো শুধু পৃথিবীর মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বলা হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তো ভিন্ন। আমাদের অপরাধ হচ্ছে আমরা পাকিস্তানের জনগণ ও সরকারকে ইসলামের পক্ষে ব্যবহার করতে চাই। আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েম করাই আমরা আমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বানিয়ে নিয়েছি। বাতিল শক্তির কাছে এটাই আমাদের অপরাধ।

মাওলানা মওদুদীকে ফাঁসির সেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এ দৃশ্য কি সহনীয় না বর্ণনা করা যায়! এমন ক্ষনজন্মা পুরুষ, যিনি শুধু ভারতীয় উপমহাদেশেই নয়-গোটা মধ্যপ্রাচ্যেও বিরাট সম্মানের পাত্র, তিনি আজ ফাঁসির কুটুরিতে! এ যেন এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদকে আজ ফাঁসিতে ঝুলানো হবে! উপমহাদেশের শিশু ইসলামী আন্দোলন তার শৈশবেই এমন মহান ব্যক্তির

খেদমত থেকে বঞ্চিত হবে! আমি ভাবছিরাম একি সত্য ঘটনা না স্বপ্ন? পাকিস্তানের জালিম শাসক গোষ্ঠী একি করতে যাচ্ছে? তারা ইসলামের বিজয় দেখতে চায় না। তাই তারা এ ধরনের অবাঞ্চিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে যাচ্ছে।

আমার মনে এ ধরনের অনেক কথার আনাগোনা চলছিল। হঠাৎ মাওলানা মওদুদীর কথায় বাস্তবে ফিরে এলাম। তিনি মর্দে মুজাহিদের মত ধির শান্ত অকম্পিত কণ্ঠে স্পষ্ট ভাষায় বললেন– এ কথা আপনারা অবশ্যই স্মরণে রাখবেন, আমি কোনো অপরাধ করিনি। আমার পক্ষ থেকে অন্য কেউ যেন ক্ষমার আবেদন না করে- না আমার মা, না আমার ভাই, না আমার স্ত্রী-পুত্র পরিজন। সংগঠনের কাছেও আমার একই আবেদন।

মিয়া তোফাইল মুহাম্মাদ সাহেব মাওলানার হোলড্ অল খুলে বিছিয়ে দিলেন। আমরা সকলে মিলে তার মধ্যে জিনিষপত্র ভরতে লাগলাম। চামড়ার সুটকেসটা মাওলানা এবং আমি মিলে সাজিয়ে ফেললাম। এ সবের আর প্রয়োজন নেই। সবই বাড়িতে পাঠাতে হবে। মাত্র একটি ছোট বিছানা মাওলানার সাথে ফাঁসি কক্ষে পাঠানোর জন্য প্রস্তুত করা হলো। একটি কাপড়ে বাঁধা খাবার, কোরআনে হাকিম এবং থালা-গ্লাসও এ সবের সাথে দেয়া হলো।

আমি যেন বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছি। হৃদয় কাঁপছিল। শরীরে কোন শক্তি পাচ্ছি না। মাওলানার মৃত্যুদন্ডের আদেশ আমার শিরা উপশিরায় ধাবমান রক্ত কণিকাগুলো তীব্র প্রতিবাদ করছিল। তোফাইল সাহেবের অবস্থা আরো করুণ। মালিক নসরুল্লাহ খাঁন আজিজ তাঁর ভাবগম্ভীর মূর্তি নিয়ে পায়চারী করছিলেন। তাঁর কম্পিত কণ্ঠ দিয়ে আল্লাহ নামের তসবিহের আওয়াজ আসছিল। বয়োবৃদ্ধ চৌধুরী মুহাম্মাদ আকবর সাহেবের অবস্থা ছিল ঝড়ের প্রাক্কালে শান্ত সমুদ্রের মত। তিনি ছিলেন নির্বাক নিস্তব্ধ। ইসলাহী সাহেব হাত দুটি পিছনে করে কখনো পায়চারী করছেন কখনো বা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছেন। তাঁর দমিত আবেগ-উচ্ছাস রক্তবর্ণ ধারণ করে চোখ মুখ দিয়ে যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

বিছানা পত্র বাঁধতে বাঁধতে মনকে শক্ত করে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলাম– মাওলনা! প্রাণ ভিক্ষা না চাওয়ার সিদ্ধান্ত তো আপনার একান্ত নিজস্ব। এ সিদ্ধান্ত যে জামায়াতকে মেনে নিতে হবে তার কোন যুক্তি নেই। জামায়াতের মজলিশে শুরা অবস্থা বিবেচনা করে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তা আপনাকে গ্রহণ করতেই হবে।

মাওলানা অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন– আমি জামায়াতে ইসলামীর দৃষ্টিতেও আমার

এ সিদ্ধান্ত সঠিক মনে করি। আমার এ সিদ্ধান্ত জামায়াত নেতৃবন্দৃকে জানিয়ে দেয়া আপনাদের কর্তব্য।

ইতোমধ্যে মাওলানাকে ফাঁসির কুঠুরীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য জেলের কর্মচারী এসে উপস্থিত হলো। আমাদের সবার অবস্থা ছিল এমন আগ্নেয়গিরি মত যে আগ্নেয়গিরি একটু পরেই উত্তপ্ত লাভা উদগীরণ করবে। আর মাওলানা! অন্ধকারের ঘোর অমানিশায় মানুষকে আলোর পথ দেখানো জন্য যিনি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জ্বালানো প্রদীপ হাতে দন্ডায়মান হলেন, যাঁকে শাহাদাতের দুর্লভ মর্যাদার অধিকারী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, তিনি হিমাচলের মতই শান্ত স্নিগ্ধ, ধরিত্রীর মতই অবিচল। এই কঠিন মুহূর্তেও শ্যামল বসুন্ধরার মতই চীর উজ্জ্বল তার পবিত্র মুখচ্ছ বি।

মাওলানা আমাদের সাথে প্রাণভরে কোলাকুলি করলেন। এটা শুধু কোলাকুলি ছিল না। এ যেন ছিল হারানো সন্তান ফিরে পাওয়ার মমতাময় উষ্ণ আবেশ। মায়ের বিরহী হিয়ায় মরমীয় আরাম। জিনিষপত্র কিছুটা আমরা ও কিছুটা জেলের নম্বরদার নিল। কামরা থেকে বেরিয়ে দেওয়ানী ঘরের দরোজা পর্যন্ত গিয়ে প্রিয় নেতা আল্লামা মওদুদীকে শেষ বিদায় জানালাম। অনেক পূর্বেই হৃদয়ের আকাশে বিষাদের যে কালো মেঘ স্তরে স্তরে জমাট বেঁধে ছিল, এখন তা চোখ দিয়ে শ্রাবণের বারি ধারার মতই প্রবাহিত হলো। আমাদের কান্না যেন ক্রন্দসী আকাশের মতই বারিবর্ষণ করে চলেছে। আমরা সকলেই আল্লাহর দরবারে সিজদায় লুটিয়ে পড়েছি। চোখের পানির প্লাবন সৃষ্টি হলো। জেল কর্মচারীর আওয়াজে মাথা তুলে দেখি মাওলানার শরীরে যে পোষাক ছিল সে পোষাক, কোরআন মজিদ, জুতা ও অন্যান্য জিনিসপত্র জেল কর্মচারী ফেরৎ এনেছে। ফাঁসির কুঠুরিতে কোরআন রাখার কোন জায়গা নেই। তাই কোরআন মজিদও ফেরৎ এনেছে।

আমরা সবাই চোখে মুখে বুকে মাওলানার পোষাকের স্পর্শ গ্রহণ করতে লাগলাম। কারণ এ কাপড় এমন এক মহামনীষীর শরীরে ছিল যিনি আল্লাহর পথের জিন্দাদীল মুজাহিদ, যিনি শাহাদাতের অমর পেয়ালা পানের আকাংখায় অস্থির, যিনি শাহাদাতের অমিয় সঞ্জিবনী সুধা পানের অদম্য বাসনা নিয়ে ফাঁসির কুঠুরীতে অপেক্ষামান। মাওলানার কাপড় আমাদের ব্যথা ভরা নয়নের জলে সিক্ত।

মাওলানার প্রতি আমাদের এই যে আন্তরিক মায়া মমতা ভালোবাসা, তা কি এই জন্য যে, তিনি আমাদের রক্ত সম্পর্কের কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়? এ মমতা কি এক বর্ণ গোত্র হওয়ার কারণে? এ ভালোবাসা কি একই দেশের অধিবাসী হওয়ার কারণে?

না! এসব কোন কারণে আমাদের মধ্যে এই স্বর্গীয় প্রেম সৃষ্টি হয়নি। আমাদের মধ্যে পরস্পরের সেতু ছিল ইসলাম। ইসলামই আমাদের পরস্পরকে এত কাছাকছি নিয়ে এসেছে। ইসলামই আমাদের হৃদয়কে পরস্পরের সাথে বিনিময় করতে বাধ্য করেছে।

আল্লাহর প্রতি মাওলানার অসীম নির্ভরতা, ইসলামের জন্য প্রাণ দান করার অদম্য আগ্রহ পৃথিবীকে স্তম্ভিত করলো। জেল খানার কর্মচারীরা এবারই বোধহয় প্রথম দর্শন করলো আল্লাহর পথের পথিকদের দৃঢ়তা এবং রক্ত পিচ্ছিল পথের যাত্রীদের আল্লাহভীরুতা। তাদের কণ্ঠও অবাক বিস্ময়ে বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো। মাওলানা এবং জামায়াতে ইসলামীর প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত করতে তাঁরা বাধ্য হলো। ফাঁসির কক্ষে মাওলানা মওদুদীকে পরিধান করতে দেয়া হলো ফিতাবিহীন পায়জামা। জেল কর্মচারীর কাছেতিনি জানতে চাইলেন– ফিতা দিতে কি ভুলে গেছ?

জেল কর্মচারী উত্তরে জানালো– মাওলানা! ফাঁসির আসামীকে ফিতা দেয়া হয় না। যদি আসামী মানসিকভাবে হতাশ হয়ে তা দিয়ে আত্মহত্যা করে বসে?

মাওলানা স্নিগ্ধ হাসি দিয়ে বললেন– যে ব্যক্তি প্রাণভরে শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করে আল্লাহর জান্নাতে যাবার সুযোগ পেয়েছে, সেকি এমনই পাগল যে, আত্মহত্যা করে জাহান্নামে যাবে?

ফাঁসি কক্ষে মাওলনা ধির স্থির শান্ত। চেহারায় কোন চিন্তার রেখা নেই। মনে হচ্ছে শিশু যেন স্নেহের নীড় আপন গর্ভজাত মা জননীর মমতার ছায়াতলে আসন গ্রহণ করেছে। আল্লাহর পথে মুজাহিদ শাহাদাতের অমূল্য মর্যাদা লাভের আশায় এতদিন অস্থির ছিলেন, আজ সেই সৌভাগ্য নিজ থেকে এসেই পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছে। আনন্দে হৃদয়-মন ভরপুর। কাছে কোরআন মজিদ নেই, বালাকোটের শহীদ সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী (রাহঃ)-এর জীবনী পড়তে পড়তে আল্লামা মওদুদী (রাহঃ) পরম সুখে নিদ্রা গেলেন। আপন বাসগৃহের নিদ্রা আর ফাঁসি কক্ষের নিদ্রায় কোন পার্থক্য নেই।

কোরআনের সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিয়োজিত লোকদের জন্য কি অপূর্ব দৃশ্য! আল্লাহর পথে প্রাণ উৎসর্গ করে জান্নাতে পরম আরামদায়ক বিছানায় যিনি গভীর তৃপ্তি নিয়ে অবস্থান করছেন, আর তাঁরই সংগ্রাম মুখর জীবনী পাঠ করছেন তাঁরই পথের এই সৌভাগ্যবান পথিক শাহাদাতের মর্যাদাপ্রাপ্ত শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (রাহঃ)।

বিরহ কাতর বেদনা বিধুর আত্মীয়-স্বজন মাওলানার মৃত্যুদন্ডাদেশ শুনে তাঁকে

দেখতে এসে চোখের পানি ফেলছে। আর মাওলানা তাঁদেরকে সান্তনা দিয়ে বলছেন– জীবন মৃত্যুর সিদ্ধান্ত আসমানে হয় যমীনে হয় না।

ঈমানের শক্তি কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হলে জীবনের চরম মুহূর্তেও মুখ দিয়ে এমন কথা উচ্চারিত হতে পারে? ফাঁসি কক্ষে অবস্থান সম্পর্কে মাওলানা নিজেই বর্ণনা করেছেন এভাবে– দেওয়ানী ঘরের মধ্যে আমাকে যখন ফাঁসির আদেশ শোনানো হলো এবং সেই সাথে এক সপ্তাহ সময় দেয়া হলো প্রাণ ভিক্ষা চাওয়ার জন্য, তখন আমার মনে তিন ধরনের চিন্তা এলো। প্রথম চিন্তা ছিল, এই জালিমের কাছে করুণা ভিক্ষা চাওয়া আমার মত মানুষের জন্য আত্মমর্যাদার বিপরীত। দ্বিতীয় চিন্তা ছিল, আমি কোন্ অপরাধের কারণে ক্ষমতা প্রার্থনা করবো? তা কি এ জন্য যে, কেনো আমাকে জোর করে জান্নাতে পাঠানো হচ্ছে? সারা জীবন ইসলামের খেদমত করে আল্লাহর জান্নাতে যাবার যতটা নিশ্চয়তা নেই, ততটা নিশ্চয়তা আছে শাহাদাতবরন করে। অতএব আমি এ জন্য আবেদন করবো যে, আমাকে জান্নাত থেকে মুক্তি দাও? তৃতীয় চিন্তা এটাই ছিল যে, আজ আমার মত মানুষ যদি ইসলামী আন্দোলন করার অপরাধে (?) ক্ষমা চায় তাহলে এ দেশের সাধারণ মানুষের হৃদয় থেকে আত্মমর্যাদা বোধের বিলুপ্তি ঘটবে। এই চিন্তা করে আমি আমার আত্মীয়-স্বজন, জামায়াতের লোকজনকে, পরিচিত জনদেরকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছিলাম তাঁরা যেন ক্ষমার আবেদন না করে। যদি করে তাহলে তাঁদেরকে আমি কোনদিনই ক্ষমা করবো না।

আল্লামা মওদুদী (রাহঃ)-এর প্রাণাধিক পুত্র-পিতার সাথে দেখা করতে এলে তিনি পুত্রকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন– বাবা জীবন মৃত্যুর সিদ্ধান্ত আল্লাহর দরবারে হয় পৃথিবীতে হয় না। ক্ষমা চাওয়ার অর্থই হলো, আল্লাহ আমাকে যে বিরাট মর্যাদা দান করতে চাইছেন আর আমি আল্লাহর এই নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করছি।

ইসলামী আন্দোলনের মর্দে মুজাহিদ ফাঁসির কক্ষেও আপন সিদ্ধান্তে যখন ঐ তুষার আবৃত হিমালয়ের গগন চুম্বি উচ্চ শিখরের মত মাথা উঁচু করে আছেন, তখন তার কাছে একজন ছুটে এসে সংবাদ দিল সরকার নিজেই মৃত্যুদণ্ড বাতিল করে দিয়েছে।

মাওলানা মওদুদী (রাহঃ) তাঁর গোটা জীবনকালই ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতের খেদমতে নিয়োজিত রেখেছিলেন। খত্মে নবুওয়্যাতের প্রশ্নে কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনে তিনি ছিলেন আপোষহীন। খত্মে নবুওয়্যাতের পক্ষে ও কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করার কারণে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তাঁকে

গ্রেফতার করে অন্ধকার কারাপ্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করেছিলো এবং বিচারের নামে প্রহসন করে তাঁর প্রতি ফাঁসির আদেশ জারী করেছিলো। কিন্তু খত্‌মে নবুওয়্যাতের ব্যাপারে তাঁর বিশ্বাসে সামান্যতম ফাটল্‌ ধরানো সম্ভব হয়নি। এ ব্যাপারে সরকার তাঁকে ক্ষমা প্রার্থনার আহ্বান জানালে তিনি ঘৃণাভরে সরকারের সে অনুকম্পা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

খত্‌মে নবুওয়্যাতের ব্যাপারে তাঁর দৃঢ় আকীদা-বিশ্বাস, মতামত ও বক্তব্যে তিনি ছিলেন অনঢ়। মহান আল্লাহর অসীম রহমতে সরকার পরবর্তীতে ফাঁসীর আদেশ কার্যকর করতে সাহসী হয়নি। সৌদী আরবের বাদশাহ্‌ ফায়সাল মাওলানা মওদুদী (রাহঃ)-এর হাতে কা'বা শরীফের গিলাফ উঠিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি নিজ হাতে সে গিলাফ কা'বা ঘরে পরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ইন্তেকালে গোটা মুসলিম জাহান শোকার্ত হয়ে পড়েছিলো। মক্কা ও মদীনা শরীফের উভয় হরম শরীফেই তাঁর উদ্দেশ্যে গায়েবানা নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। মাওলানা মওদুদী (রাহঃ)-এর প্রতি এ ধরনের দুর্লভ সম্মান ও মর্যাদা তাঁর দ্বীনি খেদমতেরই স্বীকৃতি। এ ছাড়াও তিনি ছিলেন আওলাদে রাসূল– নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধর। তিনি তাঁর গোটা জীবনকাল কোরআন-সুন্নাহর বিধান প্রতিষ্ঠা ও মুসলিম মিল্লাতের কল্যাণ চিন্তায় অতিবাহিত করেছেন। কুফ্‌রী মতবাদ-মতাদর্শের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম মুখর ছিলেন বিধায় তাঁর প্রতি শত্রুতা পোষন করা আল্লাহর রাসূলের হাদীসের খেলাফ কাজ। এসব দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং তাঁর সুমহান কর্মের প্রতি স্বীকৃতি স্বরূপ সৌদী আরবসহ আরব দেশসমূহের নেতৃস্থানীয় সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ও ওলামা-মাশায়েখগণ তাঁর সাথে খুবই সম্মানসূচক ব্যবহার করেছেন।

মাওলানা মওদুদী (রাহঃ)-এর ক্ষুরধার লেখনী ইসলামী চিন্তা-চেতনা বিরোধী মুসলিম জনগোষ্ঠীর মন-মানসেই শুধু নয়– অমুসলিম চিন্তাবিদদের মন-মানসেও আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এ কথা তারা অনুভব করছে এবং স্বীকার করতেও বাধ্য হয়েছে যে, ইসলাম শুধুমাত্র একটি ধর্মের নাম নয়– ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। শুধু তাই নয়, অন্যান্য মতবাদ ও মতাদর্শ জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে যেসব নিয়ম-নীতি ও পদ্ধতি পেশ করেছে, তা ইসলাম কর্তৃক প্রদর্শিত নিয়ম-নীতির তুলনায় একান্তই হীন, নগণ্য ও মানব জাতির জন্য ক্ষতিকর। পাশ্চাত্যের ভোগবাদী ধর্মহীন গনতন্ত্র, প্রতীচ্যের নাস্তিক্যবাদী সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীন ব্যবস্থা ইত্যাদি মতবাদগুলো যে মানব জাতির জন্য একান্তই ক্ষতি ও অকল্যাণকর, ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর এবং এসব মতবাদের মোকাবেলায় ইসলামই যে মানবতার

একমাত্র মুক্তির সনদ, এ বিষয়টি মাওলানা মওদুদী (রাহঃ) অকাট্য যুক্তি ও হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনার মাধ্যমে মানুষের সামনে উপস্থান করেছেন।

শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (রাহঃ) বাতিল শক্তির সম্মুখে এক মুহূর্তের জন্যও মাথানত করেননি বলেই আজ– তাঁরই অবদান ইসলামী আন্দোলনের সর্ববৃহৎ সংগঠন জামায়াতে ইসলামী এক অপ্রতিরোধ্য দুর্জয় কাফেলা। শাহাদাতের রক্ত পিচ্ছিল পথে দৃপ্ত কদমে জামায়াতে ইসলামী মনজিলের দিকে এগিয়ে চলেছে। এমন শক্তির অস্তিত্ব বর্তমানে পৃথিবীতে নেই, যে শক্তি জামায়াতে ইসলামীর গতি পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে সক্ষম।

শহীদী গোলাপের স্নিগ্ধ পাঁপড়ী

আমি কোথায় কিভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করছি, এটা আমার মাথা ব্যথার কারণ নয়। আমি যে মুসলমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করার সুযোগ পাচ্ছি এটাই আমার সবথেকে বড় গর্বের বিষয়।

কথাগুলো বলেছিলেন, মিশরে কোরআনের সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বিপ্লবী বীর মুজাহিদ আব্দুল কাদের আওদাহ (রাহঃ)। তাঁকে যখন ফাঁসির মঞ্চের দিকে নেয়া হচ্ছিল, তখন তিনি দৃপ্তকণ্ঠে উল্লেখিত কথাগুলো বলতে বলতে ফাঁসির রশি কণ্ঠে ধারন করেন। রক্ত পিচ্ছিল পথের এই নির্ভীক যাত্রী ছিলেন মিশরের ইখওয়ানুল মুসলেমিনের একজন প্রথম সারির নেতা। আইন শাস্ত্রের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। এরপর তিনি সরকারী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অত্যন্ত আস্থার সাথে তাঁর উপরে অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। সুয়েজ খালের পূর্বদিকের কলেজের নির্বাচনী এলাকার সরকারী পরিদর্শক হিসেবে তিনি দেখতে পান, মিশর পার্লামেন্ট-সদস্য প্রার্থী ইখওয়ানুল মুসলেমিনের প্রার্থী ইমাম হাছানুল বান্নার বিরুদ্ধে সরকার অত্যন্ত ন্যাক্কারজনকভাবে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। নির্বাচনে ইমাম হাছানুল বান্নার সুস্পষ্ট বিজয় দেখে সরকার তাঁকে পরাজিত করার জন্য অত্যন্ত হীনপথ অবলম্বন করেছে। আজন্ম ন্যায়নীতি ও সত্যের অনুসারী আব্দুল কাদের আওদাহ নির্বাচনী পরিদর্শক হয়েও এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন। তিনি স্বয়ং ইমাম হানানুল বান্নার নির্বাচনী এলাকা ইসমায়লিয়ায় উপস্থিত হন। সেখানে বিশাল জনসভার আয়োজন করে সরকারের এই হীন আচরণের প্রতিবাদে তিনি জনগণকে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনের আহ্বান জানালেন। সমবেত জনতাকে তিনি বললেন– যদি

কোন ব্যক্তি সরকারের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করতে গিয়ে কোন অসুবিধার সম্মুখিন হয় তাহলে নির্বাচন কমিশনের একজন পদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে জনগণের সাহায্যে তিনি হাত প্রসারিত করবেন।

একজন স্বনামধন্য ন্যায়-নিষ্ঠ বিচারক হিসেবে গোটা মিশরে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি ছিল। বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি নিরপেক্ষ বিচার নিশ্চিত করতেন। তিনি সর্বদা একথা বলতেন, 'আমি বিচারক। কিন্তু সর্বাগ্রে আমি একজন মুসলমান।' তিনি মিশরের সাধারণ মানুষ ও বুদ্ধিজীবীদের কাছে ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র। ১৯৫০ সনে মিশরের জালিম শাসক অন্যায়ভাবে ইখওয়ানুল মুসলেমিনকে বে-আইনী ঘোষণা করে এবং দলের যাবতীয় সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে। তখন আব্দুল কাদের আওদাহ্ মানসুরের আদালতের বিচারপতি। আল ইখওয়ানুল মুসলেমিন সরকারের ঘোষণার বিরুদ্ধে আদালতে পিটিশন করে।

আব্দুল কাদের আওদাহ্ মামলার শুনানী গ্রহণ করে ইসলামী আন্দোলনের অপ্রতিরোধ্য সংগঠন ইখওয়ানুল মুসলেমিনের পক্ষে রায় ঘোষণা করে মিশরের মুসলমানদের হৃদয়ে স্থান করে নেন। তিনি মামালার শুনানী গ্রহণকালে এই প্রথম ইখওয়ানুল মুসলেমিনের বিস্তারিত কর্মসূচি সম্পর্কে অবগত হন এবং ইখওয়ানুল মুসলেমিনের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েন। তিনি দ্বীনি সংগঠন ইখওয়ানকে সহযোগিতার সুযোগ খুঁজতে থাকেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, উকিল হিসেবে তিনি ইখওয়ানের পক্ষে আদালতে রড়বেন। সম্মানিত পদ– বিচারকের পদে ইস্তফা দিয়ে তিনি সুপ্রিম কোর্টের উকিল হিসেবে ইখওয়ানুলের পক্ষে আইনী লড়াই করে ইখওয়ানুলকে বাতিল সরকারের বিরুদ্ধে জয়ী করেন। এরপর প্রত্যক্ষভাবে তিনি ইসলামী আন্দোলনের নিজেকে নিয়োজিত করেন। দক্ষতা ও আল্লাহভীরুতার কারণে তিনি অচিরেই ইখওয়ানুল মুসলেমিনের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেলের দায়িত্ব পেলেন। তাঁর সম্পর্কে ইসলামী চিন্তাবিদদের ধারণা ছিল অত্যন্ত উঁচুমানের। তাঁরা বলতেন, হিজরী সপ্তম শতকে ইমাম ইবনে তাইমিয়া সমস্ত বাতিল মতবাদের সম্পর্কে বলিষ্ঠ যুক্তি দিয়ে যেভাবে ইসলামকে একমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন ব্যবস্থা হিসেবে প্রমাণ করেছেন, অনুরূপভাবে বর্তমান শতাব্দীর জাহেলিয়াতের প্রতি চ্যালেঞ্জ করে আব্দুল কাদের আওদাহ্ প্রমাণ করেছেন, ইসলামী আইনই একমাত্র আইন-যা দিয়ে সুবিচার করা সম্ভব। তিনি দীর্ঘ ৮০০ শত পৃষ্ঠার এক বিশাল ইসলামী আইনের গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই মূল্যবান গ্রন্থটি গোটা আরব বিশ্বে অত্যন্ত সম্মানের সাথে সমাদৃত। ১৯৫১ সনে ফুয়াদ আল আওয়াল এই গ্রন্থটিকে 'ল' প্রাইজ দেবার জন্য নির্বাচিত করেন। এই গন্থে লিখিত দু'টি কথার প্রতি মিশর সরকারের আপত্তি ছিল। কথা

দু'টি গ্রন্থ থেকে বাদ দেয়ার জন্য আব্দুল কাদের আওদাহ্ (রাহঃ)-এর প্রতি সরকার চাপ দিতে থাকে।

তদানীন্তন মিশরে তখন রাজতন্ত্র চলছে। রাজতান্ত্রিক শাসনাধিনে বাস করে তিনি তাঁর রচিত গ্রন্থে উল্লেখ করেছন– ইসলামে রাজতন্ত্রের কোন স্থান নেই এবং শাসক গোষ্ঠীও আইনের গন্ডীর বাইরে নয়। ইসলামী শরীয়াত তথা আইনের দৃষ্টিতে শাসক শাসিত সকলেই সমান। সকলের অধিকার সমান।

রাজশক্তি ক্রমাগত চাপ দিতে থাকে বই থেকে কথাগুলো বাদ দেয়ার জন্য। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের এই বীর মুজাহিদ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, তিনি যা লিখেছেন তা কোরআন-হাদীস অনুযায়ীই লিখেছেন। অতএব গ্রন্থে কথাগুলো বহাল থাকবে। মিশরের রাজদরবারে তিনি অত্যন্ত বিপজ্জনক মানুষ হিসেবে চিহ্নিত হলেন। ইতোমধ্যে ১৯৫২ সনের জুলাই মাসে মিশরে জেনারেল নজিবের নেতৃত্ব সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। মিশরে আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের দাবিতে অগণিত মানুষ সরকারী বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করে রাজপথে মিছিল বের করে। সেই উত্তাল জনতার নেতৃত্বে ছিলেন বিপ্লবী বীর আব্দুল কাদের আওদাহ্। সরকার আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লো ইখওয়ানের শক্তি দেখে। এ সময় সরকার পদ্ধতির প্রশ্নে সামরিক নেতাদের মধ্যে মতবিরোধ চলছিল। ইখওয়ান সামরিক জান্তা নাসেরর কোপানলে নিপতিত হলো, শুরু হলো নির্যাতনের স্টীম রোলার। ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে কল্পিত অভিযোগ উত্থাপন করা হলো। তাঁদেরকে দলে দলে কারাগারে বন্দী করা হলো। জেলখানায় সত্য পথের পথিকদের ওপরে অবর্ণনীয় অত্যাচার চলতে থাকলো। সারা বিশ্বের ইসলাম বিরোধী শক্তির অব্যাহত ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হলো ইখওয়ানের নেতা কর্মী। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির গোলাম মিশরের জালিম সরকার বিচারের নামে প্রহসন করে দ্বীনি আন্দোলনের লোকদেরকে জেল ও মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করলো।

মিশরীয় সরকার আব্দুল কাদের আওদাহকে গ্রেফতার করে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করলো। সরকার বিচারের নামে প্রতারণা শুরু করলো। ইসলামী আন্দোলনের প্রথম শ্রেণীর চারজন নেতাকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হলো। এই চারজনের মধ্যে আব্দুল কাদের আওদাহও ছিলেন। ইতোপূর্বে ১৯৪৯ সনের ১১ই ফেব্রুয়ারী ইখওয়ানুল মুসলেমিনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ইমাম হাছানুল বান্নাকে রাজপথে গুলী করে শহীদ করা হয়। গোটা বিশ্বের মুসলমানদের পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিবাদের ঝড় উঠলো। কিন্তু সকল প্রতিবাদকে উপেক্ষা করে মিশরের জালিম

স্বৈরাচারী সরকার মাত্র আধ ঘন্টার ব্যবধানে আব্দুল কাদের আওদাহ, শায়খ ফরগালী, ইউছুফ তেলওয়াত, ইব্রাহীম তাইয়্যেব ও হিন্দাভী দুয়াইরকে ১৯৫৪ সনের ৭ই ডিসেম্বর ফাঁসির মাধ্যমে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দিল। ফাঁসির পোষাক পরিধানকালে আব্দুল কাদের আওদাহ (রাহঃ) উচ্চকণ্ঠে বলতে থাকেন– আমি কোন অপরাধ করিনি, আমার হত্যাকারীদের উপরে আমার রক্ত অভিশাপ হয়ে দেখা দেবে।

এরপর তিনি দৃপ্ত কদমে ফাঁসির মঞ্চের দিকে এগিয়ে যান। একদিকে পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় করে দেয়ার লক্ষ্যে জল্লাদের দল আল্লাহর পথের এই মুজাহিদের কণ্ঠে ফাঁসির রশি পরিয়ে দিচ্ছে, অপরদিকে সেই কণ্ঠ অকম্পিতভাবে আবৃত্তি করছে– আমি কোথায় কি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করছি এটা আমার মাথা ব্যথার কারণ নয়, আমি যে মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করছি এটাই আমার অহংকার।

ইসলামের দুশমনরা মধ্যপ্রাচ্যে থেকে ইসলামী আন্দোলন ইখওয়ানুল মুসলেমিনকে নিশ্চিহ্ন করার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। এই হীন লক্ষ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার কল্পিত অভিযোগ উত্থাপন করে দ্বীনি আন্দোলনের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে। কাউকে গুপ্তঘাতকের মাধ্যমে হত্যা করিয়েছে। অসংখ্য কর্মীকে কারাবন্দী করেছে। কারাগারে তাঁদের ওপরে অবর্ণনীয় নির্যাতন চালিয়েছে। তাঁদের সহায় সম্পদ বাতিল শক্তি ছিনিয়ে নিয়েছে। কিন্তু কিন্তু বাতিল দ্বীনি আন্দোলনের অগ্রযাত্রা ব্যহত করতে ব্যর্থ হয়নি। যখন ভারতীয় উপমহাদেশ ও মিশরে আল্লাহর পথের মুজাহিদদের প্রতি আল্লাহদ্রোহী শক্তি কঠোর নির্যাতিন আরম্ভ করে, সে সময়ই ইসলামী আন্দোলন ক্ষুদ্র ধূলিকণা থেকে বিরাট সাহারায় পরিণত হয়। এই আন্দোলন যেন ফুল বাগানের বদ্ধ কলিতে ছিল, নির্যাতনের নির্মম আঘাতে তার আপন সুবাস পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ে। কবি আল্লামা ইকবাল উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেন–

মাগরিবকে ওয়াদীওঁমে গুজিঁ আজান হামারী
থামতা না থা কিছিছে সয়লে রাওয়াঁ হামারা।

বেগবান বন্যার অপ্রতিরোধ্য গতির ন্যায় আমরা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছি। কেউ আমাদের গতি পথে বাধার সৃষ্টি করতে পারে নি। ইউরোপের দেশসমূহেও আমরা তাওহীদের বাণী পৌঁছিয়েছি।

ইতোপূর্বে ইখওয়ান শুধু মাত্র মিশরেই সীমাবদ্ধ ছিল। কঠিন আঘাত আসার পরে আজ তা গোটা মধ্য প্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। অনুরূপভাবে জামায়াতে ইসলামীও আজ শুধু পাকিস্তানেই সীমাবদ্ধ নেই, তা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতই পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে

পড়েছে। অমুসলিম দেশসমূহেও আজ ইসলামী আন্দোলনের কার্যক্রম অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। বাতিল শক্তি হত্যা নির্যাতন অত্যাচার চালিয়ে সত্যের কাফেলার কণ্ঠ স্তব্ধ করার প্রচেষ্টা চালায়, কিন্তু ওরা ভুলে যায়– বেগবান প্লাবন বাধাপ্রাপ্ত হলে তা জলপ্রপাতের সৃষ্টি করে সব কিছু ভাসিয়ে দেয়। তেমনই রক্ত পিচ্ছিল পথের যাত্রীদের ওপরে নির্যাতনের অন্ধকার যত বৃদ্ধি পেতে থাকে, সত্যের সূর্যের উদয়ের সময় ততই নিকটবর্তী হয়– অতীত ইতিহাস এ কথার সাক্ষী।

অমর অক্ষয় তুমি শহীদী গুলবাগে

আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বিধান কায়েমের লক্ষ্যে মধ্যপ্রাচ্যে যে সংগঠন বিরামহীন তৎপরতা চালাচ্ছে, সংগঠনের নাম ইখওয়ানুল মুসলেমিন। মধ্যপ্রাচ্যের বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের ধ্বজাধারী ও স্বৈরাচারী সরকারসমূহ ইসলামের এই বিপ্লবী সংগঠন ইখওয়ানুল মুসলেমিনকে নানা ধরনের লোভ-লালসা ও প্রলোভন প্রদর্শন করে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হলো, তখন ইসলাম বিরোধী বাতিল সরকার নির্যাতনের হিংস্র পথ অনুসরণ করলো। মিশরের আল্লাহদ্রোহী সরকার ইখওয়ানকে হুমকী মনে করে ইখওয়ানের যাবতীয় সম্পদ বাজেয়াপ্ত করলো। এই দ্বীনি সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সংগঠনের প্রথম সারীর সকল নেতাকে গ্রেফতার করে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করলো। সারা মিশরের ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের উপরে পুলিশের নির্মম অত্যাচার শুরু হলো। ঘরে ঘরে তল্লাশী চালিয়ে দ্বীনি আন্দোলনে আত্মনিবেদিত নারীদের প্রতিও অত্যাচার করা শুরু করলো মিশরের জালিম নাসের সরকার। নাস্তিকবাদী শক্তি তদানীন্তন অখন্ড রাশিয়ার নির্দেশে জামাল আব্দুন নাছের মিশর থেকে ইসলামের শেষচিহ্ন মুছে ফেলার জন্য সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করলো।

ইসলামী আন্দোলনকে সারা দুনিয়ার সামনে সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য ইখওয়ানুল মুসলেমিনের বিরুদ্ধে কল্পিত অভিযোগ উত্থাপন করা হলো। ভিত্তিহীন অভিযোগে মুসলমানদের প্রাণপ্রিয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে তাঁদের বিরুদ্ধে বিচারের নামে প্রহসন শুরু করলো মিশরের বিংশ শতাব্দীর ফেরাউন নাসের। দ্বীনি আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা সাইয়েদ কুতুবকে যখন গ্রেফতার করা হয় তখন তিনি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত। অসুস্থ অবস্থায় তাঁর হাত-পা লৌহ শৃংখলে আবদ্ধ করে অন্ধকার কারাগারের দিকে নিয়ে যাওয়া হলো। চরম অসুস্থতার কারণে পথে তিনি

কয়েকবার জ্ঞান হারালেন। কারাগারে পৌঁছার পরপরই আল্লাহর কোরআনের এই মুফাস্সিরের ওপরে নেমে এলো ইতিহাসের নির্মম নিষ্ঠুর নির্যাতন।

সরকারের অবৈধ নির্দেশে কারা কর্তৃপক্ষ তাঁকে পৈশাচিকভাবে প্রহার করতে থাকে। সামরিক বাহিনীর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ভয়াল দর্শন হিংস্র কুকুর তাঁর ওপরে লেলিয়ে দেয়া হয়। তাঁর মাথায় উত্তপ্ত পানি ঢালা হচ্ছে, পরক্ষণেই বরফ শীতল পানি ঢালা হচ্ছে। লৌহ উত্তপ্ত করে তাঁর শরীরে দাগ দেয়া হচ্ছে। শারীরিকভাবে চরম অসুস্থ সাইয়েদ কুতুব (রাহঃ)-এর ওপর চলতে থাকে এই লোমহর্ষক নিষ্ঠুর নির্যাতন। তিনি একাধিকবার জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েন কিন্তু পাষন্ডদের মনে সামান্যতম করুণার উদ্রেগ হয়নি।

১৯৫৪ সালে সাইয়েদ কুতুবকে গ্রেফতার করে নাস্তিক্যবাদী রাশিয়া থেকে আমদানী করা তথাকথিত গণআদালতের নামে তাঁর বিচার চলতে থাকে। বিচারের নামে প্রহসন করে ১৯৫৫ সালের ১৩ই জুলাই তাঁকে ১৫ বছরের কারাদন্ড প্রদান করা হয়। এ সময় নির্যাতনের ফলে তিনি এতটা অসুস্থ হয়ে পড়েন যে, দন্ডাদেশ শোনার জন্য আদালতের কাঠগড়া পর্যন্ত পৌঁছা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। মিশরের ফেরাউন নাসের কর্তৃক ঘোষিত এই দন্ডাদেশ শোনার পরে তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হলো আল্লাহর কোরআনের বাণী–ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন।

অবশ্যই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমাদের সকলকেই তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। (সূরা বাকারা)

পরবর্তীতে নাসের সরকার তাঁর কাছে এক অদ্ভূত প্রস্তাব পেশ করে জানালো, তিনি যদি পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তাহলে তাঁর দন্ডাদেশ লঘু করা হবে। এই হাস্যকর প্রস্তাব শুনে আল্লাহর সিংহ সাইয়েদ কুতুব গর্জে উঠে বললেন– যালিমের পক্ষ থেকে এই ধরনের হীন প্রস্তাবে আমি ঘৃণা প্রকাশ করছি। আল্লাহর শপথ! যদি 'ক্ষমা' শব্দটি আমাকে নাসেরের ফাঁসির কাষ্ঠ থেকেও বাঁচাতে পারে তবুও আমার দেহে প্রাণের স্পন্দন থাকতে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করবো না। আমি আমার আল্লাহর দরবারে এমন অবস্থায় উপস্থিত হতে চাই, যেখানে আমি তাঁর ওপর সন্তুষ্ট থাকবো এবং তিনিও আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন।

দীর্ঘ দশ বছরের ক্রমাগত শারীরিক ও মানসিক নিপীড়নের পর ১৯৬৪ সালের এপ্রিল মাসে তিনি জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন। কারাগারের কঠোর নির্যাতন তাঁকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের কাজে দুর্বল করতে পারেনি। তিনি বন্দী জীবনে আল কোরআনের বিশ্ববিখ্যাত 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন' রচনা করেন। তাঁর

রচিত তাফসীর- তাফসীর বিশ্বের তাফসীর সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এক বিশাল তাফসির। ইতোপূর্বেও তিনি বহু সংখ্যক ইসলামী সাহিত্য রচনা করে মুসলমানদের তাঁদের উপরে অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

১৯৬৪ সনের দিকে ইরাকের প্রেসিডেন্ট আব্দুস সালাম আরিফ মিশর সফরে এলে তিনি সাইয়েদ কুতুবকে মুক্তি দেয়ার জন্য নাসেরের কাছে সুপারিশ করেন। তখন তাঁর কারাজীবনের দশ বছর চলছিল। নাসের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে জেলখানা থেকে মুক্তি দিয়ে গৃহে অন্তরীণ করে। সরকার তার মত প্রতিভাধর ব্যক্তিকে নিজ দলে টানার জন্য নানা ধরণের প্রলোভন দিতে থাকে। একবার তাঁকে মিশরের শিক্ষামন্ত্রীর পদ গ্রহণের জন্যও অনুরোধ করা হয়। তিনি সরকারের অনুরোধ প্রত্যাখান করে বলেন- আমি নিছক মন্ত্রীত্ব করার জন্য সরকারে যোগ দেব না। যদি মিশরের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে-না পারি, তাহলে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করায় কোন সার্থকতা নেই।

বাতিল শক্তির অন্ধ পূজারী জালেম নাসের, সাইয়েদ কুতুবকে বাড়িতে অন্তরীণ রেখেও স্বস্তি বোধ করলো না। যারা অন্ধকার জগতের বাসিন্দা তাদের চোখে আলোর বিন্দুচ্ছটা নিপতিত হলেও আর্তনাদ করে উঠে। তেমনি সত্য দর্শনে অন্ধ বাতিল শক্তির ক্রীড়নক নাসের মস্কো সফরে গিয়ে নাস্তিক্যবাদের ধারক-বাহকদের নির্দেশে ঘোষণা করলো- অতীতে আমি ইখওয়ানকে অনেকবার ক্ষমা করেছি। কিন্তু এবার আর ক্ষমা করবো না। ইখওয়ান সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে আমাকে হত্যা করে মিশরে মৌলবাদী সরকার গঠন করার এক ষড়যন্ত্র করছে। সে ষড়যন্ত্র গোয়ান্দা বাহিনী উদঘাটন করেছে।

১৯৬৫ সালের আগষ্ট মাসে তাঁকে পুনরায় গ্রেফতার করে কারারুদ্ধ করার চক্রান্ত করলো জালিম সরকার। গ্রেফতারী পরোয়ানা পাঠ করেই আল্লাহর পথের মুজাহিদ সাইয়েদ কুতুব স্পষ্টতই নিজের ভবিষ্যৎ দেখতে পেলেন। তিনি মুখে মধুর হাসি ফুটিয়ে বললেন- আমি অনুভব করতে পারছি, জালিম শক্তি এবার আমার মাথাটাই চাইবে। এতে আমার কোনো দুঃখ নেই, নিজের মৃত্যুর জন্য আমার কোনো আক্ষেপও নেই। আমার তো বরং সৌভাগ্য এই যে, আল্লাহর পথে আমার জীবনের পরি সমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে। আগামী কালের ইতিহাস এটা প্রমাণ করবে যে, ইখওয়ানুল মুসলেমিন সত্য-সঠিক পথের অনুসরণ করেছে, এই জালিম সরকার সত্য পথ অনুসরণ করেছে?

তাঁকে গ্রেফতার করার সাথে সাথেই ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার

শুরু হলো। ১৯৬৫ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত ১১ই অক্টোবর দৈনিক টেলিগ্রাফে লেখা হয়েছিল, মিশর সরকার ৪০ হাজার ইসলামপন্থীকে গ্রেফতার করেছে, এর মধ্যে ৭০০ মহিলাও ছিলেন।

মিথ্যা মামলায় জড়িত করে নাসের সরকার ইখওয়ানের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে বিচারের নামে প্রহসন চালাতে থাকে। বাদী পক্ষ সমর্থনের জন্য সাইয়েদ কুতুব ও অন্যান্য নেতাদের কোনো কৌসুলী নিয়োগের অধিকার ও সুযোগ দেয়া হলো না। দেশের শাসনতান্ত্রিক বিধি অনুসারে সুদান ও মরক্কোর আইনজীবীরা মিশরের আদালতে মামলা পরিচালনা করতে পারলেও সে সুবিধাও দেয়া হলো না। ইখওয়ান নেতৃবৃন্দের পক্ষে মামলা পরিচালনা করার জন্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সুদান, মরক্কো ও কায়েকটি দেশ থেকে আইনজীবীগণ মিশরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিনে। তাঁরা কায়রো বিমান বন্দরে পৌঁছলে পরবর্তী বিমানেই তাঁদেরকে ফেরৎ যেতে বাধ্য করা হলো। কয়েকজন আইনজীবীকে আদলত কক্ষ থেকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়া হলো।

ফরাসী বার এসোসিয়েশনের সভাপতি উইলিয়াম থরপও ইখওয়ান নেতৃবৃন্দের পক্ষে মামলা পরিচালনা করার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু তাঁকে মিশর আগমনে অনুমতি দেয়া হলো না। লন্ডনভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল মামলা পরিচালনার লক্ষ্যে আইনজীবী প্রেরণে প্রচেষ্টা চালালো, অনুমতি দেয়া হলো না। অবশেষে তারা বিচার কক্ষে একজন পর্যবেক্ষক প্রেরণের অনুমতি কামনা করলো, কিন্তু ফেরাউন সরকার সে সুযোগও দিল না। ১৯৬৬ সালের ২৫ এপ্রিল লন্ডনভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল তাদের এক প্রতিবাদ লিপিতে উল্লেখ করলো, মিশররে স্বৈরশাসক গোটা বিচার কক্ষে কোনো বিদেশী নাগরিক, সাংবাদিক, জনপ্রতিনিধি এমনকি কোনো সাধারণ মানুষকেও প্রবেশ করতে দেয়নি। আদালতের কোনো বিবরণী যেন সরকারের অনুমতি ব্যতীত সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হতে না পারে, তার জন্য সরকার একটি কুখ্যাত সেন্সরশীপ এ্যাক্ট জারি করেছিল।

তথাকথিত বিচারের দৃশ্য টেলিভিশনে প্রচারের ঘোষণা দেয়া হয়। কিন্তু ইসরামী আন্দোলনের মর্দে মুজাহিদরা দোষ স্বীকার করতে অস্বীকার করে তাঁদের ওপরে বর্বর নির্যাতনের বর্ণনা করতে থাকেন। তখন কোনো ধরনের আদেশ ব্যতীতই টেলিভিশনের সম্প্রচার বন্ধ করে দেয়া হলো। এভাবে লোমহর্ষক নির্যাতন চালিয়েও তাঁদের কাছ থেকে মিথ্যা স্বীকারোক্তি আদায় করা যায়নি। আদালতের তথাকথিত

বিচারপতি গ্রেফতারকৃত নেতাদের কোন কথাই বলতে দেয়নি। এভাবে বিচারের নামে তামাশা করে ইসলামী আন্দোলনের নেতাদেরকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হয়। সারা বিশ্বে ইসলাম প্রিয় জনতা তীব্র প্রতিবাদ জানাতে থাকে সাইয়েদ কুতুবের মৃত্যুদন্ডের বিরুদ্ধে। সমস্ত প্রতিবাদ উপেক্ষা করে অত্যাচারী মিশরের ফেরাউন নাসের ১৯৬৬ সনের ২৯শে আগষ্ট ইসলামের এই সিংহ পুরুষকে ফাঁসিতে ঝুলায়। সাইয়েদ কুতুব (রাহঃ)-এর সাথে আরো দু'জন নেতার মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়।

ফাঁসির রশি মুজাহিদ সাইয়েদ কুতুবের দেহ চীরতরে নিথর নিস্তব্ধ করে দিয়েছে ঠিকই কিন্তু তিনি যে, উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন মুসলমানদের প্রতি– আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত নিরব হবো না নিস্তব্ধ হবো না। যতক্ষণ না আমরা আল কোরআনকে একটি অমর শাসনতন্ত্র হিসেবে পাবো।

তাঁর এই বিপ্লবী ঘোষণাকে ফাঁসির রশি শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করতে পারেনি। বাতিল শক্তির হিংস্র আক্রোসে সাইয়েদ কুতুবের নশ্বর দেহ ফাঁসির রশিতে যেভাবে ঝুলে পড়েছিল, সেভাবে তাঁর আন্দোলন ঝুলে পড়েনি। ইসলাম বিরোধী সরকারের ষড়যন্ত্রে সাইয়েদ কুতুবের সংগ্রামী দেহ নিষ্ঠুর ফাঁসির রশিতে চীরতরে নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর অমর অবদান ইসলামী সাহিত্য, কোরআনের তাফসীর এবং সংগঠন নিরব নিস্তব্ধ হয়নি। তাঁর প্রাণপ্রিয় সংগঠন ইখওয়ানুল মুসলেমিন এবং তাঁর রচিত ইসলামী সাহিত্য, তাফসীর সাহিত্যের সৌরভ-ফী যিলাযিল কোরআন– অমর-অক্ষয়। এসব কিছু প্রতি মুহূর্তে পৃথিবীর মাটিতে অসংখ্য সাইয়েদ কুতুবকে জন্ম দিচ্ছে। তাঁর শাহাদাতের ঘটনা যখন ইসলামী আন্দোলনের নেতা কর্মীরা ইতিহাসে পড়ছে, তখন তাঁদের হৃদয় আল্লাহর প্রেমে পাগল হয়ে উঠছে। নিজের অজান্তেই কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে– আমাকে শহীদ করে সেই মিছিলে শামিল করে দিও– যে মিছিলের নেতা আমির হামযা, সাইয়েদ কুতুব, আব্দুল কাদের আওদাহ, ইমাম হাছানুল বান্নাসহ অনেকেই।

ফাঁসির রজ্জু যখন তাঁর গলায় পরিয়ে দেয়া হচ্ছিলো তখন তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করছিলেন, 'কোথায় কি অবস্থায় আমি মৃত্যুবরণ করছি এটা আমার চিন্তার বিষয় নয়–আমি যে মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করতে পারছি, এটাই জীবনের সবচেয়ে বড় সফলতা।'

ঈমান মানুষকে এভাবেই নির্ভীক করে তোলে। ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করার অপরাধে (?) সাইয়েদ কুতুব শহীদ (রাহঃ)-কে গ্রেফতার করে কারাগারে প্রেরণ করা হলো। তাঁর কক্ষের ভেতরে হিংস্র শিকারী কুকুর প্রেরণ করা হলো। কুকুর তাঁর

দেহের গোস্ত ছিন্ন ভিন্ন করে খুবলে তুলে নিবে, এ জন্যই ইসলামের দুশমনরা তাঁর ওপরে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। কক্ষের বাইরে জালিমের দল অপেক্ষা করছিল সাইয়েদ কুতুবের আর্তচিৎকার শোনার জন্য।

দীর্ঘক্ষণ অতিবাহিত হবার পরও যখন সামান্য শব্দ শোনা গেল না, তখন জালিমের দল কক্ষের দরজা উন্মুক্ত করে দেখতে পেল, আল্লাহর মুমীন বান্দা সাইয়েদ কুতুব (রাহঃ) মহান আল্লাহর দরবারে সেজ্‌দায় অবনত হয়ে রয়েছেন আর প্রেরিত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুরগুলো তাঁর চারদিকে বসে তাঁকে প্রহরা দিচ্ছে। তাঁকে ফাঁসি দেবার পূর্বে জালিম সরকার কর্তৃক নিয়োজিত একজন মাওলানা তাঁর কাছে এসে তাঁকে তওবা করে কালিমা পাঠ করার অনুরোধ করেছিলেন। তিনি সরকারের বেতন ভুক্ত সেই মাওলানাকে নির্ভীক চিত্তে বলেছিলেন– মাওলানা সাহেব! আপনি সামান্য কিছু অর্থের বিনিময়ে এসেছেন আমাকে কালিমা পড়ানোর জন্য। আপনি আমাকে কালিমা পড়িয়ে অর্থ লাভ করবেন। আর আমি কালিমা পাঠ করে এই কালিমার হক আদায় করবো বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম, এ কারণেই আমাকে আজ ফাঁসির রজ্জু গলায় ধারণ করে এ পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করতে হচ্ছে।

এই হলো ঈমানের পরিচয়। ঈমানদার প্রাণ দান করতে পারে, কিন্তু বাতিলের সাথে আপোষ করতে জানে না। তাঁর ঈমান এতটা শক্তি তাকে দান করে যে, আপোষের কথা সে চিন্তাও করতে পারে না। আল্লাহ তা'য়ালাকে কিভাবে সে সন্তুষ্ট করবে, এই চিন্তাই তাকে সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত আচ্ছন্ন করে রাখে।

শাহাদাতের বাগানে ঘুমিয়েছে ভাই আমার

পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীর হটকারী সিদ্ধান্ত ও পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের সক্রিয় অনুচরদের ষড়যন্ত্রে ইসলামের নামে অর্জিত অগণিত মুসলিম নারী পুরুষ তথা অবাল বৃদ্ধ বনিতাদের তপ্ত রক্তের ওপরে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের ভাগ্যাকাশের ঈশান কোণে তখন প্রলঙ্করী ঘূর্ণীঝড়েরর তান্ডবলীলার অশনী সংকেত দেখা দিয়েছে। দেশবাসীকে বাহ্মণ্যবাদের অপচ্ছায়া তথাকথিত বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের বিষাক্ত ফনার নীচে একত্রিত করার অপচেষ্টা চলছে। ইসলামের দুশমনরা পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামী জ্ঞান বর্জিত মুসলমানদেরকে ইসলামের শ্বাশত জীবন বিধান থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য মরিয়া উঠেছে।

দেশ থেকে ইসলামের শেষচিহ্ন মুছে তারা দেশকে বাহ্মণ্যবাদের উগ্র পৌত্তলিকতায়

আচ্ছন্ন করতে চায়। তারা মুসলমানদেরকে আল কোরআনের অমিয় সঞ্জীবনী সুধা থেকে বঞ্চিত করতে চায়। এ দেশের তওহীদী জনতাকে জড়বাদী ভারতের গোলামে পরিণত করতে চায়। ইসলামের বীর মুজাহিদ তিতুমীরের উত্তরসূরী এ দেশের মুসলমানদেরকে ভারতীয় অনুচরেরা ভারতের গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। তদানীন্তন নাস্তিক্যাবাদী শক্তি সাম্রাজ্যবাদী অখন্ড রাশিয়ার গুণমুগ্ধ কম্যিউনিষ্টরা এদেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত্রের কালো আসনে উপবিষ্ট হয়ে তাদের হিংস্র থাবা বিস্তার করছে। ভারত-রাশিয়ার পোষ্যপুত্রেরা ধর্মনিরপেক্ষতার নামে এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।

বাতিল শক্তির দাপটের মুখে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কোণঠাসা করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে ইসলামের মুজাহিদদের ওপরে তারা হামলা চালিয়েছে। মুজাহিদদের পবিত্র রক্তে পাকিস্তানের মাটি স্থানে স্থানে লাল হয়ে উঠেছে। ঢাকাতেও ইসলামের বীর মুজাহিদদেরকে নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র চলছে। এরই অংশ হিসেবে পাকিস্তানের শিক্ষানীতিকে পুরোপুরি নাস্তিক্যবাদের মোড়কে ঢেলে সাজানোর জন্য ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ধ্বজাধারী ইসলামের দুশমনরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের হিংস্র-নখর বিস্তার করেছে। তারা সাধারণ ছাত্রদেরকে ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করার জন্য ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। গোটা দেশে ইসলাম বিরোধী শক্তির সাময়িক বিজয় দেখা দিয়েছে।

মুসলমানদের এই দূরাবস্থা অবলোক করে মাত্র ২৩ বছরের বুদ্ধিদীপ্ত যুবক আব্দুল মালেকের হৃদয় বোবা কান্নায় গুমরে ফিরছে। শহীদ তিুমীরের সার্থক উত্তরসূরী আব্দুল মালেক শাহাদাতের অদ্যম কামনায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন জিহাদের রক্তঝরা ময়দানে। একথা তিনি তখন স্পষ্টভাবে অনুধাবন করেছিলেন, বর্তমানে বাতিল শক্তি সারাদেশে যে শক্ত আসন গেড়ে বসেছে, এই অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত লোকদেরকে ময়াদানে শাহাদাতের নজরানা পেশ করা ব্যতীত কোন পথ উন্মুক্ত নেই।

সুতরাং তিনি তো মুসলমান! খালিদ, তারিক মুছা, তিতুমীরে সার্থক উত্তরসূরী। তাঁর পক্ষে তো ইসলামের দুশমন ধর্মনিরপেক্ষ ভারত ও নাস্তিক রাশিয়ার তল্পীবাহকদের শক্তির দাপট দেখে কচ্ছপের মতো মাথা গুটিয়ে গর্তে আশ্রয় গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তিনি এই কঠিন মুহূর্তে ঢাকা ইউনিভার্সিটির কার্জন হলের লনে মুসলিম ছাত্রদের এক জরুরী সভা আহ্বান করলেন। সভায় তিনি তেজোদীপ্ত কণ্ঠে ছাত্রদের প্রতি আহ্বান জানালেন– মানুষের তৈরি করা নির্যাতনমূলক মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য যদি

ছেলেরা পারে মায়ের কোল খালি করে রক্ত দিতে, পারে তাদের মূল্যবান জীবন উৎসর্গ করতে, তাহলে আমরা যারা সত্য–ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা তথা আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বিধান কায়েমের আন্দোলন করছি বলে দাবি করে থাকি, আমারা কি মায়ের বুক শূন্য করে নিজেদের জীবনবাজী রেখে রক্ত দিতে পারবোনা? বাতিল শক্তি ময়দানে রক্ত দিয়ে সাময়িকের জন্য এই পৃথিবীতে নেতৃত্ব লাভ করে, আখিরাতে তারা কিছুই পাবে না। আর আমরা দুনিয়া-আখিরাত এই দুই স্থানেই লাভবান হবো।

আল্লাহর পথের নির্ভীক সৈনিক আব্দুল মালেকের মর্মস্পর্শী বক্তৃতায় মুসলিম যুবকদের দেহে নতুন প্রাণ ফিরে পেলো। নব উদ্যোমে তারা ইসলামী শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের দাবিতে দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু করলো। এ দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সভ্যতা থেকে জড়বাদের শেষ চিহ্ন মুছে দেয়ার জন্য কোরআনের প্রেমিকরা সারাদেশ থেকে আওয়াজ তুললো। পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা তখন সভা সমাবেশ মিছিল শোভাযাত্রার নগরীতে পরিণত হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মিলনায়তনে শিক্ষানীতির ওপরে ছাত্রদের এক বিতর্ক সভার আয়োজন করা হয়েছে। অগণিত দর্শক শ্রোতা মনোযোগ দিয়ে বক্তাদের বক্তৃতা শুনছে। নাস্তিক্যবাদের কালো পতাকাবাহী তথাকথিত এক মুসলিম ছাত্র, ইসলামী শিক্ষার বিরোধিতা করে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতির পক্ষে নির্লজ্জ ওকালতী করে বক্তৃতা দিতে শুরু করলো। সাথে সাথে ইসলাম প্রিয় ছাত্রদের মধ্যে তীব্র প্রতিবাদের ঝড় উঠলো। কোন ধরনের সিদ্ধান্ত ব্যতীতই সভার সমাপ্তি টানা হলো। প্রতিবাদকারীদের নেতৃত্বে ছিলেন সিংহদিল মর্দে মুজাহিদ ভাই আব্দুল মালেক। ইসলামের শত্রু ধর্মনিরপেক্ষদের ঘৃণ্য তল্পীবাহকরা তাদের পথের প্রধান কাঁটা হিসেবে আব্দুল মালেককে বিবেচিত করলো। আব্দুল মালেক ভাই অনুভব করলেন, বাতিল শক্তি যে কোন মুহূর্তে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের আক্রমণ করবে।

তিনি কোরআনের সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আত্মনিবেদিত কর্মীদের নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দিয়ে কয়েকজন সঙ্গীসহ রমনা রেসকোর্স– বর্তামানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের ঘৃণ্য অনুসারী মরণ কামড় দিল। মানব রচিত মতবাদের ধারক-বাহকদের পৈশাচিক আক্রমণের মুখে সঙ্গী-সাথীসহ ভাই আব্দুল মালেক রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে পড়লেন। রমনার সবুজ ঘাসগুলো সেদিন কোরআনের সৈনিকদের রক্তে লাল হয়ে উঠেছিল।

সেই কালো দিনটি ছিল ১৯৬৯ সনের আগষ্ট মাসের ১২ তারিখ। ইসলামের

দুশমনরা তাঁর লুটিয়ে পড়া দেহের ওপর ক্ষুধিত হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়লো। আঘাতে আঘাতে আব্দুল মালেকের দেহ ক্ষত-বিক্ষত করা হলো। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তিনি মুমূর্ষ হয়ে পড়লেন। অনেক সময় গড়িয়ে যাবার পরে অচেতন অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হলো। ক্রমাগত তিনদিন অসহনীয় যন্ত্রণার সাগর পাড়ি দিয়ে চিকিৎসকদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে, ইসলামী আন্দোলনের মর্দে মুজাহিদ, উদিয়মান সাহিত্যিক, অনলবর্ষী যুক্তিবাদী বক্তা, ভাই আব্দুল মালেক আল্লাহর অনুগত গোলামদের চোখে বেদনার অশ্রু ঝরিয়ে ১৫ই আগষ্ট মাগরিবের নামাযের প্রাক্কালে আযানের প্রিয় ধ্বনি- তাওহীদের স্বার্গীয় আবেশের মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে পৌঁছে গেলেন।

আজ ভাই আব্দুল মালেক দৈহিকভাবে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মাঝে নেই এ কথা অবশ্যই সত্য। কিন্তু তাঁর রেখে যাওয়া প্রাণপ্রিয় সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘ দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইসলামী ছাত্র শিবির নাম ধারণ করে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণীর গতিতে বাংলাদেশের আকাশ-বাতাস আল্লাহু আকবর ধ্বনিতে কম্পিত করে তুলছে। তাঁদের ধ্বনির তীব্র আঘাতে বাতিল শক্তির তখতে তাউস তৃণবৎ উড়ে যাবার প্রহর গুনছে। আব্দুল মালেক ১৫ই আগষ্টে সন্ধ্যায় শাহাদাতের অমিয় স ীবনী সুধা পান করে মাত্র দুটি হাত-পা নিয়ে এ নশ্বর জগত থেকে শেষ বিদায় গ্রহণ করেছেন। তিনি যে মুহূর্তে চিরবিদায় গ্রহণ করছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে তাওহীদের বুলন্দ ধ্বনি লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূল্লাহ- কর্ণকুহরে শ্রবণ করে অগণিত মুজাহিদ বাংলার যমীনে মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে।

ভাই আব্দুল মালেকের মাত্র দুটো হাত আর দুটো পা আন্দোলনের রক্তঝরা ময়দানে সক্রিয় নেই, কিন্তু তিনি যে পথ প্রদর্শন করে গিয়েছেন, সেই পথ বেয়ে অগণিত হাত আর পা অবিরাম গতিতে জিহাদের ময়দানে বাতিল শক্তির রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে সক্রিয় রয়েছে। তাঁর রক্তের প্রত্যেক বিন্দু থেকে অগণিত আব্দুল মালেক সৃষ্টি হয়েছে। দ্বীন প্রতিষ্ঠার ময়দানে তাঁরা দেহের তপ্ত রক্ত ঢেলে দিয়ে প্রমাণ করেছে, প্রকৃতই তাঁরা আব্দুল মালেকের উত্তরসূরী। আব্দুল মালেকের রেখে সেদিনের সংগঠন বর্তমানে দক্ষিণ-দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সর্ববৃহৎ ছাত্র সংগঠন অগণিত মানুষের হৃদয়ের স্পন্দন ইসলামী ছাত্র শিবির।

শহীদ আব্দুল মালেক (রাহঃ) ছিলেন তদানীন্তন পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘের ঢাকা শহর শাখার সভাপতি। তাঁর জীবন ছিল কোরআনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। হৃদয়-মন জুড়ে ছিল শাহাদাতের অদম্য কামনা। তিনি বলতেন- প্রকৃত মুমীন হলো

সে, যে কখনো মৃত্যু ভয়ে ভীত নয়। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো শক্তিকে পরোয়া করে না। মুমীন আগুনে পুড়তে পারে কিন্তু শাহাদাতের হক থেকে বিরত থাকতে পারে না।

আল্লাহর পথের এই মুজাহিদের জানাযার ইমাম ছিলেন আরেকজন সিংহদিল মর্দে মুজাহিদ আওলাদে রাসূল আল্লামা সাইয়েদ মুস্তফা মাহমুদ আল মাদানী শহীদ (রাহঃ)। তিনি আব্দুল মালেকের জানাযা সামনে রেখে অশ্রু ধারায় সিক্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে নিজের শাহাদাতের জন্য আবেদন করেছিলেন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর এই গোলামের হৃদয়ের কামনা পূরণ করেছেন।

১৯৭১-এ যুদ্ধ করার সময় এ জাতি নিজের স্বকীয় আদর্শের ভিত্তিতে একটা সুন্দর সুখী সমৃদ্ধশালী জীবন ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছিল। মধুর স্বপ্ন বুকে ধারণ করে মরণ-পণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু জাতির কুসুমাস্তীর্ণ পথ তৎকালিন সরকারের ষড়যন্ত্রের দানব সৃষ্ট প্রবল ভূমিকম্পে নিষ্ঠুরভাবে ধ্বসে পড়লো। গোটা জাতি যেন নিচ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢেকে গেল। নিশা ! মহানিশা নেমে এলো জাতীয় জীবনে। কোথাও সামান্যতম আলোর রেখাটুকু বাকি রইলো না। জাতীয় জীবনের সুখসূর্য আওয়ামী পদতলে নিষ্প্রভ হয়ে পড়লো। গোটা জাতির খরস্রোতা জীবন নদীর তলদেশে তৎকালিন সরকারের তৈরী দূষিত বর্জ্য আর শৈবালদাম ঘন হয়ে স্তূপিকৃত হয়ে স্রোতস্বিনীর গতিকে হরণ করলো।

১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সরকারের আমন্ত্রিত অতিথি ব্রাহ্মণ্যবাদ বাংলার মুসলিম তরুণ-যুবকদের সমগ্র বোধশক্তির ওপরে চিরতরে মহাবিস্মৃতির কৃষ্ণকালো অন্ধকারের যবনিকা টেনে দেয়ার যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পাদন করলো। জাতীয় জীবনের যেখানে শুরু–সেখানেই নামিয়ে দেয়া হলো অভিশাপের সর্বগ্রাসী অনল প্রবাহ। ব্রাহ্মণ্যবাদী বাঙালী জাতীয়তাবাদের ধোঁয়া তুলে এ জাতির জাতীয় পরিচয় পর্যন্ত সম্প্রসারণবাদী ভারতের কাছে বন্ধক দিতে দ্বিধা করলো না। ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই পেড়ে পৌত্তলিক ব্রাহ্মণ্যদের কাছ থেকে বাঙালী জাতীয়তাবাদ আমদানী করা হলো, কোরআন-সুন্নায় বিশ্বাসী মুসলমানদের মুখ থেকে কেড়ে নেয়া হলো "নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবর" ধ্বনি। জিন্দাবাদের পরিবর্তে আমদানী করলো "জয় বাংলা"। আবহমানকাল থেকে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকজন উচ্চারণ করতো "জয় মা কালী"–১৯৭১ সন পরবর্তী সরকার মুসলিম যুবকদের মুখে তুলে দিল সেই জয় ধ্বনি। মুসলমানদের মুখ দিয়ে সম্পূর্ণ হিন্দুয়ানী কায়দায় উচ্চারণ করানো হলো, "ওমা তোর চরণ তলে ঠ্যাকাই মাথা"।

আকাশের নিচে যমীনের বুকে মুসলমানদের এই পবিত্র মাথা এক আল্লাহ্ ব্যতীত দ্বিতীয় কারো সামনে নত হয় না। বিশ্ব কবি নজরুল ইসলামের ভাষায়, "বল বীর বল উন্নত মম শির, শির নেহারী আমারি নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রির।" কিন্তু ভারতের অনুগত ধর্মহীন গোষ্ঠী বাংলার মুসলমানদের সে মাথা পৌত্তলিক জাতির মত দেশের চরণে ঠেকিয়ে দিল। আল্লাহ ও রাসূলকে বর্জন করে বাংলাদেশের সংবিধান রচনা করা হলো। ধর্মনিরপেক্ষতার নামাবলী গায়ে দিয়ে সংবিধানের শুরু থেকে "বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম"- বিদায় করা হলো। বাংলায় "দয়াময় স্রষ্টার নামে শুরু করছি" এ কথাটিও স্থান লাভ করলো না।

মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সরকারের কাছে আল্লাহর কোরআন অসহ্যবোধ হলো। ফলে এদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে পবিত্র কোরআনের সমস্ত আয়াতগুলো বাদ দেয়া হলো। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অকুতভয়ে বীরদর্পে লড়াই করে যে তিতুমীর শাহাদাতবরণ করলেন, তাঁর সম্মানিত নাম মুছে দিয়ে কঠোর সাম্প্রদায়িকতাবাদী সূর্যসেনকে বানানো হলো জাতীয় মহানায়ক। এই সূর্যসেন কোনদিন কোন মুসলমানকে সুদৃষ্টিতে দেখেনি এবং তাঁর দলে কোন মুসলমানকে সে প্রবেশ করতে দেয়নি।

ইসলাম বিদ্বেষী ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠী বিশ্বকবি নজরুল ইসলামের অগণিত গজল-কবিতা দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে সাম্প্রদায়িক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হিন্দু চেতনা সমৃদ্ধ সংগীতটিকেই জাতীয় সংগীতের মর্যাদা দান করলো। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রাবাসগুলো থেকে ইসলাম ও মুসলিম চেতনাধন্য শব্দসমূহ ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিল। ফজলুল হক মুসলিম হল ও স্যার সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হল থেকে মুসলিম শব্দ বাদ দেয়া হলো। ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের নাম পরিবর্তন করে কবি নজরুল কলেজ রাখা হলো। এখানেও নজরুল ইসলামের "ইসলাম" শব্দটি পরিত্যাগ করা হলো। পক্ষান্তরে হিন্দুদের নামে দেশের বুকে যেখানে যা ছিল, তা অবিকৃত রাখা হলো এবং মুসলিম নামসমূহ ত্যাগ করে হিন্দু পন্ডিতদের নামে নামকরণ করা হলো। পশু সম্পদ রক্ষার নামে গরু কোরবানী বন্ধ ও বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণের নামে হজ্জ্ব যাত্রী হ্রাস করার সুপারিশ করা হলো।

দেশের আলেম-ওলামা, ইসলামী চিন্তাবিদ, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবীদের ওপরে নির্যাতনের ষ্টীম রোলার চালিয়ে দেয়া হলো। নির্মম নিষ্ঠুর নির্যাতন চালিয়ে ইসলামপন্থীদেরকে হত্যা করা হলো। চোর, ডাকাত, খুনীদের ছেড়ে দিয়ে সম্মানিত আলেম-ওলামাদের ও ইসলামপন্থীদেরকে অমানবিক কায়দায় ধরে এনে

কারাগারগুলো পরিপূর্ণ করা হলো। কারাগারে তাঁদেরকে মানবেতর জীবন-যাপনে বাধ্য করা হলো। ইসলামী জীবন বিধান সম্পর্কিত যাবতীয় সাহিত্য প্রকাশ-প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেল। ইসলামী পত্র-পত্রিকা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। শুধু তাই নয়, গোটা দেশের সমস্ত পত্রিকা নিষিদ্ধ করে ইসলাম বিরোধী সরকার মাত্র চারটি পত্রিকা নিজের নিয়ন্ত্রণে প্রকাশের ব্যবস্থা করলো।

গোটা পৃথিবীতে প্রচলিত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত চির শ্বাশত সংজ্ঞাসমূহ এ দেশে বাম-রামপন্থীরা পরিবর্তন করে দিল। ধর্ম, সত্য, মিথ্যা, স্বাধীনতা, সংস্কৃতি, গণতন্ত্র, দেশপ্রেম, আইন, বিচার, ন্যায়-অন্যায়ের চির শ্বাশত সংজ্ঞা পরিবর্তন করে আওয়ামী সংজ্ঞা দান করা হলো। পরাধীনতার নাম দেয়া হলো স্বাধীনতা, অপসংস্কৃতির নাম দেয়া হলো সংস্কৃতি, আল্লাহ ও রাসুলের বিরুদ্ধে কথা বলাকে–সংজ্ঞায়িত করা হলো বাক স্বাধীনতা বলে, গণতন্ত্র হত্যা করে বলা হলো–এটাই গণতন্ত্রের উৎকৃষ্ট রূপ। যিনি যত বেশী যুক্তিবিবর্জিত, অন্ধ ও গোঁড়া, নীতিহীন তাকেই আওয়ামী লীগ প্রগতিশীল বলে সর্বত্র প্রচার করা হলো। আর এ সমস্ত প্রগতিশীলদের বিচারে যা কিছু কালোত্তীর্ণ ও শ্বাশত, আল্লাহর কোরআন ও বিশ্বনবীর সুন্নাহ্ প্রতিক্রিয়াশীল বলে বিবেচিত হলো।

এদের কাছে ইসলাম হলো মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িক ও বর্জনীয় বিষয়। ভারত ও ব্রাহ্মণ্যবাদী কর্মকান্ডের প্রতি অন্ধ আনুগত্য প্রদর্শন হয়ে গেল দেশ প্রেম। আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্বের প্রতি বিশ্বাস সম্পর্কে বলা হলো অবৈজ্ঞানিক, মৌলবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল। ইসলামের তুলনায় ছবির প্রতি মাল্যদান করে পূজা সম্পাদন, আগুনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, স্বাধীনতার নামে মূর্তি নির্মাণ করে সম্মান প্রদর্শন ইত্যাদিকে প্রগতিশীল ও সাংস্কৃতিক সুষমামন্ডিত বলে প্রচার করা হলো। আব্রাহাম লিঙ্কন, জর্জ ওয়াশিংটন, কার্ল মার্কস, লেলিন, ম্যাকিয়াভেলি, মাও সেতুঙ এসব লোকদের সম্মানে অনুষ্ঠান করা, তাদের জীবনী চর্চা করা, অনুসরণ করার পথে কোন প্রতিবন্ধকতা রইলো না, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হলো শুধু বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন অনুসরণ করার ক্ষেত্রে–আল্লাহর কোরআন অনুসরণ করা, কোরআনের আলোচনা করা অপরাধ বলে বিবেচিত হলো।

দাড়ি-টুপির প্রতি অসম্মান অমর্যাদা প্রদর্শন করা হলো, চলচ্চিত্র ও নাটকে দাড়ি টুপিধারী লোকগুলোকে সমাজের সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং জালিম হিসেবে তুলে ধরা হলো। ভারতীয় আগ্রাসন ও লুটপাটের বিরুদ্ধে কথা বলাকে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কথা বলা হিসেবে চিহ্নিত করা হলো। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার যাবতীয়

প্রচেষ্টাসমূহ দেশে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। দেশের যাবতীয় দুরাবস্থার দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হলো ইসলামপন্থীদের কাঁধে। দেশের জনগণের নিরাপত্তার সামান্য নিশ্চয়তা রইলো না। গোটা দেশ ব্যাপী অন্যায় অত্যাচারের প্লাবন বইয়ে দেয়া হলো। প্রতিবাদকারীর কণ্ঠ মুহূর্তের মধ্যে স্তব্ধ করার ব্যবস্থা করা হলো।

গোটা দেশে যে কোন মতবাদ-মতাদর্শ–তা দেশ ও জাতির জন্য যত ক্ষতিকরই হোক না কেন, তার প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে কোন বাধা রইলো না, কিন্তু ইসলামী আদর্শ প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে প্রবল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হলো। আলেম-ওলামাদেরকে সমাজে উপহাসের পাত্রে পরিণত করা হলো। ইসলামী পরিভাষাসমূহ সাহিত্য থেকে বিদায় করে দেয়া হলো। নামকাওয়াস্তে সমাজে ইসলামের যে বিধি-বিধান পালন করার সুযোগ রইলো–সেটাও শাসক গোষ্ঠীর প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী। মহান আল্লাহ ইসলামের পতাকাবাহীদের ওপরে যে দায়িত্ব দান করেছেন, সে দায়িত্ব পালন করার কোন সুযোগ রাখা হলো না। ফলে গোটা দেশে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টির হলো।

দেশবাসীর সুখ-শান্তি স্বস্তি সমস্ত কিছু যেন পুড়ে নিঃশেষে ছাই হয়ে গেল। অসংখ্য অনিয়ম–অগণিত বিশৃঙ্খলা...সেই যে রূপ কথার গল্পের মত ভয়ঙ্কর এক দৈত্য যেন সব কিছু লন্ডভন্ড করে দিল। সহজ-সরল পথে চলা আর এদেশবাসীর পক্ষে কোন ক্রমেই সম্ভব রইলো না। ঝড় এলো গোটা দেশ ব্যাপী–প্রচন্ড ঝড়। দেশবাসীর কত যত্নে গড়ে তোলা–কত দীর্ঘ দিনের শ্রম ও সাধনা ধর্মনিরপেক্ষ পাষাণের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। অব্যক্ত অসহনীয় একটা ব্যথায় গোটা জাতির প্রাণ যেন মুচড়ে মুচড়ে উঠছিল। দেশের সেই ক্রান্তিলগ্নে তওহীদি জনতার বিপ্লবী কণ্ঠস্বর আওলাদে রাসূল আল্লামা মাহমুদ মুস্তফা আল মাদানী ঢাকার অদূরে মানিকগঞ্জের এক বিশাল ময়দানে গর্জে উঠলেন।

অগণিত মানুষের সম্মুখে শাহাদাতের অদম্য কামনা বুকে নিয়ে তিনি তেজোদীপ্ত কণ্ঠে তৎকালীন সরকারের ইসলাম বিরোধী কর্মকান্ডের তীব্র সমালোচনা করছেন। তাঁর কথাগুলো ধর্মনিরপেক্ষদের দেহে যেন আগুন জ্বালিয়ে দিল। কোরআনের মাহফিলের মঞ্চ লক্ষ্য করে তারা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গুলী ছুড়তে থাকলো। মঞ্চে উপবিষ্ট লোকজন মাওলানাকে আত্মরক্ষা করার জন্য শুয়ে পড়ার অনুরোধ জানালো। তিনি রোষকষায়িত লোচনে তাঁদের দিকে তাকিয়ে অকম্পিত কণ্ঠে বললে– দীর্ঘদিন যাবৎ মহান আল্লাহর দরবারে শাহাদাতের জন্য আবেদন করছি। এখন সেই সুযোগ আমার পায়ের কাছে। আমি আল্লাহর গোলাম। শাহাদাতের এই সুযোগকে আমি মহান আল্লাহর নেয়ামত হিসেবেই গ্রহণ করলাম।

ইসলামের দুশমন ধর্মনিরপেক্ষ বাতিল শক্তি কর্তৃক ছুড়ে দেয়া তপ্ত শীশা আল্লাহর কোরআনের এই খাদেমের বক্ষদেশ বিদীর্ণ করলো। তিনি শাহাদাতবরণ করলেন। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো রাজধানী ঢাকার রাজপথে। দিনটি ছিল ১৯৯২ সনের ২৭ শে সেপ্টেম্বর। বাংলাদেশে ইসলামী রেঁনেসার শহীদী কাফেলা বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির রাজধানী ঢাকার পান্থপথের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- মাহফিলের আয়োজন করেছে। তাঁদের মহৎ উদ্দেশ্য, তাঁরা জাতিকে শোষিত নিপড়ীত ও নির্যাতিত মানবতার মহান মুক্তির দিশারী বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী শোনাবে।

এ লক্ষ্যে তাঁরা নির্মাণ করেছে বিশাল প্যান্ডেল। মাহফিলের প্রধান অতিথি আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী। বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মতই কোরআন প্রেমিক অগণিত জনতা মাহফিলের দিকে এগিয়ে আসছে। আল্লামা সাঈদীর কণ্ঠে আল্লাহর রাসূলের বিপ্লবী জীবনী শোনার অদম্য আকর্ষণ মানুষকে ঘরছাড়া করেছে–তাঁরা জমায়েত হচ্ছে মাহফিলে। কোরআন পাগল জনতা ইসলামী আন্দোলনের চির পরিচিত শ্লোগান মুসলমানদের প্রাণের ধ্বনি 'আল্লাহু আকবর' শ্লোগান দিয়ে রাজধানী ঢাকার রাজপথ প্রকম্পিত করে তুলছে। বজ্রমুষ্টি উত্তোলন করে গগন বিদারী শ্লোগানে আল কোরআনের রাজ প্রতিষ্ঠার দাবিতে ফেটে পড়ছে জনসমুদ্র। চেহারায় তাঁদের জিহাদের অগ্নি শিখা।

ইসলামের গণজোয়ার দেখে বাতিল শক্তির ক্রীড়নক, মুসলমানদের চিরশত্রু ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীদের কলিজায় আগুন লেগে গেল। তারা কোরআনের সৈনিক আল্লামা সাঈদীকে হত্যা করার পৈশাচিক উল্লাসে মেতে উঠলো। মাগরিবের নামায আদায় করে তিনি অগণিত জনতাকে সাথে নিয়ে রাসূলের শানে দরুদ পাঠ করলেন। তারপর মহান আল্লাহর দরবারে সাহায্যের প্রত্যাশায় দোয়া করলেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই বাতিল শক্তি ছুড়ে দিল মৃত্যুবাণ শিশা নির্মিত তপ্ত বুলেট।

মাহফিলের মঞ্চের পাশেই আনোয়ারা হাসপাতাল। এই হাসপাতালের ছাদে অবস্থান গ্রহণ করেছিল ধর্মনিরপেক্ষদের লেলিয়ে দেয়া গুপ্তঘাতকের দল। আল্লাহর পথের বিপ্লবী সিপাহসালার আল্লামা সাঈদীর বলিষ্ঠ কণ্ঠকে তারা বুলেটের আঘাতে চিরতরে নীরব নিথর নিস্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু ওরা জানে না, কোরাআনের সৈনিকরা তো ঐ কথার ওপরে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত– আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত নীরব হবো না, নিথর হবো না, নিস্তব্ধ হবো না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর কোরআনকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে না পাবো।

আনোয়ারা হাসাপাতালের ছাদ থেকে গুপ্তঘাতকের দল ছুড়ে দিল তপ্ত শিশা। প্রচন্ড শব্দ হলো, বায়ূবেগে গুলী ছুটে এলো আল্লামা সাঈদীর দিকে। আজন্ম লালিত শহীদী তামান্না তাঁর বুকের গহীনে ধিক্ ধিক্ করে জ্বলছে। তিনি তড়িৎ গতিতে দাঁড়িয়ে গেলেন। শাহাদাত আঙ্গুলী উচ্চে তুলে বাতিল শক্তির প্রতি রণহুংকার দিয়ে বলে উঠলেন- মৃত্যু আমাদের পায়ের ভৃত্য-শহীদী মৃত্যু আমরা খুঁজে বেড়াই। গুলী বোমা ছুড়ে আমাদের কণ্ঠ স্তব্ধ করা যাবে না ইন্‌শাল্লাহ।

বাতাসে শীশ কেটে সাক্ষাৎ মৃত্যুদুত শিশার তপ্ত বুলেট একের পর এক ছুটে আসছে আর আল্লাহর পথের নির্ভীক সেনানী আল্লামা সাঈদী মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছেন।

তাওহীদের আমানত তাঁর বুকে, সে বুকে ভয়ের কোন স্পর্শ নেই। শাহাদাতের অদম্য আকাংখা চেহারায় জান্নাতের দ্যুতি ছড়িয়ে দিয়েছে, কণ্ঠ দিয়ে বাতিলের বিরুদ্ধে আগ্নেয় গিরির উত্তপ্ত লাভা উদগিরণ হচ্ছে, হাত দুটো বারবার মহাসত্যের বিজয় প্রতিক এঁকে দিচ্ছে। ইসলামী আন্দোলনের নির্ভীক সিপাহ্‌সালার আল্লাহর কোরআনের প্রচারক আল্লামা সাঈদী অচল অটল হিমাদ্রীর মতই চির উন্নত শিরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

মঞ্চে উপবিষ্ট অনেকেই তাঁকে বসার জন্য ব্যাকুল কণ্ঠে অনুরোধ করছিলেন। কিন্তু তিনি বসেননি। তাঁর মত ব্যক্তিত্ব যদি বাতিলের ভয়ে বসে পড়েন তাহলে দাঁড়িয়ে থাকবে কে? শাহাদাতের পেয়ালা পানের অদম্য আশা বুকে নিয়ে তিনি অনঢ় শৃঙ্গের মতই দাঁড়িয়ে রইলেন। ইসলামী আন্দোলনের অগ্নি পুরুষ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (রাহঃ)-ও এই পরিস্থিতিতে অবিচল দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্যেও বাতিল শক্তি গুলী বর্ষণ করেছিল। আত্মরক্ষার জন্য তাঁকে বসতে বলা হলে তিনি অকম্পিত কণ্ঠে বলেছিলেন- লক্ষ জনতার মধ্যে যদি আমি বসে যাই তাহলে দাঁড়িয়ে থাকবে কে?

আল কোরআনের প্রেমিক অগণিত জনতা আনোয়ারা হাসপাতাল ঘেরাও করে গুপ্তঘাতকদের ধরেছিল। ইসলামী আন্দোলনের সৈনিক- আইনের প্রতি তাঁরা শ্রদ্ধাশীল। নিজের হাতে তাঁরা আইন তুলে নেয় না। বিচারালয়কে তাঁরা লাঠি দেখায় না-সম্মান করে। বিচারককে তাঁরা নির্দেশ দেয় না-নির্দেশ অনুসরণ করে। ঘাতকদেরকে তাঁরা পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিল। বিশ্বাসঘাতক সরকার ঘাতকদের কোন শাস্তি দেয়নি।

গুলী বোমা মৃত্যু ভয়কে পদদলিত করে কোরআনের প্রেমিকগণ সেদিন আল্লামা সাঈদীর কণ্ঠে রাসূলের জীবনী কয়েক ঘন্টা ধরে শুনেছে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের

প্রবল বাধা অপসারিত করে সাঈদীর কণ্ঠ হতে নির্গত কোরআনের মধু মুসলিম জাতি পান করেছে। এই গ্রন্থে যেসব মর্দে মুজাহিদদের প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁদেরকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করুন এবং আমাদেরকে তাঁদের গৌরবান্বিত কর্মধারা অনুসরণ করার তাওফিক এনায়েত করুন। আমীন– ইয়া রাব্বাল আলামীন।

১ম খণ্ড সমাপ্ত

وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُوْنَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةَ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ج وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ج وَّاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا– اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ج وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطٰنِ ج اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا –

(النّساء–٦٧–٧٥)

"তোমাদের কি হয়েছে, তোমরা কেন আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করছো না? অথচ দূর্বল, নির্যাতিত নারী, শিশু, বৃদ্ধরা আল্লাহর কাছে চিৎকার করে ফরিয়াদ করছে, হে প্রভূ! আমাদেরকে এ জালিমদের এলাকা থেকে বের করে নাও। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে বন্ধু এবং সাহায্যকারী নিযুক্ত করে দাও। অতএব, যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করে। আর যারা কাফের তারা খোদাদ্রোহীতার পথে সংগ্রাম করে। তাই তোমরা শয়তানের মিত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। নিশ্চয় তাদের চক্রান্ত দূর্বল।" (সূরা আন নিসা ঃ ৭৫-৭৬)

গ্রন্থপঞ্জী

তাফহিমুল কোরআন–আল্লামা মওদুদী (রাহঃ)।

তাফসীরে ইবনে কাসীর।

ফী যিলালিল কুরআন– শহীদ সাইয়েদ কুতুব (রাহঃ)।

তাফসীরে আশরাফী–মাওলানা আশরাফ আলী থান্‌ভী (রাহঃ)।

তাফসীরে সাঈদী– আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী।

সহীহ্ বোখারী, সহীহ্ মুসলিম, তিরমিজী, আবু দাউদ।

সীরাতে ইবনে হিশাম।

সীরাতে সরওয়ারে আলম–আল্লামা মওদুদী (রাহঃ)।

রাসায়েল ও মাসায়েল–আল্লামা মওদুদী (রাহঃ)।

খেলাফত ও রাজতন্ত্র– আল্লামা মওদুদী (রাহঃ)।

নবুওয়্যাত ও রিসালাত–মাওলানা আব্দুর রহিম (রাহঃ)।

হাদীস সংকলনের ইতিহাস–মাওলানা আব্দুর রহিম (রাহঃ)।

কাসাসুল কোরআন–আল্লামা হিফযুর রহমান (রাহঃ)।

মহিলা সাহাবী–আল্লামা নিয়ায ফতেহ্পুরী।

সীরাৎ-উন-নবী– আল্লামা শিবলী নোমানী।

ইসলামের স্বর্ণযুগে সামাজিক ন্যায়নীতি– শহীদ সাইয়েদ কুতুব (রাহঃ)।

আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তার দাবি– আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী।
আমি কেন জামায়াতে ইসলামী করি– আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী।

মাওলানা মওদুদী একটি জীবন একটি ইতিহাস– আব্বাস আলী খান (রাহঃ)।

শহীদে মেহরাব হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)– সাইয়েদ ওমর তেলেমেসানী।

বিশ্বনবীর সাহাবী– তালিবুল হাশেমী।

আসহাবে রাসূলের জীবন কথা– মুহাম্মাদ আব্দুল মা'বুদ। কারবালা থেকে বালাকোট– সোলায়মান ফররুক আবাদী।

শিকওয়া ও জওয়াবে শিকওয়া– আল্লামা ইকবাল (রাহঃ)।

ঈমান যখন জাগলো– সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রাহঃ)।

মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কি হারালো–সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রাহঃ)।

সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস– সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রাহঃ)।

দি ইন্ডিয়ান মুসলমান– ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার।

আমাদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা

বইয়ের নাম	লেখকের নাম	মূল্য
✦ ঈমানের অগ্নিপরীক্ষা	মাওঃ দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী	৬০/-
✦ তা'লিমুল কুরআন (১ম খন্ড)	ঐ	১৫০/-
✦ বাংলাদেশে ইসলামী পুনর্জাগরণ আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ভূমিকা	আব্দুস সালাম মিতুল	৯০/-
✦ মহিলা সাহাবী	নিয়ায ফতেহ্পরী	১২০/-
✦ কারাগারের রাতদিন	জয়নাব আল-গাজালী	৯০/-
✦ আজাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের সংগ্রামী ভূমিকা	জুলফিকার আহ্মদ কিসমতী	৭০/-
✦ বিশ্ব নবী (স.) এর সিরাত সংকলন	অধ্যাপক এ কিউ এম ছিফাতুল্লাহ	৪৫/-
✦ শহীদ হাসানুল বান্নার ডায়েরী	খলিল আহ্মাদ হামিদী	৭৫/-
✦ দারসুল কুরআন (১ম, ২য় খন্ড)	এ জি এম বদরুদ্দোজা	১১০/-
✦ দরসে হাদীস (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খন্ড)	মাও. মু. খলিলুর রহমান মুমিন	১২০/-
✦ ইনসাইড 'র	আশোকা রায়না	৭০/-

শিশু সাহিত্য (গল্প শোন সিরিজ)

✦ খলিফা ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ	নূর মোহাম্মদ মল্লিক	৩০/-
✦ বেহেস্তের সুসংবাদ পেলেন যাঁরা	নাসির হেলাল	৫০/-
✦ যে যুদ্ধের শেষ নেই	আব্দুস সালাম মিতুল	২৫/-
✦ শেখ সা'দী	নূর মোহাম্মদ মল্লিক	৩০/-
✦ ~~সোনালী ভালোবাসা~~	~~মুঃ খলিলুর রহমান মুমিন~~	~~৩৫/-~~
✦ ছোটদের ইবলিস পরিচিতি	মীম ফজলুর রহমান	৫০/-

PP

প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স

৪২৩, ওয়ারলেছ রেলগেইট, আল ফালাহ্ বিল্ডিং
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন: ৯৩৪১৯১৫, ৮৩৫৮৭৩৪, ০১৭১-১২৮৫৮৬
e-mail : professors_pub@yhaoo.com